পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৩

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৩ ❖ ৯ - ১৫ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

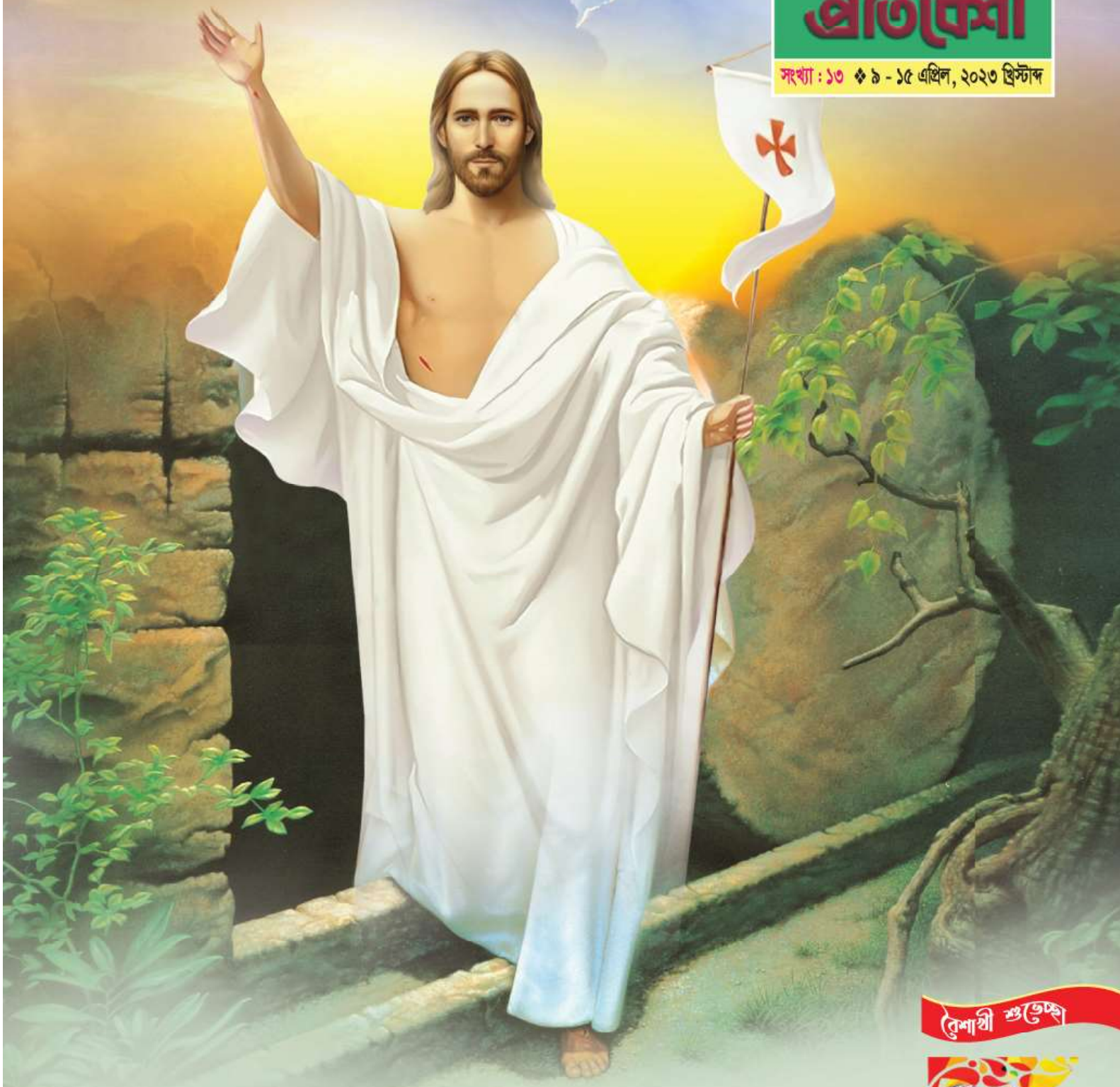

বৈশাখী শুভেচ্ছা

যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের নব জীবনের আশা

১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত খ্রীষ্টফার গমেজ

জন্ম : ২৬ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

ঈশ্বর তোমার আত্মাকে
অনন্ত শান্তি দান করুন।

১৪ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, দেখতে দেখতে ১৩টি বছর পেরিয়ে গেল। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করেছ তুমি। আমরা সবাই তোমার শূন্যতা মনে প্রাণে সর্বক্ষণ অনুভব করি। আমরা বিশ্বাস করি, পিতা পরমেশ্বর তোমাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। আমাদের জন্য তুমি তোমার স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রদান করো, যেন একদিন তোমার সাথে প্রভুর রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তুমি ছিলে, তুমি থাকবে, আমাদের সবার অন্তরে এবং তোমার সকল কাজে।

তোমারই প্রিয়জনেরা

ছেলে ও ছেলে বৌ : বাবু মার্কুজ গমেজ - মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : আলো, জ্যোৎস্না-অজিত, উজ্জলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইম্মানুয়েল সি গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ডায়না-মার্টিন, বৃষ্টি-ডেভিড, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক, আনন্দ ও টাইগো

৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার (পারুল ভিলা)
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বিজ্ঞ/২০১৩/২০২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ১৩
৯ - ১৫ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
২৬ চৈত্র, ১৪২৯ - ২ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নতুন মানুষ হবার প্রত্যয়ে পালিত হোক পুনরুত্থান ও বাংলা নববর্ষ উৎসব

পুনরুত্থান বা পাস্কা পর্ব খ্রিস্টানদের প্রধান পর্ব। মৃত্যু থেকে যিশুর জীবিত হয়ে ওঠার ঘটনাটিই যিশুর পুনরুত্থান। উদ্‌যাপনে যিশুর জন্মোৎসব বা বড়দিনের মত অতীব আড়ম্বরতা ও জাঁকজমকভাব না থাকলেও উপাসনায় রয়েছে গাম্ভীর্য ও ব্যাপকতা। পুনরুত্থান পর্বের আত্মিক প্রস্তুতি শুরু হয় ৪০ দিন আগে থেকেই কপালে ভস্ম লেপনের মধ্যদিয়ে। চল্লিশদিনের এই সময়কালকে তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকাল বলে আখ্যায়িত করে ত্যাগ সাধনা, দান ও দয়াকাজের মাধ্যমে খ্রিস্টানগণ নিজেদের আত্মশুদ্ধির যাত্রা শুরু করেন। তপস্যাকালীন সময়কালটাতে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যিশুর কষ্ট-যন্ত্রণা-মৃত্যুর করুণ কাহিনীর কথা চিন্তা ও ধ্যান করার সাথে সাথে নিজ এবং প্রতিবেশি ভাই-বোনদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার চিত্র দেখেন ও তা লাঘব করার চেষ্টা করেন। নিজ পাপের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা আদান-প্রদান করে নতুন মানুষ হন। নতুন হবার আহ্বান জানিয়ে এ বছর ৯ এপ্রিল সারাবিশ্বে পুনরুত্থান বা পাস্কা পর্ব পালিত হবে।

পুনরুত্থান শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো পুনরায় উপস্থিত হওয়া বা উঠা। পুনরুত্থানের সমার্থক অর্থ হলো জেগে উঠা, সজীব হওয়া, পরিবর্তন হওয়া, রূপান্তরিত হওয়া, নতুনভাবে শুরু করা, পুনরায় আরম্ভ করা। পুনরুত্থানের মাধ্যমে খ্রিস্টযিশু মৃত্যুকে জয় করেছেন, পুনরুত্থিত হয়েছেন মৃত্যুলোক থেকে, অন্ধকার-পাপ-তমসাকে জয় করে। যিশু নিজেও তাঁর পরিচয়ে বলেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন... মৃত্যু হতেই পারে না- কোন কালেই না" *(যোহন ১১:২৫-২৬)*। তাই পুনরুত্থান পর্ব বিশ্বাসী ভক্ত মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যিশুর সাথে পথ চলতে এবং নতুন প্রেরণা নিয়ে বেঁচে থাকতে। পুনরুত্থান পর্ব পুনরায় নতুন চেতনা ও বিশ্বাস নিয়ে খ্রিস্টীয় জীবন পথে অগ্রসর হবার নিমন্ত্রণ জানায়। পুনরুত্থান পর্ব উদ্‌যাপনের কাল হলো 'বসন্তকাল'। জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে থাকে বিশ্ব প্রকৃতির গাছ-পালা, বৃক্ষ-তৃণলতা বসন্তকালে নতুন কচি পাতা গজিয়ে উঠার মাধ্যমে নতুনত্বের ভূষণে সুশোভিত হয়।

পুনরুত্থান উৎসবও ব্যক্তি ও সমাজকে পরিশুদ্ধ হয়ে নবায়িত হতে আহ্বান জানায়। খ্রিস্টীয় উপাসনার গুরুত্বপূর্ণ এই পুনরুত্থান পর্ব ভক্ত বিশ্বাসীর কালিমাযুক্ত মন-অন্তরকে পরিশুদ্ধ হতে সুযোগ করে দেয়। যিশুর পুনরুত্থান উৎসব পালন প্রত্যেক বিশ্বাসীকে আহ্বান করে নিজ নিজ বিশ্বাস ও আশা নবায়ন করতে। কেননা যিশুর পুনরুত্থান হ'ল ঘৃণার উপর ভালোবাসার আর মৃত্যুর উপর জীবনের বিজয়। পুনরুত্থিত যিশুর প্রতি নিঃশর্ত ও বিশ্বস্ত ভালোবাসা ভক্তকে যেমন অনন্ত জীবন লাভে সহায়তা করবে ঠিক তেমনি প্রতিদিনের সহযোগিতা, সহভাগিতা, ক্ষমা, দয়া, সত্য ও ন্যায্যতা চর্চা ভক্তকে প্রতিদিন পুনরুত্থানের পূর্বস্বাদ দান করবে। পুনরুত্থিত যিশুর সংস্পর্শে এসে ভীত-সন্ত্রস্ত, হতাশ-নিরাশ ও নেতিয়ে পড়া শিষ্যেরা পেয়েছিল আশা, আনন্দ, শান্তি ও কর্মপ্রেরণা। আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা এই বিভীষিকাময় সময়েও প্রতিদিনের জীবনাচরণে, কথাবার্তায় যিশুর পুনরুত্থানের সাক্ষ্য দান করে তাঁর গৌরবময় উপস্থিতি অনুভব করি আমাদের জীবনে। যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে পরস্পরের পাশে থেকে আমরা হতাশা-নিরাশা, মন্দতা ও পাপের উপর বিজয়ী হতে পারব। যিশুর পুনরুত্থান আমাদের বিজয়ী হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়।

১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ। শুভ নববর্ষ। নববর্ষ সামনে এগিয়ে যাওয়ার নতুন আশা ও নতুন প্রেরণা দান করে। পুরানো বছরের সমস্ত ব্যর্থতা, পশ্চাৎপদতা, জঞ্জাল, আবর্জনা ও পাপ-কালিমা পরিহার করে নতুনকে বরণ করে নিচ্ছি। শান্তি, কল্যাণ, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়ার দৃপ্ত অঙ্গীকার করছি। সকল ভেদাভেদ, মনোমালিন্য, দ্বন্দ্ব সংঘাত ভুলে গিয়ে সকলকে আপন করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার এই তো সময়।

পুনরুত্থিত জীবনের শক্তিপ্রবাহে ঝরে যাক জীবনের সকল জ্বরা-জীর্ণতা। বাংলা নববর্ষের সকল স্নিগ্ধতা ও নবীনতা, নবচেতনা ও নব-উন্মেষ এবং মৃত্যু-সামিল জীবনাবস্থা অবসানের মধ্যে প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের বিজয় প্রতিফলিত হোক। পুনরুত্থানের মূল্যবোধ শান্তি, আনন্দ ও ভালোবাসার চর্চাতে বলিয়ান হোক প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ সকলকে জানাই বাংলা নববর্ষ ও পুনরুত্থান পর্বের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আল্লেলুইয়া॥ †

সুতরাং মানুষের সামনে যে কেউ স্বীকার করবে, সে আমারই একজন, আমিও তাকে আমার স্বর্গনিবাসী পিতার সামনে আমারই একজন ব'লে স্বীকার করব। কিন্তু মানুষের সামনে যে কেউ অস্বীকার করবে, সে আমারই একজন , আমার স্বর্গনিবাসী পিতার সামনে আমিও তাকে নিজের একজন ব'লে অস্বীকার করব (মথি ১০:৩২-৩৩)।

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সূচীপত্র

আর্চবিশপের বাণী - *আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই* ♦৫

প্রবন্ধ

- যিশুর পুনরুত্থান আমাদের নতুন জীবনের আশা ও প্রেরণা - *ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি* ♦৬
- পুনরুত্থান অনন্ত জীবনের আশ্বাস দেয় - *ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা* ♦৮
- শূন্য সমাধি: কিছু অভিজ্ঞতা - *ফাদার শিপন পিটার রিবেরু* ♦৯
- সুসমাচার প্রচারে নারীরা - *মিনু গরেট্টি কোড়াইয়া* ♦১১
- যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান: নতুন মানুষ হবার আহ্বান - *ফাদার শিশির কোড়াইয়া* ♦১২
- কিশোর ও বিশ্বাসীদের কাছে পুনরুত্থিত যিশু - *ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি* ♦১৩
- কিভাবে ইস্টার সানডে'র তারিখটি নির্ধারণ করা হয় - *আলফন্স পঙ্কজ গমেজ* ♦১৪
- খ্রিস্টের পুনরুত্থান: আমাদের বিশ্বাস ও আশা - *ফাদার লেনার্ড রোজারিও* ♦১৫
- যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান মানবজাতির পরিত্রাণ - *নিবিড় আন্তনী রোজারিও* ♦১৬
- যিশুর পুনরুত্থানে পরিবারে আনন্দ - *লাকী ফ্লেরেন্স কোড়াইয়া* ♦১৬
- পুনরুত্থান-জীবনের উত্থান ♦১৭
- যিশুর পুনরুত্থান, নবজীবন প্রবাহমান - *ফাদার প্যাট্রিক গমেজ* ♦১৯

খোলা জানালা

- ধর্মপল্লীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনে কিছু অভিজ্ঞতা - *ফাদার কমল কোড়াইয়া* ♦২০
- করোনা পরবর্তী শিক্ষাদানের হালচাল ও আমাদের করণীয় - *জয়ন্তী লাভলী ডি'কস্তা* ♦২৩
- যে দশটি কারণে আপনার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না - *সুমন কোড়াইয়া* ♦২৪
- এসো হে বৈশাখ নবীনতায় - *ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন* ♦২৬
- বাংলা নববর্ষ, নব রবির কিরণ - *জ্যাষ্টিন গোমেজ* ♦২৭
- উপাসনায় উপস্থিতি কম - *সাগর এস কোড়াইয়া* ♦২৯
- রাগ ছাড়ি, কথা শুনি, একসাথে পথ চলি - *ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও* ♦৩০

মহিলাঙ্গণ

- সন্তানের জন্য পারিবারিক বন্ধন একান্ত প্রয়োজন - *হেলেন রোজারিও* ♦৩২

যুব তরঙ্গ

- কর্মক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত: পুরুষদের নার্সিং পেশা - *পিটার ডেভিড পালমা* ♦৩৩
- গ্রামীন উদ্যোক্তা - *শুভ পাস্কাল পেরেরা* ♦৩৫

স্বাস্থ্য কথা

- উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাড পেশার: নীরব এই ঘাতক থেকে বাঁচতে আপনি যা যা করবেন ♦৩৭

গল্প

- সবজি বাগানে সন্ত্রাসী হামলা - *ডেভিড স্বপন রোজারিও* ♦৩৮
- ক্ষণিকের মোহ - *শিউলী রোজলিন পালমা* ♦৪০
- সম্পর্ক - *প্রদীপ মার্সেল রোজারিও* ♦৪২
- রক্ত - *সাগর কোড়াইয়া* ♦৪৪
- গুরুমা - *সুনীল পেরেরা* ♦৪৫
- হৃদয়ের অন্তরালে - *খ্রীষ্টিনা গমেজ* ♦৪৮
- যিশুতে বিশ্বাস - *মিল্টন রোজারিও* ♦৫০
- নারিকেলের নাড়ু - *খোকন কোড়ায়া* ♦৫২
- মিলনেই আনন্দ - *দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ* ♦৫৩

ছোটদের আসর

- পাস্কা পর্ব - *নিরব রিবেরু* ♦৫৪

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ - *ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু* ♦৫৫

পুনরুত্থান পর্ব ও বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা

মুক্তিদায়ী খ্রিস্ট ও জগৎ পরিত্রাতার পুনরুত্থান ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ জাতি, ধর্ম-বর্ণ সকলকে জানাই প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। আমাদের প্রতিটি হৃদয়ে বর্ষিত হোক পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রেম ও শান্তি, মুক্তির লক্ষ্যে উৎসব হোক মঙ্গলময়। আপনাদের সকলকে জানাই পুণ্যময় পাস্কার ও বাংলা নববর্ষের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা।

ঘোষণা

পবিত্র পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ ৮-১০ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বিশেষ কারণে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর (১৬-২২) সংখ্যা প্রকাশ পাবে না। তাই পরবর্তী সংখ্যা যথারীতি প্রকাশ হবে ২৩ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে।

- সম্পাদক

পুনরুত্থান উৎসব উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা

বাংলাদেশ টেলিভিশন

পুনরুত্থান রবিবার (৯ এপ্রিল) : "আনন্দে মাতো সবে"

সময় : রাত ১০টার ইংরেজি সংবাদের পর (সময় পরিবর্তীত হলে তা জানিয়ে দেওয়া হবে ফেইসবুক পেইজ ও স্থানীয় পাল-পুরোহিতদের মাধ্যমে)।

গ্রন্থণা : সুনীল পেরেরা

ব্যবস্থাপনায় : বাণীদীপ্তি

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ও রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিসের ফেইসবুক পেইজে থাকছে ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা।

অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন:

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী: www.facebook.com/weeklypratibeshi
ভেরিতাস বাংলা: www.facebook.com/veritasbangla

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়তে ভিজিট করুন:
www.weekly.pratibeshi.org

নিয়মিত ধর্মীয় গান শুনতে ভিজিট করুন:
www.youtube.com/@BanideeptiMedia

পুনরুত্থান পার্বণ উপলক্ষে বাণী

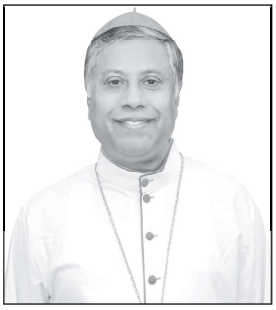

প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান খ্রিস্টানদের জন্য একটি মহাপার্বণ। এই পার্বণটি যথাযোগ্যভাবে পালন করার জন্য চল্লিশ দিন উপবাস, প্রার্থনা ও দয়ার কাজের মধ্যদিয়ে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করেছি। পোপ ফ্রান্সিস এ বছর উপবাস ও প্রায়শ্চিত্তকালীন সময়ে সুন্দর একটা বাণী রেখেছেন। এই বাণীর জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন পর্বতের উপরে শিষ্যদের সামনে যিশুর রূপান্তরের ঘটনা *(মথি ১৭:১)*। প্রথমেই আমরা দেখতে পাই যে, তিনি পর্বতের উপর আরোহণ করলেন: পবিত্র বাইবেলে পর্বতের উপর আরোহন করার একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থ রয়েছে। পর্বতের উপর ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন এবং পর্বত হলো ঈশ্বর এবং মানুষের সাক্ষাতের স্থান। মুক্তির ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে পাহাড়ের উপরে। মোশীকে ঈশ্বর দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন সিনাই পর্বতের উপরে; কার্মেল পর্বতের উপর প্রবক্তা এলিও ঈশ্বরের শক্তিতে আগুন ছাড়াই হোম বলি উৎসর্গ করেছিলেন এবং ৪৫০ ভণ্ড প্রবক্তাদের পরাজিত করেছিলেন। যিশু নিজেও পর্বতের উপরে সেই তাঁর কেন্দ্রীয় শিক্ষা অষ্টকল্যাণবাণী শিক্ষা দিয়েছিলেন, অনেকবার পর্বতের উপর গিয়ে তিনি প্রার্থনায় পিতার সাথে মিলিত হয়েছেন, পর্বতের উপরেই তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন আবার কালভারী পর্বতেই যিশু ক্রুশে আত্মত্যাগ ও মৃত্যুবরণের মধ্যদিয়ে সমগ্র মানব জাতির পরিত্রাণ সাধন করেছেন। এই সময়টা হলো পর্বতের উপর উঠার সময়: প্রার্থনা, ত্যাগ স্বীকার, উপবাস ও দয়ার কাজের মধ্যদিয়ে। অসত্য, অন্যায়, মিথ্যা, লোভ-লালসার উর্ধ্বে আমাদের ওঠতে হবে। উর্ধ্বে না উঠলে আমরা প্রভুর সাক্ষাৎ পাই না। তাই তো সাধু পৌল বলেন তোমরা তো উর্ধ্বের মানুষ, তোমাদের চিন্তা-ভাবনা কাজ কর্ম সব কিছুর উর্ধ্বেই হোক। আমাদের যাত্রা হোক উর্ধ্বের দিকে এবং সবার একত্রেই এই যাত্রা হোক।

এই সময় হলো একত্রে তাঁর শিষ্য হিসাবে যিশুর সাথে যাত্রা করতে হবে। পর্বতের উপর যিশুর কাপড় সাদা উজ্জ্বল রূপ ধারণ করলো তিনি শিষ্যদের সামনে রূপান্তরিত হলেন। এটাই আমাদের সিনডাল যাত্রার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তারাও যিশুর আলোকে আলোকিত হলেন। আমাদের যাত্রার লক্ষ্য হলো যিশুর দিকে দৃষ্টি রাখা, রূপান্তরিত হওয়া। যিশুর সাথে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা হলো আমাদের চরম ও পরম লক্ষ্য। মশী ও এলিও আবির্ভূত হলেন যিশুর সামনে। এখানেই পুরাতন ও নতুন নিয়ম একত্রিত হয়েছে এবং যিশুতে পুরাতন নিয়ম খুঁজে পেয়েছে পূর্ণতা।

এই রূপান্তরের ঘটনার শেষে দিকে দেখতে পাই স্বর্গ থেকে এই বাণী ধ্বনিত হলো: এ আমার প্রিয় পুত্র তোমরা তাঁর কথা শোন। সিনডাল মণ্ডলীর একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অন্যের কথা শোনা, তাকে বুঝা এবং বিচার না করা। আমরা কান, হৃদয় ও মন দিয়ে শুনি। না বলা হৃদয়ের আকুতি, বেদনা ও কান্না অনুভব করতে চেষ্টা করি। যখন আমরা শুনি না তখনই সৃষ্টি হয় ভুল বুঝা-বুঝি, অনৈক্য এবং অন্য ব্যক্তি বাদ পড়ে যায়। মণ্ডলী জনগণের কণ্ঠস্বর শুনবে, জনগণের ইচ্ছা ও অনুভূতি উপলব্ধি করবে। এই কথা শোনা বয়ে আনে শান্তনা, নিরাময়, শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা। একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, সম্পর্ক স্থাপিত হবে, সম্পর্ক গভীর হবে, সেতু বন্ধন স্থাপিত হবে। এই পরিবেশের মধ্যে প্রভুর ভালোবাসা ও নিরাময়কারী ক্ষমতা আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের মধ্যে সক্রিয় ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠে। জনগণের কান্না শুনার মধ্যদিয়ে পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শুনতে পাব। প্রভুর বাণী শোনার মধ্যদিয়ে আমাদের অন্তরে অনুরিত হবে আমাদের জন্য তাঁর ভালোবাসা ও প্রেমময় পরিকল্পনা। শোনার মধ্যদিয়ে এই দু'য়ের মধ্যে একটা পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটবে। শোনাই হয়ে উঠে আমাদের মিশন ও বাণী ঘোষণা। পরিশেষে এই আন্তরিক শোনা বয়ে আনে উন্মুক্ত হৃদয় ও সংলাপ, সৃষ্টি হয় একাত্মতা, স্থাপিত হয় সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব।

যিশুর পুনরুত্থান আমাদের জন্য বয়ে আনে আশার আলো, অন্ধকারকে করে দূরীভূত এবং আমাদের হৃদয়-মনকে করে আলোকিত, সত্য ও ন্যায্যতার পক্ষে কাজ করার শক্তি দান করে। আজ চারিদিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই কত অসত্য, অন্যায়, মন্দতা, কত অমানবিকতা, পাশবিকতা, শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা এবং সঙ্গে যোগ হয়েছে ধর্মান্ধতা, ধর্মের নামে অসহিষ্ণুতা, হিংস্রতা, নির্যাতন এমনকি হত্যা। এমনি একটা অবস্থাতে আমরা প্রভু যিশুর পুনরুত্থান পর্ব পালন করছি। ইস্টার সানডে প্রতিটি খ্রিস্টানের নতুন করে শপথ গ্রহণের দিন যেদিন, সে নিজের অন্তরে গভীরভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করবে, সত্য ও ন্যায্যতার পথে জীবন-যাপন করবে। সে সত্য, ন্যায্যতা, ভালোবাসা ও সেবার মধ্যদিয়ে নতুন সমাজ ও পৃথিবী গড়ে তুলবে। ফলশ্রুতিতে এই পৃথিবীতেই সূচিত হবে সেই কাঙ্খিত স্বর্গরাজ্য যেখানে থাকবে ন্যায্যতা, শান্তি, আনন্দ ও ভ্রাতৃপ্রেম। ইস্টার সানডেতে প্রভু যিশু আমাদের সবাইকে সেই আশীর্বাদই দান করুন।

খ্রিস্টেতে,

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ।

যিশুর পুনরুত্থান আমাদের নতুন জীবনের আশা ও প্রেরণা

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

ছবি: ইন্টারনেট

মানব মুক্তির ইতিহাসের সূচনা

মানব মুক্তির ইতিহাসে এবং ঐশ পরিকল্পনায় খ্রিস্টানদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান। যদিও বাস্তবতায় পরিলক্ষিত হয় যে, মুক্তিদাতার জন্মদিনটিকে অতি জাঁকজমক সহকারে সমগ্র বিশ্বের খ্রিস্টানগণ বেশ ঘটা করে পালন করে থাকেন, তবুও ঐশতাত্ত্বিক দিক থেকে যিশুর খ্রিস্টের পুনরুত্থান খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে সবচেয়ে বড় ঘটনা-কেননা, এটি খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র। মানুষ রূপে যিশুর জন্মগ্রহণ বা অসীম অদৃশ্য ঈশ্বরের দেহধারণ (The Incarnation) মানব মুক্তির ইতিহাসের সূচনা মাত্র যদিও অদৃশ্য ঈশ্বরের মানব রূপ পরিগ্রহ বা দেহগ্রহণ শুরু হয় তারও পূর্বে কুমারী মারীয়ার নির্মল গর্ভধারণ (The Incarnation)-এর সময় স্বর্গদূত গাব্রিয়েল কর্তৃক শুভ সংবাদ 'দূত সংবাদ' (The Annunciation)-এর সময়। মহান প্রেমময় ঈশ্বর যখন পাপে পতিত তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে উদ্ধার করতে প্রতিশ্রুতি দেন (*আদি* ৩:১৫), ঈশ্বরের মানবমুক্তির পরিকল্পনা বাস্তবে শুরু হয় যিশুর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের দেহধারণের মাধ্যমে এবং তা পরিপূর্ণতা লাভ করে ক্রুশে যিশুর প্রাণত্যাগ ও মৃত্যুর পর তাঁর পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে।

যিশুর পুনরুত্থান খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র

যিশুর পুনরুত্থান একটি বাস্তব ঘটনা। খ্রিস্টানদের কাছে এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর ধ্যানপূর্ণ মুক্তি রহস্য বা পরিত্রাণ রহস্য। যিশুর পুনরুত্থান খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র কেননা, এতে সেই 'প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা' বা খ্রিস্টের দ্বারা প্রেমময় ও ক্ষমাশীল ঈশ্বরের মানবমুক্তি পরিকল্পনা পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রত্যেক খ্রিস্টান দৃঢ়ভাবে এই কথা বিশ্বাস করে যে, যিশুখ্রিস্ট আমাদেরকে, অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতিকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে, শয়তানের সকল প্রকার মন্দ ও অশুচিতার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে "তিনি নিজেই ক্রুশের উপর আমাদের সমস্ত পাপের বোঝা সেদিন নিজের কাঁধে বহন করেছিলেন"(*১ পিতর ১:২৪ক*)। এভাবে তিনি আমাদের জন্যে এক নিষ্কলংক মেষ রূপে কালভেরী বেদীতে ক্রুশের উপর বলিকৃত হলেন এক কঠিন ও নিষ্ঠুর মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন নির্দোষ হয়েও নিহত হলেন একজন চরম অপরাধী রূপে যেন তিনি চরম অপরাধীকে, অধম পাপীকে তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর পুণ্য ফলে স্বর্গে গমনের যোগ্য করে তুলতে পারেন। এভাবেই তিনি ক্রুশকাষ্ঠে তাঁর ক্ষত-বিক্ষত দেহ থেকে ক্ষরিত পুণ্য রক্তের স্রোত-ধারায় অনুতাপী পাপীকে বিধৌত করেছেন। এভাবেই তিনি উপহার দিয়েছেন আমাদের মুক্তি বা পরিত্রাণ।

যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান ছাড়া তাঁর দ্বারা অর্জিত মানব মুক্তি বা পরিত্রাণ অসম্পূর্ণ এবং অকল্পনীয় বলা যেতে পারে, যিশুর পুনরুত্থান ছাড়া তাঁর মৃত্যু একটি পরাজয় এ যেন হতো অসত্যের কাছে সত্যের পরাজয়, মন্দের কাছে ভালোর পরাজয়। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, যিশুর পুনরুত্থান ছাড়া তাঁর মৃত্যু একটি সত্যের কাছে অসত্যের জয়, ভালোর কাছে মন্দের বিজয়, আলোর কাছে আঁধারের জয়। কিন্তু যিশুর পুনরুত্থান মন্দকে চিরতরে পরাজিত করেছে মৃত্যু-পাপ-মন্দ পুনরুত্থিত যিশুর কাছে চরম ভাবে হার মেনেছে; যিশু সমস্ত অসত্য অশুভ চিন্তা-চেতনা ও মন্দ শক্তির উপর বিজয়ী হয়েছেন। তাই আমরা আনন্দরবে মহোল্লাসে গেয়ে থাকি: "মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যিশু উঠেছেন এবার ও পাপ করি ছারখার/তাই তো আজি বিশ্ববাসী পেল নতুন প্রাণ লভি আত্ম-পরিত্রাণ" (*গীতাবলী, গান ১০০৬*)।

যিশুর পুনরুত্থান যদি না হতো তবে কী হতো

যিশুর পুনরুত্থান যদি না হতো, তবে আজ ইহুদী জাতির লোকেরা এবং তাদের নেতারা

গলা উচু করে গর্ব করে মেহোল্লাসে নেচে গেয়ে বেড়াতো যে, যিশুর পরাজয় হয়েছে, তাদের জয় হয়েছে। 'যিশুকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছি- বাহ্, কী আনন্দ!' ঐদিন যেমন, আজও তেমনি তারা বিজয়ের হাসি হাসতো। আর অন্যদিকে কী হতো? যদি তা-ই হতো, তবে এই যে খ্রিস্টধর্ম এবং তার অনুসারী, যারা সারা পৃথিবীতে আজ সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি, তাহলে খ্রিস্টধর্মের অস্তিত্ব নিয়ে একটি প্রশ্ন দেখা দিতো খ্রিস্টধমের অনুসারীদের কোন চিহ্ন হয়তো আজ থাকতো কি-না, অথবা, আজ এত সংখ্যক খ্রিস্টান থাকতো কি-না, তা বড় একটি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াতো। আর যিশুর পুনরুত্থান উৎসব বলে আর আজ কিছুই থাকতো না কেননা, মানব মুক্তি বা পরিত্রাণ অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। ফলে, যিশুর মৃত্যু নিয়ে আনন্দ-উৎসব করার কিছুই থাকতো না। যিশুর পুনরুত্থান যদি না হতো, তাহলে তা হতো যিশুর পরাজয় এবং ইহুদী নেতাদের ও ইহুদী জাতির লোকদের জয়।

খ্রিস্ট যিশু সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন

যিশুর পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী অনুতাপী মাগদালেনা মারীয়ার দেহ-মন-অন্তরের প্রাণঢালা উচ্ছ্বাস আমাদের চিত্তকে এক অনাবিল আনন্দে মুখরিত করে। পুনরুত্থিত যিশুর দেখা পেয়ে মাগদালেনা মারীয়া এতোই আনন্দে ভরপুর ছিলেন যে, তিনি তা নিজের অন্তরে গোপন করে রাখতে পারেন নি। আনন্দের অতিশয্যে ছুটে গেলেন যিশুর প্রিয় সঙ্গীদের কাছে এই মহা সুসংবাদ জানাতে। সমস্ত সৃষ্টির ইতিহাসে প্রথম একটি প্রথম মহাশ্চর্য ঘটনা মৃত্যুকে জয় করে যিশু মহা গৌরবে পুনরুত্থান করেছেন। "তাই মাগদালার মারীয়া শিষ্যদের কাছে গিয়ে জানালেন: "আমি প্রভুকে দেখেছি" (*যোহন ২০:১৮*)

যিশুর খ্রিস্টের পুনরুত্থান - এই বাস্তব একান্ত বিশ্বাসযোগ্য ও ঐতিহাসিক সত্যটি খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র বা কেন্দ্রবিন্দু। কেউ যদি দাবি করে সে খ্রিস্টান, অথচ যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না, তবে তাকে নিশ্চিত ভাবেই খ্রিস্টান বলা যায় না। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে দীক্ষাস্নাত ব্যক্তিদের ছাড়া জগতে আরো অনেক মানুষ রয়েছে, যারা যিশুর শিক্ষা, যিশুর বাণী-প্রচার, যিশুর আদর্শকে ভালবাসে, কিন্তু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না। তাই তাদেরকে বাহ্যিক ভাবে 'খ্রিস্টান' বলা যায় না। এমনকি, কিছু কিছু তথাকথিত 'খ্রিস্টমণ্ডলী' থাকতে পারে, যারা যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না। তাদেরকেও প্রকৃত পক্ষে ঐশতাত্ত্বিক দিক থেকে খ্রিস্টান বলা যায় না কেননা, খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র বা কেন্দ্রবিন্দু সেখানে অনুপস্থিত। তাই, সাধু পল বলেন: "খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বাণীপ্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাস অর্থহীন" (*১ করি ১৫:১৪,১৭*)।

প্রবক্তাদের ভবিষ্যতবাণীর পূর্ণতা: প্রতিশ্রুত খ্রিস্ট যন্ত্রণাময় মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থান করবেন

যিশুর পুনররুত্থানের দিন সকাল বেলা যখন তাঁর দুই হতাশাগ্রস্ত শিষ্য জেরুশালেম থেকে এম্মাউস গ্রামে যাবার পথে যিশুর সাথে অতি আশ্চর্য ভাবে আবির্ভূত হয়ে তাদের এই বলে বুঝাতে লাগলেন যে, প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা বা খ্রিস্ট প্রথমে ক্রুশীয় বহু যন্ত্রণাময় মৃত্যুর মধ্যদিয়ে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন। তাই তিনি তাদের বলেন: "খ্রিস্ট যে যন্ত্রণাভোগ করেই তাঁর আপন মহিমার আসনে অধিষ্ঠিত হবেন, তা কি অবধারিত ছিল না?" (*লূক ২৪:২৬*)। কাজেই যিশুর জীবনে এই তিনটি বাস্তব সত্য রয়েছে: যিশুর আশ্চর্য দেহধারণ, তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান। মানবমুক্তির ঐশ পরিকল্পনায় এই তিনটি সত্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর রহস্যাবৃত। যিশুর পুনরুত্থান ছাড়া মানুষের জন্যে প্রেমময় ঈশ্বরের মুক্তিপরিকল্পনা মোটেই বাস্তবায়িত হতো না। তাই শুধু যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুতে ঈশ্বরের মানব-মুক্তিপরিকল্পনা পূর্ণতা লাভ করে না; যিশুর পুনরুত্থানেই মানবমুক্তির পরিকল্পনা পূর্ণতা লাভ করলো। যিশুর পুনরুত্থান হলো সমস্ত মন্দের উপর যিশুর বিজয় এবং শয়তানের পরাজয়; পাপের উপর যিশু খ্রিস্টের মহা বিজয় কেননা, যিশুর দেহধারণ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান - এই তিন রহস্যময় পরম সত্যের গুণে অনুতাপী পাপী মানষের জন্যে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হলো; ঈশ্বর ও মানুষে পূর্ণ মিলন সাধিত হলো। তাই খ্রিস্টবিশ্বাসী আমরা প্রত্যেকে এই কথা জোর দিয়ে সারা জীবন ও সারা বিশ্বময় আনন্দের সাথে ঘোষণা করতে পারি: "ওহে মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়---" (*১ করি. ১৫:৫৫*)।

আসুন আমরা যিশুর সাথে প্রতিদিন পুনরুত্থান করি

যিশুর খ্রিস্টের পুনরুত্থান হলো আমাদের পরম আনন্দ, আমাদের পরম আশা ও আমাদের পরম শক্তি। কেননা, আমরা যিশুর মত আমাদের জীবনের সমস্ত মন্দকে পরাজিত করার অনুপ্রেরণা ও শক্তি পেয়েছি যিশুরই কাছ থেকে; নিজের জীবনের মন্দকে পরাজিত করার নতুন আশা ও আলো পেয়েছি। পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্টের নামে আমাদের জীবনের সমস্ত মন্দকে, যে কোন পাপকে, শয়তানের যে কোন পরীক্ষা-প্রলোভনকে আমরা পরাজিত করতে পারি - কেননা, যিশুর পুণ্য নামে শয়তান ভয়ে পলায়ন করে।

আপনি-আমি প্রতিদিন যিশুর সাথে পুনরুত্থান করতে পারবো, যখন আমরা শয়তানকে, সমস্ত মন্দকে, সমস্ত কুৎসিত, অপবিত্র- অসুন্দরকে যিশুর নামে পরাজিত করতে পারবো এবং যিশুর মত বিজয়ী হবো। তা-ই হবে আমাদের জীবনে প্রতিদিন পুনরুত্থান। জয়, পুনরুত্থিত যিশুর জয়! জয়- সত্য সুন্দরের জয়। পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্ট চান যে, আপনি-আমি প্রতিদিন তাঁর সাথে পুনরুত্থিত হই। পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্ট চান যে, আমাদের জীবনে যেন প্রতিদিন তাঁর সত্যের জয়, পবিত্রতার জয়, তাঁর ভালবাসার জয় হয়। তাই সাধু পল বলেন: "এই যে তুমি ঘুমিয়ে আছ, এবার জেগে ওঠ; মৃতসঙ্গ ছেড়েই তুমি এবার উঠে এসো। আহা, তোমার ওপর ঝরবে এবার খ্রিস্ট-আলোকধারা। তাই বলছি, তোমরা কীভাবে জীবন কাটাচ্ছ, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ; জ্ঞানীর মতোই চল, মূর্খের মত নয়" (*এফেসীয় ৫:১৪-১৫*)।

যিশুর মত আমাদের জীবনেও হোক প্রতিদিন শুভ পুনরুত্থান-হোক প্রতিদিন পুনরুত্থিত যিশুর জয়। শুভ পুনরুত্থান! ❑

পুনরুত্থান অনন্ত জীবনের আশ্বাস দেয়

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা

অবতরণিকা: "বিজয়ের গ্রাসে মৃত্যু হয়েছে কবলিত। ওহে মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? কোথায় মৃত্যু তোমার সেই অঙ্কুশ"? পাপই তো মৃত্যুর অঙ্কুশ এবং পাপ তার শক্তি পায় বিধান থেকেই। কিন্তু ধন্য ধন্য ঈশ্বর! আমাদের প্রভু খ্রিস্টের দ্বারা তিনিই তো আমাদের জয়ী করে তোলেন" (*১ করিন্থীয় ১৫: ৫৫-৫৬*)। পুনরুত্থান আমাদের খ্রিস্টে বিশ্বাসী করে তোলে, আর খ্রিস্টবিশ্বাস আমাদের অন্তরে আশা সঞ্চার করে। এই আশা আমাদেরকে সকল মন্দতা পরিহার করতে, পবিত্রতায় জীবন যাপন করতে এবং সমস্ত সত্তা দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করে, যেন আমরা খ্রিস্টের মহিমান্বিত জীবনে প্রবেশ করতে পারি। খ্রিস্ট এসেছেন আমাদের মুক্তি দিতে, স্বাধীন করে দিতে যেন আমরা নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হতে পারি। আমাদের এই রূপান্তর অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোতে, দাসত্ব থেকে মুক্তির পথে, মৃত্যু থেকে অনন্ত জীবনে, মলিনতা থেকে পবিত্রতায় এবং দুঃখ থেকে শান্তির রাজ্যে। আমরা পাপী ছিলাম, কিন্তু খ্রিস্ট আমাদের ধার্মিক করে গড়ে তুলেছেন। দীক্ষাস্নানে আমাদের পুরনো আমিটা খ্রিস্টের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে, কেননা খ্রিস্টের মৃত্যু আমাদের পাপরাশি ধুয়ে-মুছে আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে যেন আমরা নব জীবনের পথে চলতে পারি।

প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের আশ্বাস দেয়:

১) ঈশ্বরপুত্রকে বিশ্বাস করে যারা, তারাই নবজন্ম লাভ করে। (ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে যারা তাকে বিশ্বাস করে, তাদের কারও যেন বিনাশ না হয়, বরং তারা সকলেই যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন) (*যোহন ৩:১৬*)।

২) আমরা স্বর্গের নাগরিকত্ব লাভ করি। "আমরা (ঈশ্বর সন্তান রূপে) এমনই সম্পদ লাভ করি, যে সম্পদ সমস্ত ক্ষয়, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত জীর্ণতার অতীত। সেই সম্পদ তোমাদের জন্যে সঞ্চিত রয়েছে স্বর্গলোকে" (*১ পিতর ১:৪*)।

৩) ঈশ্বর আমাদেরকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসেন। "শোন, আমি এখন তোমাদের একটি নতুন আদেশ দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমাদেরও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসতে হবে (*যোহন ১৩:৩৪*)।

৪) যিশুর মৃত্যু আমদের স্বাধীন ও চির জীবন্ত করে তুলে। "প্রভু যিশুকে আমাদের অপরাধ-অপকর্মের জন্যেই মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের অন্তরে ধার্মিকতা ফিরিয়ে আনবার জন্যেই তো তাঁকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে। (*রোমীয় ৪:২৫*)।"

৫) আমরা ঈশ্বরের আত্মাকে অন্তরে লাভ করি। "তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের উপর নেমে এলে তোমরা কিন্তু শক্তি লাভ করবে। তখন জেরুসালেমে, সমগ্র যুদেয়ায় ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তোমরা আমর সাক্ষী হবে।" (*শিষ্যচরিত ১:৮*)।

৬) মৃত্যুবিজয়ী ঈশ্বর আমাদের আশার আলো। "আমরা যারা বিশ্বাসী, তাদের মঙ্গলসাধনে কতই না অসীম তাঁর কর্মশক্তির মাহাত্ম্য! তাঁর সেই একই প্রবল কর্মশক্তিকে তিনি তো সক্রিয় করে তুলেছেন খ্রিস্টের মধ্যে, যখন তিনি খ্রিস্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন এবং স্বর্গধামে নিজের ডান পাশেই তাঁকে বসিয়েছেন (*এফেসীয় ১:১৯-২০*)।"

যিশু পুনরুত্থিত না হলে:

১) মূল্যহীন হতো আমাদের বিশ্বাস এবং বৃথাই যেতো প্রেরিতশিষ্যদের সুসমাচার প্রচার। "খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বাণীপ্রচার অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন! (*১ করিন্থীয় ১৫:১৪*)।"

২) প্রেরিতশিষ্যগণের জীবনসাক্ষ্য মিথ্যা বলে প্রতিষ্ঠিত হত। "শুধু তাই নয়, তাহলে তো এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বরের সমন্ধে আমরা মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছি, কেন না আমরা তো ঈশ্বরের সমন্ধে সাক্ষী দিয়েই এতদিন এই কথা বলে এসেছি যে, তিনি খ্রিস্টকে পুনরুত্থিত করেছেন আর আসলে তিনি তা করেননি, যদি সত্যিই মৃতেরা পুনরুত্থিত না হয় (*১ করিন্থীয় ১৫:১৫*)।"

৩) আমরা এখনো পাপে নিমজ্জিত থাকতাম। "কিন্তু খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে মিথ্যাই তোমাদের বিশ্বাস, তোমরা আজও তোমাদের সেই পাপী অবস্থাতেই পড়ে আছ (*১ করিন্থীয় ১৫:১৭*)।"

৪) আমরা মৃত্যুতে বিলীন হয়ে যেতাম। "শুধু তাই নয়, তাহলে খ্রিস্টের শরণাপন্ন অবস্থায় মৃত হয়েছে যারা, তাদের নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটেছে" (*১ করিন্থীয় ১৫:১৮*)।

সুতরাং খ্রিস্টের পুনরুত্থান এই সত্য ঘোষণা করছে- আমাদের পুনরুত্থান এক সুনিশ্চিত সত্য। "কেননা এই জগতে মৃত্যুর আসার কারণ যেমন একজন মানুষ, মৃতদের পুনরুত্থানের কারণও তেমনি একজন মানুষ (*১ করিন্থীয় ১৫:২১*)।"

পুনরুত্থান একটি নিগূঢ় রহস্য: পুনরুত্থান হলো একটি নিগূঢ় রহস্য, যা খ্রিস্টবিশ্বাসের উৎস ও প্রেরণা। আমরা বিশ্বাস করি যে, শেষ দিনে আমরা সকলেই সশরীরে পুনরুত্থিত হবো। প্রতিদিনের জীবনে পাপ কাজের দ্বারা আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুকে বরণ করি। সমরূপে আমাদেরকে পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতাও করতে হয়, কেননা আমাদের জীবন যে কোনভাবেই মৃত্যুতে সীমিত নয়। তাই আমরা মৃত্যু গহ্বরে তলিয়ে যেতে পারি না, বরং আমাদেরকে পুনরুত্থানের আশা অন্তরে ধারণ করতে হয়। মানুষ হতাশা নিরাশার পরেও আশায় ঘর বাঁধে, দুঃখের পরে সুখের স্বপ্ন বোনে, পরাজয়েও বিজয়ের স্বপ্ন দেখে, অসুস্থতায়ও সুস্থতার পথ খুঁজে, সমস্যায় সমাধানের পথ রচনা এবং পুনরুত্থানের আনন্দে জীবন যাপন করে। আমরা কে না পুনরুত্থানের স্বাদ আস্বাদন করতে চাই! তবে আমাদের প্রত্যেককেই এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, পুনরুত্থানের পুষ্পমাল্য গলে পরিধান করার পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হয়। তাই নিশ্চয় আমাদের এই মৃত্যু নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার নামান্তর হবে না, কারণ আমরা কেউই মৃত্যুতে শায়িত হতে জন্ম নেইনি, বরং পুনরুত্থিত হতেই আমরা মৃত্যুকে মেনে নেই। খ্রিস্টের সাথে পুনরুত্থিত হতে চাইলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। সেজন্য মৃত্যুর আয়োজন যত বেশি বিশুদ্ধ ও অর্থপূর্ণ হবে

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শূন্য সমাধি : কিছু অভিজ্ঞতা

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

যিশুখ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান খ্রিস্টবিশ্বাসের প্রধান স্তম্ভ। যারা এই দুটি মৌলিক সত্যকে অস্বীকার করে, তারা প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টকে ও খ্রিস্টধর্মকে অস্বীকার করে। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে, বিশেষভাবে মঙ্গলসমাচারে যিশুখ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয়ে মঙ্গলসমাচার রচয়িতাগণ বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, চারজন মঙ্গলসমাচার লেখকের যিশুখ্রিস্টের যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ঘটনা একসাথে সংকলন করলে, তা যিশুখ্রিস্টের জীবন সম্পর্কে তাদের পুরো বর্ণনার এক-তৃতীয়াংশ হিসাবে আবির্ভূত হয়। শুধু তাই নয়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐশতত্ত্ব ভিন্ন হলেও, যিশুখ্রিস্টের মৃত্যু-কাহিনী ও পুনরুত্থান ঘটনা বিরবণীতে রয়েছে অসম্ভব মিল ও সামঞ্জস্যতা। এটা থেকে বুঝা যায়, তারা কত গুরুত্ব দিয়ে যিশুখ্রিস্টের জীবনের এই অংশটুকু পাঠক ও বিশ্বাসীদের কাছে তুলে ধরেন।

প্রকৃতপক্ষে, যিশুখ্রিস্টের সম্পর্কে প্রচারের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান"। পঞ্চাশত্তমী দিনে যখন পবিত্র আত্মা শিষ্যদের মধ্যে অবতরণ করেন, প্রেরিতশিষ্যগণ, বিশেষভাবে পিতর তার ভাষণে ভূমিকা হিসাবে যিশুখ্রিস্টের বর্ণাঢ্যময় কর্মজীবন যা জেরুশালেমবাসী অভিজ্ঞতা করেছিলেন, তা সংক্ষেপে তুলে ধরেন। কিন্তু তা প্রধান লক্ষ্য ছিল যিশুখ্রিস্টের মৃত্যুজয়কে তাদের কাছে উপস্থাপন করা, "কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে পুনরুত্থিত করেছেন, কারণ মৃত্যু যে তাঁকে নিজের বশ্যতায় ধরে রাখবে, তা সম্ভব ছিল না" (*শিষ্য ২:২৪*)। শিষ্যগণ শুধুমাত্র প্রাক্তনসন্ধির পূর্ণতা হিসাবে যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থানের সুসংবাদ প্রচার করেন নি, বরং তা তারা করেছেন পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সরাসরি দর্শন ও আদান-প্রদানের প্রতিফলন হিসাবে, "এই যিশুকেই ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছেন, আর আমরা সকলেই তার সাক্ষী" (*শিষ্য ২:৩২*)।

যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রেরিতশিষ্যদের সাক্ষ্যের প্রথম উপাদান হচ্ছে "শূন্য সমাধি"। এই শূন্যতা থেকে শুরু হল খোঁজা। কি হলো? কোথায় গেল? কোথায় নিয়ে গেল? কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে? মাগদালার মারীয়ার দ্বারা তা শুরু হলেও পরে তা নিয়ে একটা হুলস্থুল শুরু হয়ে গেল। তাই তো শিষ্য পিতর ও যোহন ছুটে আসে যিশুখ্রিস্টের সমাধিস্থানে এবং কবরে ঢুকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবকিছু তারা অবলোকন করেন, যা ফুটে উঠেছে যোহনের বর্ণনায়, "সমাধিগুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, ফালিগুলো পড়ে

ছবি: লেখক

রয়েছে, আর যে রুমালটা যিশুর মাথার উপর ছিল, সেটা ফালিগুলির সঙ্গে নয়, আলাদাভাবে অন্য এক স্থানে রয়েছে, গোটানো অবস্থায়" (*যোহন ২০:৬*)। এই বর্ণনায় লেখক বুঝাতে চেয়েছেন যে, যিশুখ্রিস্টের শবদেহকে কেউ তুলে নিয়ে যায়নি বা কবর থেকে চুরি করা হয় নি, বরং পরোক্ষভাবে এটি অতি আশ্চর্য কোন বিষয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছে, যিশুখ্রিস্ট যে মৃতদের মধ্যে আর নেই তারই একটা পূর্ববার্তা যোহন তার পাঠককুলকে প্রদান করলেন। এভাবে মাগদানার মারীয়া, পিতর ও যোহনের যিশুখ্রিস্টের শূন্য সমাধির অভিজ্ঞতা হয়ে উঠল- যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থানের প্রথম নির্দশন। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষাও এই উপাদানটিকে অতি গুরুত্বসহকারে লিপিবদ্ধ করেছে, "পুনরুত্থান-উৎসবের ঘটনাবলীর বর্ণনায় শূন্য সমাধি সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য শূন্য সমাধিটাই পুনরুত্থানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়; সমাধিতে খ্রিস্টের দেহ না-থাকা অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এতদ্‌সত্ত্বেও শূন্য সমাধি এ সবকিছুর একটি অপরিহার্য চিহ্ন। তার আবিষ্কার শিষ্যদের জন্যে পুনরুত্থানের সত্যকে স্বীকার করার প্রথম ধাপ" (*# ৬৪০*)।

যে সমাধি স্থান সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল লেখকগণ, বিশেষভাবে নতুন নিয়মে ও পরবর্তী বাইবেল বিশারদগণ বিভিন্নভাবে গবেষণা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে স্থানটিকে দেখার, স্পর্শ করার, খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও প্রার্থনা করার সর্বোত্তম সুযোগটি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে এসেছিল। ঈশ্বর মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিনিয়ত অনুগ্রহ দিয়ে যাচ্ছেন। জীবনে প্রতিক্ষণে ঈশ্বরের ভালবাসা উপলব্ধি করছি, তবে এই অভিজ্ঞতা অন্য সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়।

যদিও বেশ কয়েক বছর পার হয়ে গেল, তথাপি পুণ্যভূমিতে একমাস অবস্থান করার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি আমার অন্তরে শিখাচিরন্তরের মতো প্রতিনিয়ত জ্বলছে। জেরুশালেমে বিবলিকোম (Biblicum) ইস্টিটিউটটি প্রথম শতাব্দীর যে আদি জেরুশালেম শহর তার ঠিক পাশেই অবস্থিত। আমরা সেই প্রতিষ্ঠানেই অবস্থান করেছি। সেখানে থেকে যিশুখ্রিস্টের সমাধিগৃহ দশ মিনিটের মতো সময় লাগে। এটি বর্তমানে একটি গির্জার ভিতরে অবস্থিত, যার নাম হচ্ছে "পবিত্র কবরের গির্জা" (Basilica of the Holy Sepulcher)। এর ভিতরেরই রয়েছে পবিত্র মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত গলগথা (যেখানে যিশুকে ক্রুশে দেয়া হয়), মৃত্যুর পর যিশুর মরদেহ তেল দিয়ে লেপনের পাথর, তাঁর করব, মাগদালার মারীয়াকে যিশুখ্রিস্টের দর্শনের স্থান এবং যে যিশুকে বিদ্ধ করা হয়েছিল তা পাওয়ার জায়গা। যাই-হোক, যিশুর কবরের অবস্থানটি গির্জার ঠিক সামনের অংশে বা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

যেহেতু পবিত্র বাইবেলের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশে আমাদের সেখানে যাওয়া, তাই শিক্ষকগণ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিষয়সমূহ আমাদের কাছে তুলে ধরেন বিশেষভাবে এই লেখায়

উল্লেখিত যিশুখ্রিস্টের সমাধি সম্পর্কে উপস্থাপন করেন। এই স্থানটি তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যের জেরুশালেম শহরের দেয়ালের বাইরে ছিল। তবে এটি প্রেরিতশিষ্য তথা আদিমণ্ডলীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। যদিও রোমান সম্রাট খ্রিস্টধর্মকেস্বীকৃতি দেননি, ইহুদী নেতারা নতুন এই ধর্মমতকে থামানোর জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন, নির্যাতন করেন, তথাপি খ্রিস্টভক্তদের কাছে এই জায়গাটি হয়ে উঠেছিল একটি তীর্থভূমি, তারা নিয়মিত এখানে যাতায়াত করত। যার কারণে যিশুখ্রিস্টের জীবনে এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি নির্ধারণ নিয়ে বিতর্কের তেমন অবকাশ ছিল না। তারপরও রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন তার মা সাধ্বী হেলেন এর অনুরোধে সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ করেন। এই খনন কাজের ফল সুদূরপ্রসারী। গলগথা পাহাড়ের পশ্চিম পাশে অর্থাৎ পাদদেশে খননকাজে মিলল প্রথম শতাব্দির বেশকিছু করবের গুহা। অনেক গবেষণা ও তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনার পর একটি বিশেষ করবকে যিশুখ্রিস্টের সমাধিস্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তবে খননকাজের মধ্যদিয়ে পাওয়া কবরস্থানটি জনগণ বা তীর্থযাত্রীর জন্য উন্মুক্ত নয়। বিশেষ অনুমতিক্রমে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব। শিক্ষার্থী হিসাবে আমরা সেটি পরিদর্শন ও এর সম্পর্কে বিস্তারিত ইতিহাস জানার বিরল সুযোগ হয়েছিল। মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত লাজারের বা যিশুর করবের সাথে এগুলোর মিল দেখতে পেলাম। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র বিশেষভাবে চিহ্নিত যিশুখ্রিস্টের কবরটি সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা আছে যাতে বিশ্বাসী ও তীর্থযাত্রীগণ তা পরিদর্শন করে তাদের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করতে পারে।

বিশ্বাসী হিসাবে আমিও এই সুযোগ বেশ কয়েকবার গ্রহণ করছি। জেরুশালেমে অবস্থানকালে যখনই আমি সুযোগ পেয়েছি ছুটে গিয়েছি খ্রিস্টবিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তীর্থভূমিতে। কেননা খ্রিস্টবিশ্বাসের ভিত্তির বীজ তো এখানেই রোপিত হয়। কেননা জগতের মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্ট এই স্থানেই ক্রুশেবিদ্ধ হন, মারা যান, পুনরুত্থান করেন এবং মাগদালার মারীয়ার কাছে তিনি প্রথম দেখা দেন। প্রচুর তীর্থযাত্রীর আগমনে এই স্থানটি সবসময় জনাসমাগমে পরিপূর্ণ থাকে। তবে খুব ভোরে কেউ খ্রিস্টযাগ করতে চাইলে তার সুযোগ ছিল। আমরা কয়েকজন বন্ধু যাজক এই সুযোগটি গ্রহণ করেছিলাম। যিশুখ্রিস্টের সমাধিতে একান্তভাবে প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার অভিজ্ঞতা লাভ করি। বিশ্বাসের যাত্রায় অন্য রকম এক অনুভূতি যুক্ত হয়।

এই লেখার মূল উদ্দেশ্য হল যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থানের প্রথম নিদর্শন "শূন্য সমাধি"- এর সাথে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পাঠকের কাছে তুলে ধরা, অন্য কিছু নয়। পবিত্র মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ে অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, এগুলোর ঐতিহাসিক ও প্রামাণিক সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে, পবিত্র বাইবেল, তথা যিশুখ্রিস্টের বিষয়ে জগতে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। তারা প্রমাণ করেছেন যে, যিশুখ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান অলীক বা কাল্পনিক কোন কাহিনী নয় বা প্রেরিতশিষ্যদের মনগড়া কোন গল্প নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, বিশ্ব ইতিহাসের অংশ। মানবমুক্তির জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যুগ যুগ ধরে যে পরিকল্পনা করেছেন, তারই বাস্তবায়ন- যা যিশুখ্রিস্টের মধ্যদিয়ে তা তিনি ঘটিয়েছেন। শূন্য সমাধিতে তা যেন পরিপূর্ণতা পেয়েছে। তাই, এটা কোনভাবেই মন্দতা, ভয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস বা মৃত্যুর প্রতীক নয় বরং নতুন দিগন্ত ও আস্থার চিহ্ন, বিশ্বাস, আশা ও ভ্রাতৃপ্রেম নবায়নের বার্তাবাহক॥ ❑

পুনরুত্থান অনন্ত জীবনের আশ্বাস দেয়

(৮ পৃষ্ঠার পর)

অর্থাৎ যত ভাল, পবিত্র জীবন যাপন করব, আমাদের পুনরুত্থানের মহিমা তত বেশি গৌরবময় হবে। তাই প্রতিনিয়তই মৃত্যুর জন্য আমাদের প্রস্তুতি থাকতে হবে। এই প্রস্তুতি হলো সুসমাচারীয় জীবন যাপন করা।

শূন্য সমাধির আনন্দ: প্রভু যিশু সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন। কবর তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। শূন্য সমাধি আমাদের কাছে এই শুভ বারতা ঘোষণা করে যে, আমরা যেন পুনরুত্থিত খ্রিস্টকেই অন্বেষণ করি। তাই জীবিত যিশুকে মৃতদের মাঝে খুঁজে বেড়ানো কেবলই বৃথা পরিশ্রম। যিশুর দর্শন লাভ করতে হলে আমাদেরকেও জেগে উঠতে হবে। আমাদের জীবনে সমস্ত মলিনতা, জরাজীর্ণতা, পাপ-পঙ্কিলতা পরিহার করতে হবে। দূর করতে হবে স্বার্থপরতা, অন্যায্যতা, দ্বন্দ্ব-কোলাহল। হিংসা, রেষারেষি, মনোমালিন্য, অহংকার ভুলে একসাথে মিলেমিশে বাস করতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের মন্দতাগুলো শূন্য করবের ন্যায় বর্জন করতে হবে। পক্ষান্তরে খ্রিস্টীয় আদর্শে ও মূল্যবোধে পরিপূর্ণ করতে হবে আমাদের জীবন। "অসৎ যা কিছু, তা ঘৃণা কর; যা সৎ তা আঁকড়েই ধর। ভ্রাতৃবন্ধন যেন তোমাদের মধ্যে গভীর স্নেহ বন্ধন গড়ে তোলে। তোমরা একে অন্যকে বেশি সম্মানের যোগ্য বলেই মনে কর। নিরলস আগ্রহ নিয়ে, উদ্দীপ্ত হৃদয়েই তোমরা প্রভুর সেবা করে যাও। আশা তোমাদের মনটাকে আনন্দিত করে রাখুক" (*রোমীয় ১৩:৯-১১*)। নিঃসন্দেহে খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের বিজয়ী ও স্বাধীন করে তুলবে। "তিনি তাদের বললেন : তোমাদের শান্তি হোক। এই কথা বলে তিনি তাঁর দুটি হাত আর বুকের পাশটি তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে সামনে দেখে শিষ্যেরা তো মহা আনন্দিত" (*যোহন ২০: ২০*)। শূন্য সমাধি আমাদের এই আশ্বাস ও আনন্দ দেয় আমরাও একদিন খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হব।

উপসংহার: মৃত্যু হলো আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অপবলি। সাধু পল মৃত্যুকে মানব জীবনের চূড়ান্ত শত্রু বলে অভিহিত করেছেন (*১ করিন্থীয় ১৫:২৬*)। ঈশ্বর কখনো চান না যে আমরা মৃত্যু বরণ করি। কিন্তু তারপরেও জগতের বস্তবতায় আমরা দেখি যার শুরু আছে তার শেষও আছে। জন্মিলে মরিতে হবে। আর খ্রিস্টবিশ্বাস বলে না মরলে কেউ পুনরুত্থান করতে পারে না। স্বয়ং প্রভু যিশুও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। মৃত্যু ছাড়া পুনরুত্থান সম্ভব না। কিন্তু আমরা মৃত্যুবরণ করতে চাই না। আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাটাকে অপব্যবহার করে ঐশ ইচ্ছার বিরোধিতা করি। তাই আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তুচ্ছ করে মানবীয় ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেই, তখনই আমরা আমাদের শত্রু মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি। একবার মৃত্যু বরণ করলে আমরা কিন্তু নিজ শক্তিতে পুনর্জীবিত হতে পারি না, কেননা আমরা তখন পাপের বন্ধনে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ি। তখন আমরা ঈশ্বরের দয়া-অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করি। আমাদের সকল চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-আকাঙ্খা ও স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সমর্পণ করতে হয়। যখন আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করি, তখনই আমরা ঐশ জীবনে প্রবেশ করি। আমরা একটি নতুন জীবন লাভ করি। এখানেই আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসের স্বার্থকতা। খ্রিস্টের প্রতিশ্রুতি অনুসারে শেষ দিনে আমরা তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থিত হব॥ ❑

CARITAS DEVELOPMENT INSTITUTE (CDI) * 1983 *

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' এর সকল পাঠক/পাঠিকাবৃন্দকে

পাস্কাপর্ব উপলক্ষে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বিশ্বাস করে

মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক ক্ষমতায়ন একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার পূর্বশর্ত।

আমরা সম্পূর্ণ আবাসিক ও সর্বাধুনিক ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকি। আমাদের সঙ্গে আছেন দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, যারা সার্বক্ষণিক কারিতাস ও সমমনা প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা অর্জনে দীর্ঘ সময় ধরে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। আমাদের মেধাবী গবেষকদল অব্যাহতভাবে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বেইজ লাইন সার্ভে, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, এ্যাকশন রিসার্চ, ইমপ্যাক্ট স্টাডিসহ যে কোনো সামাজিক গবেষণাসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে আস্থা অর্জন করেছে।

পরিচালক, ফ্যাকাল্টী সদস্যগণ, গবেষকগণ ও সকল কর্মীবৃন্দ

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

ফোন: ৯৩৩৯৬২৫, ইমেইল- cdi@caritascdi.org

www.caritascdi.org

বিজ্ঞ/১৩২/২০২৩

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।

প্রকৃতির অমোগ বিধান,"জন্মিলে মরিতে হইবে"। দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল অনেক সময়, তোমরা চলে গেছ পরপারে, স্নেহ ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে। তোমাদের স্নেহ ভালোবাসায় ধন্য আমরা। প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমাদের শূন্যতা। তোমাদের অমায়িক হাসি, সরলতা, সদালাপ, উদারতা, বন্ধু-বাৎসল্য, স্নেহপরায়ণতা, হৃদয়গ্রাহী ভালবাসা আজও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয় নীরবে নিস্তব্ধতায়। তোমরা ছিলে, আছ, থাকবে আমাদের ভালবাসা হয়ে, অন্ধকারে আলো হয়ে, সুদিন হয়ে প্রতিদিন।

১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জন পিটার কস্তা
জন্ম: ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া, পো.অ: কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

২য় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত লতিকা জার্লেট কস্তা
জন্ম: ৪ এপ্রিল, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৮ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া, পো.অ: কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে-
ছেলে ও ছেলে বউ: পলাশ ও লিজা
মেয়ে: লিপি, নুপুর, ঝুমুর ও ঝুমা
মেয়ে জামাই: প্রদীপ, বিলাশ ও রিচার্ড
নাতি: স্ট্রীগ, রিদম ও পিটার-পার্থিব
নাতনি: ক্ষ্যাবি, ক্ষ্যালি, ক্ষ্যারি, লীথী, লরা, রায়না ও লিরিক।

বিজ্ঞ/১০৪/২০২৩

পরমধামে যাত্রা

প্রয়াত সুনির্মল পিটার পিরিজ
জন্ম: ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বড়ইহাজি (পিরিজ বাড়ি)
শুলপুর ধর্মপল্লী

ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায়
বাজায় বাশি
ভালোবাসি ভালোবাসি
আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে
দিগন্তে কার কালো আঁখি
আঁখির জলে যায় ভাসি
ভালোবাসি
ভালোবাসি ভালোবাসি

আমাদের ভালবাসা, আশা-ভরসার স্থল আমাদের বাবা; সুনির্মল পিটার পিরিজ ঈশ্বরের অমোঘ নিয়তিকে মেনে ১০ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে আকস্মিক পরমধামে চলে গেলেন। তার এই আকস্মিক চলে যাওয়া আমাদের কাম্য ছিল না, মেনে নেওয়াও অতিব কষ্টকর। সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বরণ করে পরম পিতার আশ্রয়ে চলে গেলেন তিনি চিরতরে।

সবাইকে সহজে আপন করে নেওয়ার সুন্দর গুণ ছিল তার মধ্যে। আকস্মিকভাবে তাকে হারিয়ে আমরা সকলে খুবই শোকাহত ও দিশেহারা। তার আকস্মিক অসুস্থতার সময় হতে সমাধি পর্যন্ত যারা আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং প্রার্থনায় স্মরণ করেছেন ও করে যাচ্ছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

সুনির্মল ছিলেন সহজ-সরল, বন্ধুবৎসল, অতিথিপরায়ণ, সৎ, পরিশ্রমী, শান্তিপ্রিয় ও পরিবারপ্রেমী প্রার্থনাশীল মানুষ। প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন তাঁর ভালবাসার আশ্রয়ে আমাদের প্রিয় বাবাকে অনন্ত শান্তি দান করেন। আর আমরা তার প্রিয়জনেরা যেন তার আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করে ভালবাসায় ও শান্তিতে একাত্ম থাকতে পারি। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের মা, তোমার প্রিয়জন ও আমাদেরকে আশির্বাদ দান কর।

তোমার প্রিয়জনেরা -
ছেলে-ছেলে বউ : আবির যোসেফ পিরিজ-অদিতি ক্যাথরিন রোজারিও
ছেলে : অর্ঘ্য সিপ্রিয়ান পিরিজ
স্ত্রী : মুক্তি লুসিয়া পিরিজ
|| এবং আত্মিয়স্বজনেরা

বিজ্ঞ/১০৪/২০২৩

সুসমাচার প্রচারে নারীরা

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

"প্রভু বাক্য দেন, শুভবার্তার প্রচারিকাগণ মহাবাহিনী।" বাইবেলের গীত সংহীতায় (*৬৮:১১*) যে মহাবাহিনীর কথা বলা আছে সেই বাহিনীর সদস্য হলো পরিবারের মা-বোন ও কন্যাসন্তানেরা, যারা তাদের নিত্য কর্মে ও আচরণে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেছেন এবং আজও তা অব্যাহত রয়েছে। পবিত্র বাইবেলে আমরা আরও দেখতে পাই, প্রথম শতাব্দীতে যে সকল নারী সুসমাচার প্রচার করেছিল তাদের মধ্যে ছিল কৈশরিয়ার সুসমাচার প্রচারক ফিলিপের চার জন কুমারী কন্যা। (*প্রেরিত ২১:৮, ৯*) তারাও পিতার ন্যায় তাদের কাজের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের মহিমা ও বাক্য প্রচারে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন।

যিশুর আশ্চর্য কাজের সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যদিয়ে অনেক নারী ঈশ্বরের গৌরব ও প্রসংশা ছড়িয়েছেন যা আমরা দেখতে পাই গালীল নগরে-গেরাসেনীদের দেশে প্রদর (স্ত্রীরোগবিশেষ) রোগগ্রস্ত এক নারীর সুস্থতার মধ্যদিয়ে। যিশুর প্রতি বিশ্বাস নিয়ে সেই নারী যিশুর পিছন থেকে কাপড় স্পর্শ করে সুস্থতা লাভ করেন। সেই নারীও যিশুর আশ্চর্য কাজের সাক্ষ্য দিয়েছেন তার বিশ্বাস ও পরিত্রাণের মধ্যদিয়ে ।

যিশু যখন ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে করতে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করতেন তখন তার সঙ্গে কয়েকজন স্ত্রী লোকও ছিলেন, তারা হলেন মাগদালার মারীয়া, যোহানা, যোয়ানা ও অন্য অনেক স্ত্রী (*লুক ৮:১-৩*) ।

পবিত্র বাইবেলে থেকে আমরা আরও অবগত হই যে, ৩৩ খ্রিস্টাব্দের পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রায় ১২০ জন পুরুষ ও নারী ঈশ্বরের আত্মা লাভ করেছিলেন (*প্রেরিত ২:১-৪*) এবং আত্মা তাদের যেরূপ বাক্য দান করলেন তদনুসারে তারা সকলে পরবর্তীতে নিজ নিজ ভাষায় ঈশ্বরের মঙ্গলবাণী প্রচার করেছেন।

যিশুর জন্মের পর থেকে শুরু করে আজও অবধি নারীরা বিভিন্নভাবে মঙ্গলসমাচার প্রচারে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। মা-বোনেরা পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদের ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত করে তোলেন। সন্তানের ধ্যানে-জ্ঞানে ঈশ্বরকে ধারণ করা ও ঈশ্বরের সেবক হবার অনুপ্রেরণা দানে পরিবারে নারীর ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। সেই অর্থে পরিবারের সেই মা-বোনেরাও এক একজন ঈশ্বরের সেবক হয়ে ওঠেন। পরিবারে একজন আদর্শ ও ধর্মভীরু মা সব সময়ই চান তার সন্তান ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে ব্রতীয় জীবন লাভ করুক এবং প্রতিনিয়ত তিনি সন্তানের পরিচর্চা করে তাকে উপযুক্ত করে তোলেন। এই অনুপ্রেরণাদানকারী নারীও একজন সুসমাচার প্রচারক এবং তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহান। তারা কেবল নিজ পরিবারে আপন সন্তানদের ঐশবাণী শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, তাদের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি আরও বিশাল। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই বিভিন্ন নারী সংগঠন ও দল রয়েছে, তারা একত্রিত হয়ে অসুস্থ ব্যক্তিদের সুস্থতার জন্য সমবেত প্রার্থনার আয়োজন করে থাকেন যা সর্বত্রই ঈশ্বরের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা বৃদ্ধি করে। মানুষ তাদের সুখের বিষয়ে ঐ সকল নারীদের আহ্বান করেন ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য, একইভাবে দুঃখের সময়ও সান্ত্বনা লাভের জন্য ও বিপদমুক্ত হবার জন্য তাদের প্রার্থনা যাচ্না করে থাকেন। আমাদের দেশে এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে এখনও জনগণের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছায়নি, এখনও তারা খ্রিস্টের আদর্শ ও আশীর্বাদের সন্ধান পায়নি। সেই সমস্ত এলাকাতেও ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে সাহসের সাথে পৌঁছে যাচ্ছেন সচেতন ও ধার্মিক নারীরা। তারা প্রার্থনা, ধ্যান ও আলোচনার মধ্যদিয়ে যিশুর জীবন আদর্শ তুলে ধরছেন মানুষের কাছে। যে সকল পরিবারে ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও ভালোবাসা নেই, যারা বিপথে গিয়ে নিজের জীবনকে ধ্বংস করে, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করে নারীদের একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর এই যে স্পৃহা বা সঙ্কল্প তা সম্পূর্ণ ঈশ্বর প্রদত্ত। স্বয়ং পবিত্র আত্মাই তাদের এই কাজের সহায়তা ও ইচ্ছাশক্তি দান করে থাকেন।

সংসার ধর্ম ত্যাগ করে যারা সন্ন্যাস বা ব্রতীয় জীবনে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই হলো নারী। এই ব্রতধারিনী সেবিকারা তাদের সেবা কর্ম ও ধর্ম প্রচারের মধ্যদিয়ে মানুষের মনে বিশ্বাস ও ঈশ্বর প্রেম বৃদ্ধি করে চলেছেন। আমরা এমন অনেক ব্রতধারিনী সিস্টারদের সম্পর্কে জানি যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা ও মঙ্গলবাণী প্রচারে নিয়োজিত রয়েছেন। অনেকে বিভিন্ন হাসপাতালে সেবাকার্যের মধ্যদিয়ে খ্রিস্ট ধর্মের আদর্শকে তুলে ধরছেন। সিস্টার অবলেট এমসি যিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত খ্রিস্টান কর্মীদের মধ্যে বাইবেলের আলোকে নিয়মিত আধ্যাত্মিক পরিচর্চা করে তাদের মধ্যে সংস্কার গ্রহণের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, বর্তমানে তিনি ঠাকুরগাঁও এ দরিদ্র ও স্বল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠির বাড়িতে বাড়িতে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে সামাজিকভাবে জীবনযাপনের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আরও হাজার হাজার ব্রতধারিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে জানি, যারা তাদের পুরোটা জীবন ঈশ্বরের বাণী প্রচারের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। তারা মিশনভিত্তিক শিশুদের মাঝে ধর্মশিক্ষা দান, বিভিন্ন সংস্কার গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা, পরিবার গঠনে খ্রিস্টের আদর্শ অনুসরনের শিক্ষা, আরও অনেক ভাবে ঈশ্বরের বাক্য মানুষের মাঝে পৌঁছে দিচ্ছেন ও তাঁর মঙ্গলবাণী প্রচার করছেন।

সুতরাং মানুষের সামনে যে কেউ স্বীকার করবে, সে আমারই একজন, আমিও তাকে আমার স্বর্গনিবাসী পিতার সামনে আমারই একজন ব'লে স্বীকার করব। কিন্তু মানুষের সামনে যে কেউ অস্বীকার করবে, সে আমারই একজন , আমার স্বর্গনিবাসী পিতার সামনে আমিও তাকে নিজের একজন ব'লে অস্বীকার করব। (মথি ১০:৩২-৩৩)।

ভাববাদীর এই সত্য উচ্চারণ অন্তরে ধারণ করে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থেকে তার বাণী প্রচারের জন্য অনেক নান বা সিস্টারকে জীবনও দিতে হচ্ছে তবুও তারা পিছিয়ে নেই কেউ। সেই বিশ্বস্ত নারীরা যিশুকেই তাদের জীবন স্বামীরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং যিশুর দেখানো পথে হেঁটে দেশ-দেশান্তরে সুসমাচার প্রচার করে যাচ্ছেন।

খ্রিস্টীয় সমাজে সকল নারীর জীবনে অনুপ্রেরণা ও পরম শক্তির আধার যিশুর মা কুমারী মারীয়া, যিনি ঈশ্বরপুত্র যিশুকে বিনা দ্বিধায় গর্ভে ধারণ করে পৃথিবীতে তার জন্মের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর এই অগাধ শক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যদিয়ে তিনি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করেছেন। সৃষ্টির শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত নারীরা মা মারীয়ার আদর্শ বুকে ধারণ করে সংসারের পাশাপাশি ঈশ্বর গৃহের পরিচর্চা করে আসছেন। যেখানে অধর্ম, যেখানে অসত্য যেখানেই তারা ছুটে যান এবং যিশুর জীবন আদর্শ ও মঙ্গলবাণী প্রচারের মাধ্যমে শান্তি আনয়ন করেন।

জগত সৃষ্টির পর ঈশ্বর যখন প্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন ঈশ্বর নিজেও জগতের পরিপূর্ণতার অভাব অনুভব করে এক নারী হবাকে সৃষ্টি করলেন, সেই নারীই জগতের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে এক বিশেষ উপহার। ঈশ্বর তাঁর পুত্র যিশুর মধ্যদিয়ে অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছেন এবং অনেক নারীকে সেই কাজে সাক্ষ্য দানের জন্য নিয়োজিত করেছেন। এখনও পর্যন্ত ঘরে ঘরে আমরা সেই সব নারীদের দেখতে পাই যারা সংসারে কাজের পাশাপাশি ঈশ্বরের কাজ করার জন্য তাঁর সাক্ষ্য বহন করার জন্য অনুপ্রেরণা অনুভব করেন॥ ❑

যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান: নতুন মানুষ হবার আহ্বান

ফাদার শিশির কোড়াইয়া

যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থানই হল খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল। এ বিশ্বাস মানব মুক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক। এ বিশ্বাসের ফলে মানুষ অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়। সাধু যোহন বলেন, ''পরমেশ্বর জগতকে এতোই ভালোবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করেছেন যেন তার বিনাশ না হয় বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন (*যোহন ৩:১৬*)।"

যিশু জগতে এসেছেন মানবজাতির মুক্তির জন্য। এ মুক্তি কেবল শারীরিক, মানসিক ব্যধি হতে মুক্তি নয়। এ মুক্তি আপামর সকল মানুষের সার্বিক অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক মুক্তি। এ মুক্তি লাভ করার জন্য বিশ্বাস প্রয়োজন। মানুষ প্রধাণত:বাহ্যিক বিষয়ে প্রভাবান্বিত হয়। যিশু শারীরিক ব্যধি, ভূতাবিষ্ট লোককে মানসিক ব্যধিমুক্ত করে আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে এ বিশ্বাস মানুষের হৃদয়মনে জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আসল বিষয় হল আত্মিক নিরাময় এবং তা মানুষ গ্রহণ করে হৃদয়মনে বিশ্বাস করে। ''যারা স্নান করেছে, শুধু পা ছাড়া তাদের আর কিছু ধোবার প্রয়োজন নেই, সর্বাঙ্গেই তারা শুচি। তোমরা তো শুচি কিন্তু সকলে নও। তিনি অবশ্য জানতেন, কে তাঁকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে। তাই তিনি বললেন, তোমরা সকলে শুচি নও" (*যোহন ১৩:১০-১১*)। বিশ্বাসের গুণে শিষ্যগণ পবিত্র আত্মার অবগাহনে আত্মায় শুচিতা লাভ করেছিলেন।

যিশুর সশরীরে পুনরুত্থান হল, তিনি যে প্রকৃত ঈশ্বর এবং প্রকৃত মানুষ তার প্রমাণ। ''আমি আপনাকে সত্যি সত্যি বলছি, আমরা যা জানি, তা বলি, যা দেখেছি তারই বিষয়ে সাক্ষী দিই। আপনারা কিন্তু তবুও আমাদের সেই সাক্ষ্য বাণী মেনে নিতে চান না। আমি আপনাদের পার্থিব বিষয়ে কথা বললে আপনারা যখন বিশ্বাস করছেন না তখন স্বর্গীয় বিষয়ে কথা বললে কেমন করেই বা বিশ্বাস করবেন? শুনুন, কেউই স্বর্গে উঠেনি কখনও শুধু একজনই আছে স্বর্গ থেকে যে নেমে এসেছে স্বর্গেই যার আবাস, সে তো মানব পুত্র" (*যোহন ৩:১১-১৩*)। তিনি ঐশ শক্তিতে প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম করে আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন। প্রকৃতির নিয়ম হল কবরে মানব শরীর পঁচে মাটি হয়ে যাওয়া। ''হে মানব তুমি ধূলো এবং ধূলোতে মিশে যাবে।" ভস্মবুধবারে মাতামণ্ডলী খ্রিস্টভক্তকে একথা বলে কপালে ভস্ম ছাপ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যিশুর শরীর কবরে ধূলো না হয়ে বরং গৌরবোজ্জ্বল রূপ নিয়ে পুনরুত্থিত হল। ''তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমরা তো নাজারেথের যিশুকেই খুঁজছো যাঁকে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল। তিনি কিন্তু পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি এখানে নেই, ঐ দেখ, তাঁকে এখানেই রাখা হয়েছিল। এখন যাও তাঁর শিষ্যদের আর বিশেষ করে পিতরকে গিয়ে একথা জানাও" (*মার্ক ১৬:৬*)।

আলেক্সান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ মহান সাধু আথানাসিউস (২৯৭-৩৭৩) পুনরুত্থানের ধ্যানলব্ধ চিন্তায় বলেন, ''হে খ্রিস্ট, তোমার পুনরুত্থানের এই রবিবার দিনে, তোমার দ্বারা সম্পাদিত মহা আশ্চর্যকাজগুলো যখন ধ্যান করি, তখন আমরা বলি : ''ধন্য এই রবিবার, কারণ এই দিনে আরম্ভ হয়েছে সৃষ্টি... পৃথিবীর পরিত্রাণ... মানবজাতির নবায়ন!... রবিবার দিনে স্বর্গ ও পৃথিবী আনন্দ করেছে এবং সমগ্র বিশ্বমণ্ডল আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে! ধন্য এই রবিবার কারণ এই দিনে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে যাতে আদম ও নির্বাসিত সবাই নির্ভয়ে সেই দ্বারের মধ্যদিয়ে প্রবেশ করতে পারে''। পুনরুত্থান পর্বের মাধ্যমে আমরা পুনরুত্থিত খ্রিস্টের দু'টি দিক নিয়ে চিন্তা করি। প্রথমত, ''তাঁর মৃত্যু দ্বারা খ্রিস্ট আমাদের মুক্ত করেছেন; তার পুনরুত্থান দ্বারা তিনি আমাদের কাছে নব জীবনের পথ উন্মুক্ত করেছেন। এই নতুন জীবন পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের ধার্মিক বলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, 'মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি'। ধার্মিকতায় অর্থ দ্বিবিধ : পাপের কারণে যে মৃত্যু এসেছে তার উপর বিজয়ী হওয়া এবং অনুগ্রহে নতুনভাবে অংশগ্রহণ *(কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ধারা, ৬৫৪)*।"

যিশুর পুনরুত্থান আমাদের জন্যে নিয়ে আসে বিজয়, নবজীবন, মুক্তিদায়ী ও চিরস্থায়ী আনন্দ। একমাত্র পুনরুত্থানের মধ্যদিয়েই মণ্ডলীতে বিশ্বাসের জাগরণ এসেছে যার ফলে নবচেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে আমরা দীক্ষা লাভ করেছি। যিশুখ্রিস্ট পিতার বাধ্য থেকে সমস্ত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ও মৃত্যুর জোয়াল কাঁধে নিয়ে স্বগৌরবে পুনরুত্থান করেছেন যেন আমরাও পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা লাভের মধ্যদিয়ে নবজীবন পেতে পারি। প্রভু যিশুর পুনরুত্থান পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের চেয়েও বড় আশ্চর্য ও সত্য ঘটনা। পৃথিবীতে একমাত্র যিশুই মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থান করেছেন এবং স্বশরীরে স্বর্গে গিয়েছেন যা আগে কোনদিন ঘটেনি। তাই বলা হয় যিশুর পুনরুত্থান প্রতিটি খ্রিস্ট বিশ্বাসীর জীবনে বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট, লোভ, লালসা, কামনা, বাসনা সবই যিশুর ক্রুশের তলায় সমাধি দিয়ে যিশুর সাথে পুনরুত্থিত হয়ে নবজীবন লাভ করি যিনি মৃত্যু বিজয়ী হয়ে দান করেছেন বিজয়ী জীবন। তাঁর ধার্মিকতা, ভালোবাসা, ক্ষমার মধ্যদিয়ে তিনি আমাদের পাপময় জীবনকে কবরস্থ করে নতুন মানুষ হয়ে উঠার আহ্বান করেন। খ্রিস্ট বিশ্বাস ও তাঁর নবজীবনে পরিপূর্ণ হওয়ার ভিত্তিই হল পুনরুত্থান। খ্রিস্টের পুনরুত্থান উৎসবে আমরা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নবদৃষ্টি ও নবচেতনায় সমৃদ্ধ হই। খ্রিস্টের পুনরুত্থান সর্বজনীন আনন্দের যা আমাদের মনে প্রাণে আশার সঞ্চার করে, শুভবার্তা সবার মাঝে সবার সাথে সহভাগিতা করার প্রেরণা যোগায়। পুনরুত্থান আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক আনন্দ, শান্তি ও নবচেতনায় উদ্ভাসিত করে তোলে। যিশু প্রতিনিয়ত এই পৃথিবীতে পুনরুত্থান করেছেন এবং আমাদের আহ্বান করে যাচ্ছেন যেন আমরা মুক্তি লাভ করি। তিনি ঈশ্বর পুত্র হয়েও নিজেকে দাসের মত কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করলেন যেন মানুষ মুক্তি পেতে পারে। তিনি চান আমরা যেন পাপের মৃত্যু থেকে নবজীবনের পথে এগিয়ে চলি। আমাদের কাছে এর অর্থ হল সকল পাপ প্রলোভন জয় করে মুক্তি ও কল্যাণের পথে জীবন যাপন করা ও পাপময় জীবনের মৃত্যু ঘটিয়ে যিশুর মত নতুন জীবনে উত্থিত হওয়া।

যিশুর পুনরুত্থান প্রতিনিয়ত আমাদের বাস্তব জীবনে ঘটে চলেছে কিন্তু আমরা অনেক সময় তা উপলব্ধি করি না। তিনি সমাজে সকল অন্যায়, অন্যায্যতা, পাপাচার ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেছেন, মানুষের জন্য সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণময় নবজীবনের সূচনা করেছেন। যিশুর পুনরুত্থান স্বর্গদ্বার খুলে দিয়েছেন যেন আমরা শাশ্বত জীবন পাই। পুনরুত্থান কেবলমাত্র খ্রিস্ট বিশ্বাসের ভিত্তি নয় বরং খ্রিস্টে সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশা। বিশ্বাস বর্ষে পুনরুত্থান আমাদেরকে সত্য-সুন্দর, ন্যায় ও শান্তির পথে নবজীবন লাভের আহ্বান করে। তিনি সর্বদা বলেন, 'তোমরা সবাই সজাগ হয়ে থাক, খ্রিস্ট বিশ্বাসে অটল হয়েই থাক, মানুষের মত মানুষ হও, অন্তরে শক্তি ধর, যা কিছু কর ভালোবাসার প্রেরণাতেই কর' *(১ম করি ১৬:১৩ পদ)*। তাই আমাদের প্রতি খ্রিস্টের আহ্বান হল পুনরুত্থিত খ্রিস্টে বিশ্বাস আরও গভীরতর করে আশা ও ভালবাসায় জীবন নবায়ন করে সত্য সুন্দর জীবন-যাপন করা॥ ❑

কিশোর ও বিশ্বাসীদের কাছে পুনরুত্থিত যিশু

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা: খ্রিস্টধর্মের সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে- 'পুনরুত্থিত যিশু'। মৃত্যুকে জয় করে মানব পরিত্রাণার্থে যিনি বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করেছেন সেই খ্রিস্ট যিশুর পুনরুত্থান বা পাস্কাপর্বের আনন্দ অন্য সকলের মত কিশোর-কিশোরীদের কাছে কোন অংশে কম নয়। কারণ বাবা-মা, আত্মীয়দের সাথে তারা পুণ্য বৃহস্পতিবার, পুণ্য শুক্রবার, পুণ্য শনিবার এবং পুনরুত্থান রবিবার ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগে যোগদান করে। সমস্ত পবিত্র অনুষ্ঠানে তাদের মনোযোগ যিশুকে ঘিরে। পবিত্র খ্রিস্টযাগের উপদেশে যাজক সকলের দিকে দৃষ্টি রেখে পুনরুত্থানের আনন্দ সহভাগিতা করেন। অতএব সকল খ্রিস্টবিশ্বাসী ও আমাদের কিশোর পাঠকদের মনে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের আনন্দবার্তা পৌঁছে দিতে আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পুনরুত্থানের তাৎপর্য: যিশুর মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কয়েক জন নারী বেশ পরিমাণ সুগন্ধি তেল ও দ্রব্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে সমাধিস্থলে গিয়ে কি দেখেছিলেন? কবরের উপরের পাথর সরানো। কবরের ভিতরে দু'জন যুবক দূতকে তারা দেখতে পেলেন। তাদের জিজ্ঞেস করলে যিশু এখানে নেই পুনরুত্থিত হয়েছেন, সে সংবাদটি দর্শনার্থী নারীদের কাছে প্রকাশ হল। যিশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে প্রিয় শিষ্যদের কাছে কমপক্ষে তিনবার উল্লেখ করেছেন। তিনি যে সত্যিকারে পুনরুত্থান করে বিশ্ববাসীর কাছে আশ্চর্যের নিদর্শন রেখেছেন তা পবিত্র বাইবেলের মঙ্গসমাচার লেখকগণ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

যিশু নিজেই মৃত বালক ও বালিকা এবং প্রিয় বন্ধু লাসারকে পুনর্জীবিত করেছেন। মৃতদের স্বজনদের জিজ্ঞেস করেছেন কিভাবে মারা গেছে এবং তারা বিশ্বাস করে কিনা, যে যিশু তাদের জীবিত করতে পারেন। মার্থা-মারীয়াকে বলেছেন: তোমাদের ভাই মারা যায়নি বরং ঘুমিয়ে আছে। লাসারকে পুর্নজীবিত করতে বোনদের বিশ্বাস যাচাই করেছেন এবং বিশ্বাসের গভীরতা থেকে প্রিয় বন্ধু লাসারকে জীবিত বা পুনরুত্থিত করেছেন। বালকের বাবাকে বলেছেন: তুমি বাড়ি গিয়ে দেখবে তোমার ছেলে বেঁচে উঠেছে। বালিকাকে যিশু বললেন: 'টালিথা খুমি' অর্থাৎ খুকি তুমি উঠ। এসব ঘটনাসহ যিশুর শিষ্য শিক্ষা ও বিশ্বাসীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে তারাই ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠে এবং তারাই যিশুর মা-বাবা, সন্তান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

যিশুর পুনরুত্থানের প্রমাণ স্বরূপ তিনি কবর হতে উত্থিত হয়ে ১১ জন শিষ্যকে, মহিলাদের ও আলাদা দু'জনকে, এভাবে বহু ব্যক্তিদের পুনরুত্থিত খ্রিস্টের উপস্থিতি লাভের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। শিষ্য পিতর যখন নারীদের কাছে আনন্দের সংবাদটি পেল, সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে যিশুর কথামত নাজারেথে অন্য শিষ্যদের আনন্দের সংবাদটি পৌঁছে দিল। আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসী ঐশ জনগণ বিশ্বাসের ভিত্তিমূল হিসেবে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আশ্রয়ে জীবনযাপন করছি। যিশুর প্রতিজ্ঞানুসারে যুগের শেষ পর্যন্ত আমি (যিশু) তোমাদের সঙ্গে আছি এ আশ্বাস বাণী মনে প্রাণে, হৃদয়ে ধারণ করে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধে সমস্ত কার্যক্রম চালিয়ে যাছি।

যিশুর পুনরুত্থান কিশোরদের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক সুখবর: বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষা, ধর্মপাঠ্য পুস্তকে যিশুর জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ে ছবিসহ শ্রেণীভেদে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো পাঠ করে শিক্ষার্থীরা জানা থেকে জ্ঞানার্জন এবং বিশ্বাসী জীবনে এসব অনুসরণ, অনুকরণ, সাক্ষ্যবহন ও প্রদান, পরিবারে এবং সমাজে এর গুরুত্ব সম্বন্ধে বাপক প্রভাব রয়েছে। মণ্ডলীর ছয়টি আজ্ঞা এবং সাতটি সংস্কারের মধ্যে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার পর হতে পর্যায়ক্রমে সাবালকত্ব লাভ পর্যন্ত এগুলোর কার্যকারিতা তারা উপলব্ধি করছে। পারিবারিক প্রার্থনায় এবং মণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত প্রার্থনার মধ্যে 'বিশ্বাসমন্ত্র' শারীরিক পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবন আমি বিশ্বাস করি মন্ত্রটি উচ্চারণ করে শিক্ষার্থী কিশোর-কিশোরীরা দৃঢ় প্রত্যয়ে যিশুর অনুগত ভক্তে পরিণত হচ্ছে।

ভক্তি ভরে রবিবার দিন খ্রিস্টযাগে যোগদান, পুনরুত্থান পর্বে বেদী সেবক, শাস্ত্রপাঠ, গানের দল, রবিবার-ধর্মশিক্ষা ক্লাশে, ওয়াইসিএস, শিশুমঙ্গল আন্দোলন ইত্যাদিতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে যিশুর শিক্ষা, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ আরো বেশি জানা ও উপলব্ধি করে অনুপ্রাণিত হচ্ছে। যিশুর পুনরুত্থিত ছবি ধ্যান, অংকন প্রতিযোগিতায়ও তাদের বয়সের কথা বিবেচনা করে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনে অনেকগুলো পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পবিত্র উপাসনায় পর্ব ও শাস্ত্রপাঠানুসারে উপযুক্ত গান পরিবেশনায় কিশোরদের ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে যেন তারা হৃদয় থেকে খ্রিস্ট যিশু সম্বন্ধে ধারণা লাভে সক্ষম হয়। তপস্যাকালে চল্লিশ দিন ধ্যান-প্রার্থনা, সভা-সম্মেলন, আলোচনা সভা, প্রতিযোগিতা ম্যাগাজিন/স্মরণিকায় লেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তরুণ বয়সে কম বেশি আয়ত্ব করতে পারে, সে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনেক সময় বাইবেল কুইজ, প্রশ্নোত্তর পর্বে যিশুর নানাবিধ উপমা, উদাহরণ, শিক্ষা, আশ্চর্য কাজ নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক সমাবেশ করে পুরস্কৃত শুধু নয়, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা ও জ্ঞানার্জনে তাদের পারদর্শী করা হচ্ছে। যিশুর গুণাবলী, আদর্শ, প্রেরণ কাজ তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে পুনরুত্থিত যিশুর বিষয়ে তাদের অদম্য বাসনা ও সহজাত প্রবৃত্তি পূর্ণতা দানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অগ্রণী ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

আমাদের কয়েকটি বিষয়ে অনুধ্যান: দু'জন শিষ্যের সঙ্গে পুনরুত্থিত যিশু দর্শনে যিশুকে তারা প্রশ্ন করলেন: "গত কয়েকদিন জেরুসালেমে কী কী ঘটেছে, আপনিই কি সেখানে একমাত্র প্রবাসী মানুষ যিনি তা জানেন না? যিশু জিজ্ঞেস করলেন: "কী ঘটেছে?" তারা বললেন: "কেন নাজারেথের যিশুকে নিয়ে যা ঘটেছে।" কি কাজে, কি কথায় তিনি তো ছিলেন একজন শক্তিশালী প্রবক্তা (*লুক ২৪: ১৭-১৯*)। পুনরুত্থিত যিশুকে চিনতে হলে আমাদের করণীয় বিষয়গুলো কী?

অনুধ্যানে যদি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দিক তুলে ধরা হয় তাহলে আমাদের অস্থির মনে শান্তি/স্বস্তি ও আনন্দ লাভ করব।

১) জীবিতদের মধ্যে যিশুকে খুঁজতে চেষ্টা করি কী?
২) পুনরুত্থিত যিশুর প্রদত্ত 'শান্তি' লাভে আমার প্রত্যাশা আছে কী?
৩) মলিন হৃদয় যদি শুচি-শুদ্ধ করে তাঁকে খুঁজি, তাহলে তাঁর দর্শন প্রাপ্তি সম্ভব।
৪) যিশুর পুনরুত্থানের সুখবর সকলের মাঝে প্রচারে আমি কী তৎপর?

৫) ব্যক্তিগত ও পরিবারে প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশে যিশুকে নিয়ে ধ্যান করি।
৬) যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে স্থাপনে আগ্রহ হই।
৭) দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দ নিয়ে সুখী ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করি।

ধন্য তারা যারা না দেখেও বিশ্বাস করেছে? যিশুর শিষ্য থোমাকে বিশ্বাসের মানদণ্ডে প্রশ্নবিদ্ধ করে যিশু তাকে এ উক্তি করেছিলেন। আসলে যিশুর পুনরুত্থানের আটদিন পরে: বন্ধঘরে শিষ্যদের মাঝে থোমার গভীরতম আগ্রহ জেগেছিল পুনরুত্থিত যিশুকে প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর সফল বাস্তবায়নে। তাই যিশু তাঁর হস্তের ক্ষত স্পর্শ করতে থোমাকে যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তা থেকেই থোমা আবিষ্কার করেছেন ইনিই সেই খ্রিস্টপ্রভু। আর বিশ্বাসী হয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলেন: "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার"। যিশুর দর্শন প্রাপ্তির পর থোমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এসছে, অবিশ্বাস থেকে পূর্ণ বিশ্বাসে এসে পৌছান: যিশু দ্বিধাগ্রস্থ শিষ্যের মন জয় করলেন। তোমার জীবন থেকে খ্রিস্টবিশাসী ঐশ জনগণ আশাদীপ্ত হয়ে নতুনভাবে জীবন-যাপনের ভরসা পাবে এ উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঘটনার মর্মকথা।

কিশোরদের উপদেশমূলক কয়েকটি পরামর্শ: তোমাদের মনে রাখতে হবে যে যিশু পাপীদের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বর কর্তৃক জগতে প্রেরিত হয়েছিলেন। জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণ পর্যন্ত যতদিন এ জগতে ছিলেন সর্বদা মানুষের কল্যাণে সব কিছু করেছেন। আমরা যে আজ খ্রিস্টান বলে নিজেদের দাবী করছি সেখানেও খ্রিস্টের অনুসারী বলেই তা হতে পেরেছি। মা-বাবার, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন আদর্শ, তাদের শিক্ষায় খ্রিস্টকেন্দ্রিক মূল্যবোধে আমরা বয়োবৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছি।

অতএব যিশু যেমন তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন: জগতের শেষ দিন পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হয়ে থাকবে এবং আমার কথা সকল জাতির কাছে প্রচার করে স্বর্গে প্রবেশের যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে নিজেরা এবং অন্যদের যোগ্য করে তুলবে। পবিত্র আত্মার সহায়তায়, পবিত্র আত্মার দান ও বারটি ফল বাস্তব জীবনে প্রতিফলন করে ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার গৌরব অর্জন করবে।

উপসংহার: পুনরুত্থান বা পাস্কাপর্বের আনন্দ বিশ্বাসীদের জীবনে চরম অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। শূন্য কবরস্থানে নারীদের আবেগপূর্ণ হতাশার অবসানে পুনরুত্থিত যিশু আশার বাণী শুনিয়ে তাদের আশ্বস্তই শুধু করেননি, সুখবরটি তাঁর প্রিয় শিষ্যদের এবং সমগ্র বিশ্বে প্রচারের আহ্বান জানান। আমরাও আর যিশুকে মৃতদের মধ্যে না খুঁজে জীবিতদের মাঝে দৈনন্দিন জীবনে কাজে কর্মে, আচার ব্যবহারে এবং কথা বার্তায় পরস্পরের সাথে সহভাগিতায় সকলকে আনন্দপূর্ণ করে তুলতে বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়েছি। তাই আসুন আমরা শিষ্য থোমার মত পরস্পরের মধ্যে পুনরুত্থিত যিশুর আনন্দ বার্তার সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ঘোষণা করি শুভ পাস্কা পর্বের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

জয় মৃত্যুঞ্জয়, জয় তোমারই জয়, তোমারই জয় হোক॥

কিভাবে ইস্টার সানডে'র তারিখটি নির্ধারণ করা হয়

আলফন্স পঙ্কজ গমেজ

পবিত্র ইস্টার সানডে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের এক বিশেষ দিন, যেদিন ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিস্ট পুনরুত্থান করেছিলেন তাঁর স্মরণে মহা ধর্মীয় উৎসব, কিন্তু পবিত্র ইস্টার সানডে একটি পরিবর্তনশীল তারিখ! বড়দিনের মত প্রতিবছর ইস্টার সানডে একই তারিখে উদ্‌যাপিত হয় না। কেন?

তার একটা বিশেষ ধর্মীয়, মহাকাশকাল, চন্দ্রমাসসহ নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। খ্রিস্টধর্মে যিশুখ্রিস্টের জন্মের অনেক পূর্বে ইহুদীরা মিশরীয়দের হাতে বন্দী ছিল। তখন ইহুদীরা মিশরীয়দের দাস ছিল। ঈশ্বর ভক্ত **মোশী** ইহুদীদের এই মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্তি এনে দেন। এই যে, মিশরীয় দাসত্ব থেকে ইহুদীদের মুক্তির যে ধর্মীয় উৎসব, তার নাম **"নিস্তার পর্ব"**। যাকে ইংরেজিতে Passover বা Paschal বলা হয়। এই Paschal উৎসবটি মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হত Vernal Equinox অর্থাৎ সূর্যের মহা বিষুব রেখা অতিক্রমের ঠিক পরবর্তী পূর্ণিমার দিন। কিন্তু চন্দ্র বৎসর অনুযায়ী প্রতিবৎসর পূর্ণিমা একই তারিখে বা সময় হয় না। কেননা প্রাকৃতিক নিয়মেই পূর্ণিমা অমাবস্যা একই তারিখে হয় না। তাই চার্চ (Nicaea-A.D.325) সিদ্ধান্ত দেন যে, পৃথিবীর গতি অনুযায়ী প্রতিবছর সূর্যের মহা বিষুব রেখা অতিক্রমের সময় হলো ২০-২১ মার্চ(আনুমানিক)। এই ২১ মার্চ এর পর প্রথম যে পূর্ণিমা হবে, ঠিক তার পরবর্তী রবিবারটিই হবে ইস্টার সানডে কেননা যিউস ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঐ পূর্ণিমার দিনই উদ্‌যাপিত হয় নিস্তার পর্ব এবং ঐ দিনই ছিল বৃহস্পতিবার। যেদিন আমরা পূণ্য বৃহস্পতিবার পালন করি, সেহেতু ইস্টার সানডে হবে তার পরের রবিবার।

কোন রবিবার ইস্টার সানডে হবে?

সহজভাবে যদি বলি, প্রতি বৎসর ২১ মার্চ এর পর প্রথম যে পূর্ণিমা হবে, ঠিক তার পরের রবিবারই হবে ইস্টার সানডে। আর যদি ঐ পূর্ণিমার দিন হয় রবিবার তবে ঠিক তার পরের রবিবার হবে ইস্টার সানডে।

২১ মার্চ বসন্তকালীন মহা বিষুব কাল। এই দিনটি, পুরো বসন্ত কালের মধ্যে দিন আর রাত্রির সময় সমানে সমান। তবে প্রতি বছর অবশ্যই **২২ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিলের** মধ্যে ইস্টার সানডে পালন করতে হবে।

তাহলে ভস্ম বুধবার কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?

যখন ইস্টার সানডে দিনটি নির্ধারণ করা হয়ে যায় তখন ঐ ইষ্টার সানডে হতে ঠিক ৪৬ দিন পূর্বে যে বুধবার সেই বুধবারই হবে ভস্ম বুধবার। এখন এই ৪৬ দিন কেন? তার কারণ হলো যিশুখ্রিস্ট ৪০ দিন উপবাস ছিলেন। এই ৪০ দিন স্মরণে আমরাও ভস্মবুধবার থেকে ৪০ দিন উপবাস, প্রার্থনা, ত্যাগ-স্বীকারসহ নানবিধ কৃচ্ছ্রতা পালন করি আর এই ৪০ দিন পালন করতে হলে এর মধ্যে ৬টি রবিবার আসবে। কিন্তু রবিবার বিশ্রামবার। তাই এই ৬টি রবিবার তপস্যাকালের আওতায় আসে না বিধায় ভস্মবুধবার হতে ইষ্টার সানডের দূরত্ব ৪৬ দিন ধরা হয়।

গ্রেগারীয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আগামী ২০২৪ থেকে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভস্ম বুধবার ও ইস্টার সানডের তারিখ:

খ্রিস্টাব্দ	ভস্ম বুধবার	ইস্টার সানডে
২০২৪	১৪ ফেব্রুয়ারি	৩১ মার্চ
২০২৫	৫ মার্চ	২০ এপ্রিল
২০২৬	১৮ ফেব্রুয়ারি	৫ এপ্রিল
২০২৭	১০ ফেব্রুয়ারি	২৮ মার্চ
২০২৮	১ মার্চ	৬ এপ্রিল
২০২৯	১৪ ফেব্রুয়ারি	১ এপ্রিল
২০৩০	৬ মার্চ	২১ এপ্রিল

তথ্য: ইন্টারনেট-গুগল

খ্রিস্টের পুনরুত্থান: আমাদের বিশ্বাস ও আশা

ফাদার লেনার্ড রোজারিও

ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে আপন সাদৃশ্যে সৃষ্টি করলেন এবং তাদের মুক্তিকল্পে আপন পুত্রকে মানুষ করে মানুষের মাঝে পৃথিবীতে পাঠালেন। ঈশ্বর-পুত্র যিশু পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী এই পৃথিবীতে এলেন এবং মানুষের পাপের কারণে চোরের মাঝে চোর আকারে নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি নিজের জীবনে মৃত্যুকে গ্রহণ করে আমাদের জীবনে পাপের ফল মৃত্যুকে নাশ করলেন। আমাদের জন্য আনলেন পরিত্রাণ। যিশু মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করে আমাদের দিয়েছেন জীবন। যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানই আমাদের মণ্ডলী গঠনের কারণ। খ্রিস্টের পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের জন্য এক আনন্দের ঘটনা যা তাদের কাছে বিশেষ আহ্বান নিয়ে আসে; যে আহ্বান মানুষকে সত্যময় ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে, পাপে পতিত হবার আগের অবস্থানে নিয়ে যায়। আজও বর্তমান মণ্ডলীতে যিশুর পুনরুত্থান মহারম্বরে পালিত হয়। প্রতি পুনরুত্থানই বিশ্বাসীর জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। পুনরুত্থান হল পূর্বের অবস্থা থেকে নতুন অবস্থায় গমন। পুনরায় নবীকৃত হওয়া, নতুনভাবে পথচলা। পুনরুত্থান হল পাপের মৃত্যু সত্যের জয়, নবজন্ম লাভ ও অনন্তে পথ চলা। আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন যাপনে পূর্ণতা নিয়ে আসে যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান।

বাংলা পুনরুত্থান শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Resureection। এই Resurrection শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Resergere শব্দ থেকে যার অর্থ to rise again বা পুনরায় জেগে উঠা বা পুনরায় উত্থান। পুনরুত্থান বলতে মূলত খ্রিস্টের পুনরুত্থানকে বুঝানো হয়েছে। কেননা পৃথিবীতে খ্রিস্ট ব্যাতীত অন্য কেউ মৃত্যুদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মহিমায় ভূষিত হননি। খ্রিস্টের পুনরুত্থানকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর পুনরুত্থান পর্ব পালন করা হয়ে থাকে। এই পুনরুত্থান পর্বকে ইংরেজীতে বলা হয় Easter। Easter শব্দটি মূলত এসেছে Anglo Saxon বসন্ত দেবী Easter এর নাম অনুসারে। যিশু যে দিনটিকে পুনরুত্থান করেছেন সেই দিনকে প্রভুর দিন রূপে বিশ্বাস করা হতো কারণ খ্রিস্ট মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন নব সূর্যের মত। যে অন্ধকারময় পৃথিবীকে নব আলোয় আলোকিত করে এবং নব আলোর পুণ্য জ্যোতিতে আমরা পাই নতুন চেতনা, নতুন বিশ্বাস, নতুন আশা এবং নব উদ্যমে শুরু করি আমাদের জীবনের নতুন যাত্রা। পুনরুত্থান শব্দটির অর্থ পুনরায় জেগে উঠা, জীবন ফিরে পাওয়া, চেতনা লাভ করা, উদিত হওয়া, অনেক পূর্বেই আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার পূজা-আরাধনা ও সেবা করার জন্য। পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি যে, মৃত্যুই শেষ নয় বরং মৃত্যুর পরে অনন্ত রাজ্যে তাঁর সাথে মিলিত হব। খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থান না করতেন তাহলে আমরা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত পরিত্রাণের আশা করতে পারতাম না। খ্রিস্টের পুনরুত্থান মিথ্যা হলে সারা পৃথিবীর মানুষ খ্রিস্টকে বিশ্বাস করত না, শিষ্যদের প্রচারেরও কোন অর্থ হতো না। কারণ আমাদের বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা সবকিছুর চরম লক্ষ্য ও পরম পাওয়া হচ্ছে অনন্ত জীবন, ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন, আর পুনরুত্থানই আমাদের জন্য সেই অনন্ত জীবনের দ্বার উন্মোচন করে। এই নশ্বর দেহের পুনরুত্থানের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ মরদেহ গ্রহণ করে খ্রিস্ট নিজেই এই দেহকে মহিমান্বিত করেছেন এবং আমাদেরও একই মহিমার সহভাগী করেছেন। শেষদিনে আমরা পুনরুত্থিত হয়ে ঐশরাজ্যের মহা মিলনভোজে একত্রে মিলিত হব। তাই খ্রিস্টের জন্ম বা জাগতিক জীবন অপেক্ষা তার স্বশরীরে পুনরুত্থান এবং আমাদের কাছে পুনরুত্থিত হওয়ার অঙ্গীকারই হচ্ছে আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। এই বিশ্বাসেই আমরা পরিত্রাণ লাভ করব। সাধু পৌল বলেন, মুখে তুমি যদি সকলের সামনে যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার করে এবং অন্তরে যদি বিশ্বাস কর যে, পরমেশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করবে (*রোমীয় ১০:৯*)।

যিশুখ্রিস্ট এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই আমাদেরকে তাঁর সাথে পুনরুত্থিত হতে আহ্বান করে যাচ্ছেন যেন আমরা পাপ মুক্ত হয়ে নব জীবনের দিকে দিন দিন এগিয়ে চলি। খ্রিস্ট যেভাবে পুনরুত্থিত হয়ে মৃত্যুর অহংকারকে নাশ করে অমর হয়ে আমাদের মাঝে সদা বিরাজমান আমরাও যেন তেমনি তার পুনরুত্থানের গুণে হতাশা-নিরাশার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে নতুন আশা ও নতুন উদ্দীপনা নিয়ে সত্যের পথে এবং জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারি। এটাই হোক আমার, আপনার এবং সকলের একান্ত সাধনা। পুনরুত্থানের পূর্বরাত্রিতে দীক্ষাজল আশীর্বাদ করা হয় হয় যেন এই জলে দীক্ষিত হয়ে নবজন্ম লাভ করতে পারি এবং পিতার সন্তান রূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারি। একই সাথে এদিন দীক্ষা সংকল্প নবায়ন করা হয় কেননা দীক্ষাস্নানের দ্বারা আমরা পাপের দিক থেকে যিশুখ্রিস্টের সাথে মৃত্যুবরণ করেছি যেন তাঁরই সাথে পুনরুত্থান করে নবজীবনের পথে চলতে পারি। যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের কাছে বিশ্বাস ও আশার বার্তা বহন করে।

বিশ্বাস: বিশ্বাস হল ঈশ্বরের একটি মহাদান। কারও উপর। আস্থা রাখা, ভরসা রাখা, নির্ভরশীল হওয়া হল বিশ্বাস। সাধু আগস্টিনের ভাষায়, "আমি বিশ্বাস করি যাতে আমি বুঝতে পারি এবং বুঝতে চাই যাতে আমার বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পায়"। অর্থাৎ এ কথার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর নির্ভরতা ও স্বেচ্ছা সমর্পণের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। খ্রিস্টবিশ্বাস হল খ্রিস্টের প্রতি অনুগত থেকে তাঁর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়া। খ্রিস্টধর্মের শব্দার্থে বলা হয়েছে, বিশ্বাস হল তিনটি ঐশরিক গুণের একটি। বিশ্বাস মন পরিবর্তন ও খ্রিস্টীয় জীবনে ভিত্তি স্বরূপ। বিশ্বাস ঈশ্বর প্রদত্ত দান এবং মানুষকে স্বাধীনভাবে তাঁর বুদ্ধিমত্তা সহ ঐশপ্রত্যাদেশের সত্যের মুখোমুখি করে এবং তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে ঐশ প্রত্যাদেশকে গ্রহণ করে। বিশ্বাসের গুণে মানুষ এমন শক্তি পায় যার দ্বারা ঈশ্বর যে সমস্ত সত্য প্রকাশ করেছেন সেই সত্য গ্রহণ করে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে নয় বরং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে বিশ্বাস করে। বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ স্বাধীন ভাবে নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করে, ঈশ্বর যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ বশ্যতায় মানুষ নিজের বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তিকে আনয়ন করে এবং স্বেচ্ছায় তার দেওয়া প্রত্যাদেশের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে। যাকে আমি বিশ্বাস করি তাঁকে আমি জানি। অথার্ৎ আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাস অন্ধ নয়, ভঙ্গুর বা ক্ষণস্থায়ী নয়। আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাস হচ্ছে যুক্তিযুক্ত এবং এই বিশ্বাসসের ভিত্তি হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান। যিশু পুনরুত্থানের পর তাঁর শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন। তবে সেখানে টমাস উপস্থিত ছিলেন না। অন্য শিষ্যরা যখন টমাসকে বলল "আমরা প্রভুকে দেখেছি"। টমাস উত্তর দিলেন, তাঁর দুটি হাত যদি পেরেকের দাগ না দেখি, আর পেরেকের যদি আমার আঙ্গুল না ছোঁয়াই, এবং তাঁর বুকের পাজরটিতে যদি হাত দিতে না পারি, তবে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না" (*যোহন ২০:২৫*)।

যিশুর পুনরুত্থানের প্রতি আমাদের বিশ্বাস দুই

(১৮পৃষ্ঠায় দেখুন)

যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান মানবজাতির পরিত্রাণ

নিবিড় আন্তনী রোজারিও

সে যুগে আদম হবার পাপের ফলে আমাদের এই সুন্দর ধরণীতে পাপের আগমন ঘটে। যার থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে আসেন বিভিন্ন প্রবক্তা এবং সর্বশেষে আমাদের প্রিয় যিশু। যিনি ঈশ্বর হয়েও মানব পুত্র হিসাবে আগমন করেন। "যিশু" নামের অর্থ হলো মানব জাতির পরিত্রাণ। ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। তিনি চান আমরা যেন তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকি। তাই, আমরা যেন আমাদের পাপের হাত থেকে রক্ষা পাই সে জন্যে তিনি তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্রকে পাঠিয়েছেনে। যাতে ও তার মধ্যস্থতায় আমরা পাপ থেকে মুক্তি লাভ করি। তাই যিশু এসেছেন আমাদেরকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দিতে। তাই যিশু আমাদের ডাকেন; বিভিন্ন ভাবে ডাকেন, বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে ডাকেন যেন আমরা তার দেখানো পথে ফিরে আসি। যা মথি: ৯ অধ্যায় (৯-১৩) পদে দেখতে পাই। তিনি আমাদের ডাকেন যেন আমরা পরিত্রাণ পাই। আর তিনি এসেছেন পাপীদের আহ্বান জানাতে, ধার্মিকদের জন্য নয়। কারণ, সুস্থদের ডাক্তারের প্রয়োজন হয়না, হয় অসুস্থদের। অনেক সময় আমরা পাপ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন যিশু আমাদের আহ্বান জানান যেন আমরা তার কাছে যাই। কারণ, *মথি: ১১ অধ্যায় ২৮* পদে লেখা আছে "তোমরা শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলে আমার কাছে এসো ; আমি তোমাদের দেব প্রাণের আরাম।" তিনি চান যেন আমরা পাপের বোঝার জন্য ঐশরাজ্য থেকে বাদ পরে না যাই বরং তাঁর রাজ্যে একজন সদস্য হই। তার সাথে ঐশ্যরাজ্যের আনন্দ উপভোগ করি। তাই পিতা বিভিন্ন প্রবক্তাদের মধ্যদিয়ে আমাদেরকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের পাপের কারণে কেউ অপমানিত হয়েছেন, কেউ আহত হয়েছেন, কেউবা মৃত্যু বরণ করেছেন। শেষে তিনি বাধ্য হয়ে তার একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়েছেন যেন আমাদের বিনাশ না হয়। যা মথি: ২১ অধ্যায় (৩৩-*৪৫*) পদে আছে। যে, রাজা যখন বিভিন্ন কর্মচারী পাঠিয়ে তার প্রাপ্য ফসল পায়নি তখন তার নিজপুত্রকে পাঠিয়েছেন। যেন তারা মনের পরিবর্তন করে। ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন আর তিনি চান আমরা যেন পাপের পথ থেকে ফিরে আসি যার কারণে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের মুক্তির জন্য প্রেরিত করতে একবারও ভাবেননি। কিন্তু আমরা মানব জাতি নিজেদের লোভ লালসার মায়া জালে পরে তাকে দিয়েছি ক্রুশীয় মৃত্যু। তবুও তিনি আমাদের বারবার ডেকে চলেছেন গীতাবলির গান সংখ্যা ৯০৮ মতো "ক্রুশের উপরে দু'হাত বাড়ায়ে যীশু ডাকেন ফিরে আয়,ফিরে আয়।" আসুন প্রিয়জনেরা যিশু আমাদের জন্য যে ভাবে প্রাণ বির্সজন দিয়েছেন আমরা যেন তা বিফলে যেতে না দেই বরং তার প্রাণের বিনিময় ফল হিসাবে আমাদের মন পরিবর্তন করি এবং যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দ সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেই। একই সাথে যিশুর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একসাথে সামনের দিকে পথ চলি। যিশু আমাদের যে ভাবে ভালোবেসেছেন আমরাও যেন অন্যকে সেইভাবে ভালোবেসে যেতে পারি এবং সেবায় নিয়োজিত হয়ে তাঁর মহান সৃষ্টির যত্ন নিতে পারি॥ ❑

যিশুর পুনরুত্থানে পরিবারের আনন্দ

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া

মানব মুক্তির ইতিহাসে এক রহস্যময় ব্যক্তি হলেন যিশু। তিনি রহস্যময় ব্যক্তি এই জন্য যে, তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কোনটাই স্বাভাবিক নিয়মে হয়নি। একটি নির্দিষ্ট সময়ে যিশুর জন্ম এবং নির্দিষ্ট সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আর এই সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত ছিল। রহস্যময় যিশুর জন্মের পূর্ব হতে তাঁর জন্মের বিষয়ে ভবিষৎবাণী এবং জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সকল আশ্চর্য কাজ প্রমাণ করে তিনি কোনো সাধারণ মানুষ নন। পবিত্র বাইবেলে যিশুর বহু আশ্চর্য কাজের কথা উল্লেখ রয়েছে। এই আশ্চর্য কাজের মধ্যদিয়ে সেই সময় মানুষ তাঁকে চিনতে পেরেছিল, বিশ্বাস করেছিল আর তাঁকে মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কেননা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে যা অসাধ্য, যিশু তাই করেছেন। আর এসব করেছেন মানুষের মনে বিশ্বাস জাগানোর জন্য এবং তাঁর সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল তা যেন পূর্ণতা পায়। সাধু যোহন লিখিত সুসমাচারে যিশুকে; ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যরূপে দেখানো হয়েছে, যিঁনি মানব দেহ ধারণ করে আমাদের মধ্যে বসবাস করেন। রহস্যময় যিশু সম্পর্কে তাঁর জন্মের পূর্বেই বলা হয়েছিল তাঁকে, মুক্তিদাতা বলে ডাকা হবে। মুক্তিদাতা নামটি বলে দেয়, তিনি মানুষকে মুক্তি দিবেন। আর সত্যিই তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন তাঁর জীবনের বিনিময়ে। মুক্তি দিয়েছিলেন এক অবর্ণনীয় বিভীষিকাময়, অসহনীয় যাতনাভোগ ও মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। এমন মৃত্যু মানব ইতিহাসে কখনো হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। ইতিহাসে যিশু একমাত্র ব্যক্তি, যিঁনি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ব হতেই জানতেন। তবে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এটা স্বাভাবিক। কেননা মাটির তৈরি মানুষ, মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মাটিতেই মিশে যাবে এটাই চিরন্তন সত্য। কিন্তু যিশুর বেলায় ঘটেছে তার উল্টো। আর সেটা হলো, যিশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন। অর্থাৎ তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক ও অদ্বিতীয় ঘটনা। না যিশুর পূর্বে এমন ঘটেছে এবং না পৃথিবী লয়প্রাপ্ত পর্যন্ত কখনো ঘটবে।

যিশু পুনরুত্থান করে পিতার মহিমা প্রকাশ করেছেন এবং মানব অন্তরে জাগিয়ে তুলেছেন বিশ্বাস। পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখি যে, যিশুর মৃত্যুর পর শিষ্যেরা ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছিল। তারা অনেকটা গৃহবন্দী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু যখনই তাঁরা পুনরুত্থিত যিশুকে দেখতে পেলেন, তাঁর অভয়বাণী পেলেন, তখনই তাঁদের অন্তরে জেগেছিল পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং আনন্দ।

যিশুর পুনরুত্থানকে সকল খ্রিস্টীয় পরিবারে আনন্দের মহামিলন সেতু বললে ভুল হবে না। কারণ এই পুনরুত্থান পর্বকে সামনে রেখে প্রতিটি খ্রিস্টভক্ত ভস্ম বুধবারে কপালে ছাই মেখে প্রায়শ্চিত্তকালে প্রবেশ করে। প্রতি শুক্রবার উপোস রেখে ও নিরামিষ গ্রহণ করে যিশুর যাতনাভোগের শরীক হয়। নিজ নিজ দুর্বল দিকগুলো পরিহার করার চেষ্টা করে এবং দুর্বলতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে। পারিবারের স্বামী-স্ত্রীর এবং সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক আরো সুন্দর হয়। যে সমস্ত পরিবারে পরিজনদের মধ্যে অশান্তি বিদ্যমান, এই প্রায়শ্চিত্ত কালে তারাও একে অপরকে ক্ষমা করে। ক্ষমার মধ্যদিয়ে আনন্দ লাভ করে এবং পুনরুত্থিত যিশুকে নতুনভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করে। পুনরুত্থিত যিশুকে পেয়ে শিষ্যেরা যেমন আনন্দিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবারেও সেই আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয়।

আমরা দেখি যে, পরিবার পরিজনদের সাথে পুনরুত্থান পর্ব পালন করতে প্রবাসে অবস্থানরত সদস্যরাও পরিবারে ফিরে আসে এবং সকলের সাথে পুনরুত্থানের আনন্দ সহভাগিতা করে। যিশুর পুনরুত্থান সমগ্র মানব জাতির কাছে সত্য ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে। যিশুর পুনরুত্থান স্বর্গের সাথে মর্তের মিলন। আর মিলন মানেই আনন্দ। এই পুনরুত্থানকে ঘিরে আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠে সকল খ্রিস্টীয় পরিবার॥ ❑

পুনরুত্থান-জীবনের উত্থান

সমাজের কাছে অবাঞ্ছিত, ঘৃণিত ব্যক্তি মাদকাসক্তদের নিয়ে বারাকা কাজ করে চলেছে অনেক দিন থেকে । বারাকার আলোকিত শিশু প্রকল্প ঝরে পড়া মাদকাসক্ত, প্রান্তিক ও ভঙ্গুর শিশদের পাশে থেকে তাদেরকে উঠে দাঁড়াতে ও রুপান্তরিত মানুষ হতে কাজ করে চলেছে। দু'জন শিশুর গল্প নিয়েই আমাদের পুনরুত্থান জীবনের উত্থান উপস্থাপনাটি।

"স্বপ্নের প্রদীপ"

ছোট বেলায় স্বপ্ন ছিল , বড় হয়ে নায়িকা হবো। সুন্দরী ছিলাম। সবাই প্রশংসা করত। টিভিতে দেখতাম সুন্দরী মেয়েরা সুন্দর সুন্দর জামা পরে নাচে, গান করে। দেখতে খুব ভাল লাগত। কিন্তু এই কথা শুনে বাবা গালি দিয়েছিল। খুব মেরেছিল। বলেছিল, আমি নাকি খারাপ মেয়ে, তাই এই স্বপ্ন দেখি। আমার বাবা মাকেও খুব মারধর করত। বাবা মোট ৫টা বিয়ে করে। আমার মা ছিল তার প্রথম স্ত্রী। তৃতীয়বার বিয়ের পর মাকে মেরে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। মামারা মাকে আবার বিয়ে দেয়। মা সেখানে সংসার করছে। মা চলে যাওয়ার পর থেকে বাবার অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। তখন আমি স্কুলে পড়তাম। ম্যাডামদের ক্লাস আমার খুব ভাল লাগত। প্রতিদিন স্কুলে যেতাম। বাবা আমার স্কুলে পড়া পছন্দ করতনা। বাবা বলত, তুই মেয়ে মানুষ, পড়ালেখা শিখে আমাকে তো চাকরি করে খাওয়াতে পারবি না। স্কুলে সময় নষ্ট না করে কাজ কর। কাজ করে আমারে খাওয়াবি। চুরি করে স্কুলে যেতাম। বাবা যেদিন জানতে পারত সেদিন আমারে শিকল দিয়ে বেঁধে মারত। তারপরও চুরি করে স্কুলে যেতাম। একদিন জানতে পেরে বাবা আমার বই, খাতা, কলম সব একসাথে পুড়িয়ে দেয়। বাবা মোট তিন বার আমার বই পুড়িয়ে দেয়। এরপর এক বাসায় আমাকে কাজে দিয়ে দেয়। ওই বাসার মানুষরা মারত দেখে, ওখান থেকে পালিয়ে বাসায় আসলে, বাবা আবার মারে। সেদিন আমার বাসার পাশের এক চাচার কাছে সাহায্য চাই। তিনি আমাকে ঢাকায় এক নেতার বাসায় কাজে পাঠান। অনেক বড় বাড়ি। অনেক ঘর। কিন্তু আমারে থাকতে দিত রান্নাঘরে। ওই বাসায়ও আমাকে অনেক মারত। একদিন ভোরবেলা ওই বাসা থেকেও পালিয়ে যাই।

রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে ক্ষুধা লাগছিল। তাই একটা রেল লাইনের ধারে বসে কাঁদছিলাম। ওটা ছিল কমলাপুর রেলস্টেশন। ওই দিন আমি এক পাচারকারী দালালের হাতে পড়ি। আমি জানতাম না উনি দালাল। উনি আমাকে ভাত খাওয়ান। আমি ওনার কাছে থাকতাম। আমাকে খুব আদর করতেন। বলেছিলেন মা, তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও। আমি বলি, নয়িকা হতে চাই। তখন সে আমাকে নাচ, গান, কথাবলা সব শিখায়। তারপর একদিন আমাকে সুন্দর করে সাজিয়ে ভারতে পাচার করে দেওয়ার জন্য বর্ডারে নিয়ে যায়। ওখানে আমার একজন গ্রামের পরিচিত লোক আমাকে চিনতে পেরে আমাকে ডাক দিয়ে জানতে চায় আমি ওখানে কি করছি। আমি, আমার সব কথা বললাম কাঁদতে কাঁদতে। উনি আমার সব কথা শুনে আমাকে নানাবাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বাবা খবর পেয়ে সেখান থেকে আমারে নিয়ে এসে আবার কাজে দিলেন। আমি এবার পালিয়ে গাজীপুরে আমার খালার প্যাকেট বানানোর কারখানায় কাজ করতাম। আমি অনেক টাকা আয় করতাম। সব মার কাছে পাঠিয়ে দিতাম। আর কিছু টাকা প্যাকেট বানানো মেশিন কেনার জন্য গুছিয়ে রাখতাম। তখন স্বপ্ন দেখতাম নিজে কারখানা দিব। ওখানে থাকতে থাকতে মোবাইলে একটা ছেলের সাথে প্রেম হয়। স্বপ্ন দেখতাম আমার নিজের একটা সংসার হবে। স্বামী, সন্তান থাকবে। মা, খালা সবাইকে জানালাম। কেউ রাজী হলো না। কিন্তু আমি তাকে প্রচুর ভালবাসতাম। তাই সবার অমতে তাকে বিয়ে করি সদরঘাটে এসে। সে সময় থেকে সদরঘাট থাকতাম। পরে একটা বাসা নিলাম। সব খরচ আমি করতাম। পরে জানতে পারলাম স্বামী নেশা করে। প্রতিদিন মারত। জোর করে বিভিন্ন নেশা খাইয়ে দিত আমাকে। আমাদের একটা ছেলে হয়। চার বছর সংসার করছি। আমার জমানো টাকা শেষ হলে আমাকে খারাপ কাজ করে টাকা এনে দিতে বলত। পরে ডিভোর্স দিয়ে দিছে।

ছেলেটারে বুকে নিয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতাম। ওকে কোলে নিয়ে সারাদিন ভিক্ষা করে যা পেতাম তাই খেতাম। রাতে সদরঘাটে ঘুমাতাম ওকে বুকে নিয়ে। একদিন সকালে উঠে দেখি ছেলে আর নেই। ওকে কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে। পাগলের মতো খুঁজছি তাকে সারা দুনিয়ায়। পাইনি। এরপর থেকে মাদক আমার নিত্যদিনের সঙ্গী আর নিষিদ্ধপল্লী আমার ঠিকানা। যা আয় করি আমি খাই, আর মারে পাঠাই। আমি আমার মাকে খুব ভালবাসি। মা যেখানেই থাক যেন ভাল থাকে। ভালই ছিলাম সেখানে। কিন্তু একদিন আমি কাজ করতে রাজী হইনি দেখে ওরা আমার মাকে গালি দেয়। আমি সেদিন বিকাল বেলা ওখান থেকে পালিয়ে আবার সদরঘাট চলে আসি। তারপর দেশে মামার বাড়ি চলে যাই। এখন সেখানে থাকি। মাঝে মাঝে ঢাকা আসি। একদিন এক বিয়েতে আমি আমার মামার বাড়ির এক আত্মীয়ের বাসায় যাই। সেখানে একজন আমাকে পছন্দ করে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আমার অতীত জীবনের কথা তাকে জানিয়েছি। তারপরও সে আমাকেই বিয়ে করতে চায়। পারিবারিকভাবে এক মাস পর আমার বিয়ে হবে সেখানে। আমি পাত্রকে বলেছিলাম আমি প্যাকেট বানিয়ে প্রেডাকশন করতে পারি। আমি কাজ করে আমার মাকে টাকা পাঠাতে চাই। সে বলেছে, বিয়ের পর আমাদের ঘরে বসিয়ে খাওয়াবে। আমার মাকেও মাসে মাসে টাকা পাঠাবে। অনেক কষ্ট করেছি জীবনে। এখানে বিয়ের পর আমার আর কোন কষ্ট থাকবে না। এখন সুখের স্বপ্ন দেখি।

এমনই কত, শত স্বপ্ন উড়ছে প্রতিদিন আমাদেরই চারপাশে। জীবনের ব্যস্ততায় হয়তো এড়িয়ে যাচ্ছি, আমারই জানালার ওপাশে মৃদু, করুণসুরে বাজতে থাকা কোন স্বপ্নসুর যেখানে এক খড়কুটো আর কাগজ কুড়ানো নিঃশ্ব মা স্বপ্ন দেখে তার সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে প্রতিষ্ঠিত করার, এক ক্যান্সার আক্রান্ত মা নিজেকে সৃষ্টিকর্তার হাতে সঁপে দিচ্ছে কারণ, সে স্বপ্ন দেখে তার ভাঙ্গারী বিক্রির টাকায় তার প্রতিবন্ধী মেয়েটি একদিন সমাজের মূল ধারায় ফিরবে। আবার, দশ বছর বয়সী এক শিশু স্বপ্ন দেখে, একদিন তার অনেক টাকা হবে, সেদিন ছোট বোনের জন্য একটা পুতুল আর কেক কিনে তার সাথে দেখা করবে, মা মারা যাওয়ার পর গত ৪ বছর তার বোনকে সে যে দেখতে যেতে পারেনি, বাস ভাড়া নেই বলে।

স্বপ্ন দেখি, একদিন এই অদৃশ্য স্বপ্নগুলো আমাদের চোখেও দৃশ্যমান হবে। অপেক্ষায় থাকবো সেদিনের, যেদিন আমাদের সকলের হাত একত্রিত হবে সৃষ্টিকর্তার পবিত্র ইচ্ছায়। সৃষ্টিকর্তার বাছাইকৃত পবিত্র হাতগুলির স্পর্শে জ্বলে উঠবে এক একটি স্বপ্নের প্রদীপ।

বিশ্বাস করি, সেদিন গৃহহীন ক্লাস সেভেন পড়ুয়া শিশুটি ডাক্তার হয়ে, তার অসহায়, অন্ধ বাবার চোখের আলো ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন পূরণ করবে।

লেখক: তানিয়া সুলতানা, মনোবিজ্ঞানী,
বারাকা, আলোকিত শিশু প্রকল্প

আলোকিত পিকু

বর্তমানে আমাদের জীবন আলোর অভাব, আলোকিত মানুষের অভাব। কেননা আমি মানুষ হয়ে মানুষকে অবহেলা করছি। রাস্তার মোড় ঘিরে যে সকল শিশু অনাহারে ভুগছে তাদের দিকে আমরা চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের ঘরের মধ্যে অভাব, অনটন, অবিশ্বাস, অশান্তি, ঋণ, কোন্দল, ক্রোধ, হিংসা, বিভেদ, লোভ-লালসায় আমাদের পরিবারে ভেঙে দিচ্ছে আর আমাদের সন্তানরা তার বলিদান হচ্ছে। ছোট ছোট ঘটনায় বদলে যাচ্ছে আমাদের জীবন।

বদলে যাওয়া পিকুর গল্পে আমাদের কত শিশু আজ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুধা মুখে, আবার শুয়ে আছে দিনে শেষে মায়ের বদলে আর্বজনার স্তূপে। আমি আজ পিকুর কথা বলতে চাই। পিকুর জন্মের পর বাবা নামে কাউকে ডাকা হয়নি তার। বাবার যে একটা মস্ত বড় ছাদ সেটা বুঝতে বেশ সময় লেগেছে। অপর দিকে মা যে শক্তিশালী নাম আর সব ভাবনার মুক্তির আসান এটা সে খুব অল্প বয়সে বুঝেছে। মা তো বেশ! সারাদিন হাড়ভাঙা খাঁটুনি খেটে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি আসে মা। বারবার প্রাণবন্ত হাসি দিতে চেয়েও মা যেন মলিন মুখে হেসে উঠে। পিকু অমন অবস্থায় মায়ের আঁচলে মুখ লুকায়। তখনই পাশের বাড়ির মানুষ পিকুদের উঠান পেরিয়ে যায়। আর বলে বাবা ছাড়া সন্তান কোনদিন ভালো হয় না। সারাদিন ঘুরঘুর এই রাস্তা তো, ওই রাস্তা। মা রে কথা বললে তো আমাদেরই পাপ হবে। সন্ধ্যা হলে নেমে পড়বে রাস্তার ট্রামলাইটের নিচে। পিকু তখন অনেক কথার অর্থ বুঝতো না। মাত্র ৭ বছর বয়স পিকুর। গ্রামের স্কুলে হাতে খড়ি দিচ্ছে। পিকুর দাদী কোনদিন পিকুকে ছুঁয়ে দেখেনি। কিছু হলোই পিকুর দুষ্টুমির জন্য তিল হতে তাল বানিয়েছে। মাঝে মাঝে মায়ের গায়ে হাত তুলছে। হাজারো বার বলছে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। মা শুধু কাঁদতো । কিন্তু কথায় আছে মানুষ কাঁদতে কাঁদতে একসময় কঠিন হয়ে যায়। ভীষণ কঠিন। পিকু সেই কঠিন দিনে মাকে হারিয়েছে। লোক মুখে শুনেছে আড়ৎ ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। পিকু সেদিন সারারাত না ঘুমিয়ে বাড়ির এক উঠানে বসে ঘুমিয়ে গিয়েছিলো। সকাল হতে না হতে দাদী চিৎকার করে বলছে এটা ফেলে গেলে কেন এটার গতি করলো না কেন। পিকু বুঝতে পারছে তা আর কেউ নেই এই দুনিয়ায়।

ওইদিন বাড়ি ছেড়ে পিকু আমাদের শহরে আসে। যে শহরে অনেক পিকু আশ্রয় নিয়েছে পথের মোড়ে বস্তির অলিতে গলিতে। খোলা আকাশের নিচে চাঁদের আলোতে পিকু নির্ভীক শিশু। শুধুমাত্র ক্ষুধার শরীরে শুয়ে আছে মস্ত বড় অট্টলিকার নিচে। কিছুদিন যেতে না যেতেই পিকুর বন্ধু হয়েছে যাদের আমরা পথশিশু বলি, হ্যাঁ ওরা। পিকু খুব বুদ্ধিমান এর জন্য বন্ধুদের মধ্যে পিকুর সমাদর খুব বেশি। হঠাৎ একদিন পিকু দেখে বন্ধুরা খাবার বাটি নিয়ে আসছে। পিকু বন্ধুর সাথে ভাগাভাগি খাবার খেলো। পিকু জিজ্ঞাসা করলো এই খাবার কোথায় দেয়। ওরা বলল বিভিন্ন মানুষ দেয়। যারা দেয় তারা শিশুদের নিয়ে শুধু খাবার দেয় না,পড়াশোনাও করায়। পিকু বলে উঠলে কোথায়। একজন বলল আছে তুই যাবি! তুই যা পিকু তোর ভালো হবে লেখাপড়া করবি। আমরা তো মাদক গ্রহণ করে নষ্ট হয়ে গেছি। তুই আমাদের মতে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবি। পিকু রাজি হলো। সে এখন একটি সেন্টারে থেকে পড়াশোনা করছে।

পিকুর পুনরুত্থান ঘটেছে নতুন জীবনের। পিকু পেয়েছে আলোকিত জীবন। এভাবে সমাজের কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ে পিকুদের মতো হাজারো, লাখো পথশিশুদের নির্ভরতা হয়ে।

আসুন একটু ভালোবাসা, দয়া, দান নিয়ে আমরা পথে থাকা শিশুদের জীবনের পুনরুত্থানের দ্বার উন্মোচন করি।

লেখক: জেভিয়ার শিয়ন বল্লভ
বারাকা, আলোকিত শিশু প্রকল্প

খ্রিস্টের পুনরুত্থান: আমাদের বিশ্বাস ও আশা

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

হাজার বছর পূর্ণ হল। যারা যিশুকে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছে, একসাথে থেকেছে, প্রচার করেছে অর্থাৎ প্রেরিত শিষ্যগণও আজ বেঁচে নেই। তবে যিশু নামে যে একজন ছিলেন এটা আমরা সকলেই জানি এবং বিশ্বাস করি। যিশু টমাসকে যেমন বলেছিলেন "আমাকে তুমি দেখেছ ব'লেই বিশ্বাস করেছ। যারা না দেখেও বিশ্বাস করে ধন্য তারা" (*যোহন ২০:২৯*)। যিশুর পুনরুত্থান রহস্য হল আমাদের ধর্মবিশ্বাসের সর্বপ্রধান ও গুরত্বপূর্ণ তত্ত্ব। যিশুর যাতনা ও ক্রুশ-মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থান হল নিস্তার রহস্যের অপরিহার্য অংশ খ্রিস্টবিশ্বাসের শীর্ষ সত্য ও ভিত্তি। এ মৌলিক সত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এ মহা ঘটনার উপর ভিত্তি করেই প্রেরিত শিষ্যদের বিশ্বাস, আদি সমাজের বিশ্বাস এবং সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাস তথা আমাদের বিশ্বাস গড়ে ওঠেছে। শূন্য সমাধি, সমাধিগুহার মুখ থেকে পাথরখানা সরানো, পড়ে থাকা ক্ষোম কাপরের ফালি সবই প্রকাশ করে যিশু খ্রিস্ট পুনরুত্থান করেছেন। যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের মধ্যদিয়েই মণ্ডলীতে জাগরণ এসেছে, এসেছে বিশ্বাসের পূর্ণতা। যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের আহ্বান করে "আর অবিশ্বাসী হয়ে থেকো না, বিশ্বাসী হও: (*যোহন ২১:২৭*)। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের জন্য নব জীবনের দ্বার উন্মোচন করেছে এবং পরম পিতার সাথে মিলিত হতে সেতু বন্ধন করেছে। আমরা যেন তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি। "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তবে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে"।

আশা: যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের জীবনে নিয়ে আসে আনন্দ, নতুন আশা ও ভালবাসা। দীর্ঘ চল্লিশদিন ত্যাগস্বীকার ও প্রায়শ্চিত্ত করার মধ্যদিয়ে আমরা পুনরুত্থানের আনন্দ ও নবজীবনলাভের প্রতিক্ষায় থাকি। যিশু খ্রিস্টের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্তকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবার পথ খুলে দেয়, অন্তরে জাগায় নতুন আশার বাণী ও স্বয়ং খ্রিস্টকে লাভের আহ্বান। তাই সাধু পল বলেন, আশাতেই পরিত্রাণ লাভ করেছি কারণ আমাদের পরিত্রাণ যে আশারই বস্তু (*রোমীয় ৮:২৪*)। যিশু খ্রিস্ট হলেন আমাদের আবাসস্থল যিনি অন্তরে খ্রিস্টবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে পাপ থেকে মুক্ত করে নবজীবনের পথে নিয়ে যান। পবিত্র বাণী গ্রন্থে বলা হয়েছে তাঁর অসীম করুণা গুণেই তিনি মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান ঘটিয়েছেন আমাদের নব জন্ম দান করেছেন যাতে এক প্রাণময় আশায় আমরা বুক বাঁধতে পারি (*১ম পিতর ১:৩*)। আমরা তারই প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ঐশ জীবন লাভের আশায় জীবন যাপন করি যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। তাই প্রত্যেকজন খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনে পুনরুত্থান হল অনেক আনন্দের, আশার ও চেতনার। আসলে পুনরুত্থান আমাদের জন্য নিয়ে আসে মরণের পর নতুন জীবনের সূচনা, নৈরাজ্যের পর দীপ্ত আশা ও প্রত্যাশা। আমরাও বিভিন্ন সময় আশাহত হই, খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে জীবনে মুক্তি লাভের আশা ও আনন্দ হল খ্রিস্টের পুনরুত্থান; যার মাধ্যমে আমরা খ্রিস্টের মৃত্যু থেকে জীবনে ও কষ্ট থেকে আনন্দে প্রবেশ করি। যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান যুগ যুগ ধরে বিশ্বাসীভক্ত জনগণকে আশার আলো দেখিয়েছে। আর বর্তমান বাস্তবতায়ও তিনি আশাহত মানুষদের নতুন করে বেঁচে থাকার জন্য আশার আলো ও সামনে এগিয়ে যাবার সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান বিশ্বে মানুষে মানুষে যে হিংসা, বিবাদ, বিদ্বেষ, যুদ্ধ, হানাহানি চলছে সেখানে পুনরুত্থিত খ্রিস্ট শান্তি ও আশার আলোকবর্তিকা যা আমাদের শান্তি, আনন্দ ও পবিত্র জীবন যাপন করার আহ্বান করে। জীবনে যত বাঁধা বিপত্তি দুঃখ কষ্ট আসুক না কেন আমরা যদি খ্রিস্টে বিশ্বাস ও আস্থা আমরা রাখি তাহলে তাঁরই মত পুনরুত্থিত হতে পারবো॥ ❑

ঢাকা ক্রেডিটের পক্ষ থেকে সবাইকে পাস্কাপর্ব উপলক্ষে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দীর্ঘ মেয়াদি সঞ্চয় আমানত প্রকল্প

ঢাকা ক্রেডিটে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করুন

মেয়াদ	সুদের হার
৬ মাস	৭ %
১ বছর	৮ %
২ বছর	৯ %
৩ বছর	৯.৫ %
৫ বছর	১০ %

(০১.০৪.২০২৩ থেকে কার্যকর)

বিস্তারিত জানতে
ঢাকা ক্রেডিটের নিকটস্থ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন
০৯৬৭৮৭৭১২৭০, ০১৭০৯৯৯৩০৯২

উচ্চশিক্ষা সাপোর্ট ঋণ

উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য

সুবর্ণ সুযোগ!

- ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১৫,০০,০০০ টাকা।
- ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং পেশায় অধ্যয়নের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা।
- ঋণের মেয়াদ ৫ বছর বা ৬০ মাস।
- সুদের হার ১২%।

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য স্বচ্ছলতা ঋণ

ব্যাংক সলভেন্সির অভাবে আপনি কি বিদেশে যেতে পারছেন না?

ব্যাংক সলভেন্সি পেতে আজই সুযোগ গ্রহণ করুন।

- সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ৭৫ লক্ষ টাকা।
- ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৬ মাস।
- সুদের হার ১২%।

বিস্তারিত জানতে ঢাকা ক্রেডিটের নিকটস্থ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা।

স্থাপিত : ১৯৫৫ খ্রি: রেজি: নং ৪২/১৯৫৮ ঠিকানা : ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, ফোন: ০৯৬৭৮৭৭১২৭০, ০২৪৮১২১১৫৭, ০২৫৮১৫২৬৪০, ০২৫৮১৫৩৩১৬, ০২৫৮১৫০২৭৬, ঋণ সংক্রান্ত হট নাম্বার: ০১৭০৯৮১৫৪০৬, এটিএম সংক্রান্ত হট নাম্বার: ০১৭০৯৮১৫৪০০, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল: info@cccul.com, ওয়েব সাইট: cccul.com, অনলাইন নিউজ : dcnewsbd.com
অনলাইন টিভি: dctvbd.com, ফেসবুক : facebook.com/dhakacredit

বিজ্ঞ/১২৭/২০২৩

শান্তির নীড়
বৃদ্ধাশ্রম

আমাদের প্রয়াসে আপনিও অংশ নিতে পারেন!

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। সদস্যদের আবাসন সমস্যা নিরসনে নিবেদিতভাবে সোসাইটি কাজ করে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত। ব্যবস্থাপনা পরিষদ সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'শান্তির নীড়' বৃদ্ধাশ্রম খুব শীঘ্রই উদ্বোধন করতে যাচ্ছে। প্রকল্পটি তেঁতুইবাড়ী, মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জে অবস্থিত। প্রকল্পটি পরিচালনায় নিম্নোক্ত পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১. অপারেশন ম্যানেজার

কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত/নার্স/প্যারামেডিকেল ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০/১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পদের সংখ্যা ঃ ১
বেতন ঃ আলোচনা সাপেক্ষে

২. ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২/৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর/স্নাতক প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পদের সংখ্যা ঃ ২
বেতন ঃ আলোচনা সাপেক্ষে

৩. এক্সিকিউটিভ শেফ

এইচএসসি বা সমমানের এবং রন্ধন শিল্পে নূন্যতম ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পদের সংখ্যা ঃ ১
বেতন ঃ আলোচনা সাপেক্ষে

৪. মেইনটেনেন্স অফিসার

এইচএসসি/ এসএসসি বা সমমানের নূন্যতম ৫/১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পদের সংখ্যা ঃ ১
বেতন ঃ আলোচনা সাপেক্ষে

৫. কুক হেলপার

এসএসসি বা সমমানের নূন্যতম ৫/১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।।

পদের সংখ্যা ঃ ২
বেতন ঃ আলোচনা সাপেক্ষে

৬. পিয়ন
পদের সংখ্যা ঃ ১

৮. ক্লিনার
পদের সংখ্যা ঃ ২

৭. হাউস কিপার
পদের সংখ্যা ঃ ২

৯. সিকিউরিটি গার্ড
পদের সংখ্যা ঃ ২

অষ্টম শ্রেণী বা সমমান এবং নূন্যতম ২/৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

আবেদনের নিয়ম:

১। সদ্যতোলা ২ কপি রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি।
২। আবেদনকারীর বয়স সর্বোচ্চ ৩৬ তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের কোনো বাধা নেই।
৩। কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং সকল পদের জন্য ইংরেজিতে দক্ষতা থাকতে হবে।
৪। আপনি যে পদের জন্য আবেদন করতে আগ্রহী তা খামের উপরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

বায়োডাটা ৩০ এপ্রিল ২০২৩ এর মধ্যে সোসাইটির প্রধান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

১. আবেদনপত্রের যাচাই-বাছাই, যোগ্য প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা দ্বারা অনুসরণ করে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত সময় এবং তারিখ সোসাইটির নোটিশ বোর্ড/এসএমএস/ইমেল/টেলিফোনের মাধ্যমে জানানো হবে।

২. কোনো ধরনের তদবির বা সুপারিশ বা রেফারেন্স প্রত্যাখ্যান বা অযোগ্যতার কারণ হবে।

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

বিজ্ঞ/ ১২৬/২০২৩

যিশুর পুনরুত্থান, নবজীবন প্রবাহমান

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

২৫ ডিসেম্বর যিশুর জন্মোৎসব কি ঘটা করেই না উদ্‌যাপন করা হয়; আমরা করি এবং তা করা ভুল নয়, অপ্রাসঙ্গিকও নয়। তবে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান খ্রিস্টীয় ধর্ম ও বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। এই সত্যের উপর সাধু পল তাঁর পত্রে শিক্ষাবাণীতে বহুবার উল্লেখ করেছেন। আর তা তো আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসের ভিত্তি। খ্রিস্টযাগে তো আমরা যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানেরই স্মরণ উৎসব পালন করি। খ্রিস্টযাগে পুরোহিত যখন আমাদের বিশ্বাসের রহস্য ঘোষণা করতে আহ্বান জানান, তখন সবাই বলে উঠি: হে প্রভু, আমরা তোমার মৃত্যু ঘোষণা করি, তোমার পুনরুত্থান স্বীকার করি, তোমার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায়।

বিশ্বাসের রহস্য, যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান

যখনই কোন রহস্য, তখনই আনত মস্তকে সেই রহস্যকে মেনে নেওয়া, স্বীকার করা। যিশু মৃত্যুবরণ করেছেন, সমাধিস্থ হলেন। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, আবার বিশ্বাসের রহস্য। মানবজাতির পাপ-অপরাধের জন্য যিশু হলেন অপমানিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, ক্রুশবিদ্ধ; ক্রুশেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর মন্দিরের পর্দা খুলে গেল; স্বর্গদুয়ার মানবকুলের জন্য হলো উন্মুক্ত; বক্ষ থেকে বেরিয়ে এল জল ও রক্ত: জীবনদয়ী জল; নবজীবনদানকারী জল, দীক্ষাস্নান। বক্ষ হতে নির্গত রক্ত তো আহার ও পানীয়ের কথাই ব্যক্ত করে, খ্রিস্টপ্রসাদে তো আমরা তাঁর দেহ গ্রহণ করি, তাঁর রক্ত পান করি এবং নবজীবন, শাশত জীবন লাভ করি। যিশু তো বলেইছেন: "যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে শাশত জীবন পেয়েই গেছে।" অতএব যিশুর এই মৃত্যু পরিত্রাণদায়ী মৃত্যু। তিনি মরেন, আমরা যেন বাঁচি। এখানেই তো পুত্রের মধ্যদিয়ে পিতা ঈশ্বরের চূড়ান্ত ভালোবাসার প্রকাশ। "বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়ার চাইতে বড় ভালোবাসা আর কিছু নেই" এ-তো যিশুরই কথা। তিনি যা শিষ্যদের বলেছেন প্রাণ দিয়ে তথা মৃত্যু দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন।

যিশুর পুনরুত্থান

উত্থান। পুনরায় উঠেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, বুঝা যায়, এমন কি অনুধ্যান করা যায় যে, মানবকুলের পরিত্রাণের জন্যেই পিতার ইচ্ছানুসারে পুত্র যিশুর আগমন। এই পরিত্রাণের প্রথম শুভ সংবাদটিই ঈশ্বর শুনিয়েছিলেন প্রথম মানব-যুগলকে। এই পরিত্রাণ স্বাভাবিক অর্থেই বলতে পারি, ঈশ্বরে নবজীবন; নিষ্কলুষ জীবন; স্বচ্ছ-সুন্দর-পবিত্র জীবন; স্বর্গসুখ লাভের জন্য যা অতীব প্রয়োজন। এই পরিত্রাণ জীবন বাস্তবে মানুষের জন্য আনিত হল যিশুর আগমনে, তিন বছর যাবৎ পরিত্রাণদায়ী প্রকাশ্যজীবনে: সুস্থতা, পাপের ক্ষমা, নতুন শিক্ষা, নতুন মূল্যবোধ। শত বাধাবিপত্তির, ফরিশীদের শত আক্রমনাত্মক আচরণের মাঝেও যিশুর পরিত্রাণদায়ী কাজ ছিল চলমান। আর শেষে মৃত্যুকে তথা পাপের রাজ্যকে আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থান দিয়ে চূড়ান্তভাবেই এই মানব-পরিত্রাণকে বাস্তবে ঘটালেন। পুনরুত্থান না হলে মৃত্যু তথা পাপের হতোনা পরাজয়; মানুষ পেত না ভয়ের মাঝে অভয়। একাধারে যিশুর পুনরুত্থান মৃত্যুর উপর জয়; পাপের উপর জয়, মানুষের পাপের উপর জয়: তাঁর মৃত্যু মানবকুলের পাপের মৃত্যু, তাঁর গৌরবময় পুনরুত্থান, মানবকুলের পুনরুত্থান। তাঁর নবজীবন, তাঁর চাইতে গোটা মানবজাতির নবজীবন। গান আমরা গাই: "তাঁর নতুন জীবনে, পেয়েছি জীবন"। তাঁর পুনরুত্থান এনে দিয়েছে নবসৃষ্টি। একটা মজার বিষয়: পবিত্র শাস্ত্র শুরু হয়: আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। আর তাঁর বাণীর শক্তিতেই গড়া এই নবসৃষ্টি। সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচার শুরু হয়: আদিতে ছিলেন বাণী। আর সেই বাণী দেহধারণ করে মানবমঝে বাস করে, গোটা সৃষ্টিকে, মানবকুলকে করে তোলেন এক নবসৃষ্টি; আর এই নবসৃষ্টি স্থাপিত হলো তাঁর পুনরুত্থান দ্বারাই। পুণ্য শনিবার নিস্তার বন্দনায় আমরা শুনি এই পরিত্রাণেরই কথা যে পুনরুত্থান মানুষের জন্য নিয়ে এসেছে নবজীবন, পুনরুত্থিত জীবন। বলা আছে: ধন্য হে অপরাধ, যার জন্য আমরা পেয়েছি এমন এক মুক্তিদাতা যিনি মহাগৌরবে পুনরুত্থান করে আমাদের জীবনে এনেছেন নবজীবন; নবউত্থিত জীবন।

শূন্য কবর

যিশুর মৃত্যু যেমন ঐতিহাসিক এক ঘটনা, তার গৌরবময় পুনরুত্থানও একটি ঔতিহাসিক ঘটনা। পুনরুত্থানের এই ঐতিহাসিকতাই ব্যক্ত করে যিশুর শূন্য কবর। শূন্য কবর তা-ই যিশুর পুনরুত্থানকেই প্রকাশ ও প্রচার করে। মানুষকে নবজীবনে আনাই যার উদ্দেশ্য, তিনি পাপসম কবরের পচাগলায় থাকতেই পারেন না। মানুষের শত পাপময়তার উপর বিজয় এনেছে যিশুর পুনরুত্থান। অতএব যিশুর পুনরুত্থান মানুষের জন্যে, মানুষের কারণেই। শূন্য কবর পুনরুত্থানের একটি নিগূঢ় রহস্য।

এই রহস্য বিশ্বাস করে, শতভাগ বিশ্বাস করে মারীয়া মাগ্দালেনা বলে উঠেছেন, "আমি দেখেছি তাঁর শূন্য সমাধি"। অর্থাৎ তিনি কবরে নেই; তিনি সত্যিই জীবিত; চিরন্তন। তাঁর পুনরুত্থান নিয়তই বিদ্যমান, চলমান, প্রবাহমান। তাঁর আর মৃত্যু নেই; তিনি জীবন্ত খ্রিস্ট আজ, আগামী ও চিরকাল। তিনি এক চিরনতুন মহিমায় ভূষিত পুনরুত্থিত খ্রিস্ট। তার এই মৃত্যুঞ্জয়ী ঘটনা-ই আমরা প্রতি বছর পালন করি, এ বছর ৯ এপ্রিল।

আজ পুনরুত্থান মহোৎসব। এই বছর আমরা যে বাণী বা Message নিতে পারি তা হলো: পচা-গলা তো আমাদের সবারই আছে। আমাদের উত্থিত করেছেন যিশু তাঁর উত্থানের মধ্যদিয়ে। দীক্ষাস্নানে আমরা প্রত্যেকেই পাপে মৃত্যুবরণ করে যিশুর পুরুত্থানে নবজীবন লাভ করেছি। প্রতি বছরই পুনরুত্থান বা পাস্কা পর্ব উদ্‌যাপন করেই যাচ্ছি। আমরা কি আমাদের মধ্যে "পুনরুত্থিত জীবন" চলমান রেখে জীবন অতিবাহিত করছি?

নবায়িত জীবন প্রবাহমান একটি সাধনা

পুনরুত্থান পর্ব উদ্‌যাপন করা সহজ, দীক্ষাপ্রতিজ্ঞা নবায়ন করা সহজ; কিন্তু পুনরুত্থিত জীবনকে চলমান রাখা একটি কঠিন বিষয়; প্রতিদিন প্রতিক্ষণে একে কথায়, কাজে, আচরণে, শত প্রতিকূলতায় ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক, সামাজিক, মাণ্ডলিক জীবনে চিরসবুজ তথা সদা পুনরুত্থিত, সদা নবায়িত থাকা একটি চ্যালেঞ্জ, একটি সাধনা; তবে সম্ভব, কিছুতেই অসম্ভব নয়। তা করার জন্য আত্মিক শক্তি লাভ করি প্রভুরই দেওয়া সাক্রামেন্ত থেকে: খ্রিস্টযাগ, পাপস্বীকার, খ্রিস্টপ্রসাদ। তাছাড়া প্রার্থনা তো আছেই। অতএব আসুন পুনরুত্থিত হই যিশুর সাথে শুধু আজকের এই শুভ পাস্কার দিনেই নয়; বরং দিন দিন প্রতিদিন। সমুজ্জ্বল হই, মহিমান্বিত হই, গৌরবান্বিত হই পাপময়তা বর্জন করে, পুণ্য অর্জন করে কথায়, কাজে ও আচরণে। শেষ করি শ্লোগান দিয়ে: যিশুর পুনরুত্থান, নবজীবন প্রবাহমান! ❑

খোলা জানালা

ধর্মপল্লীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনে কিছু অভিজ্ঞতা

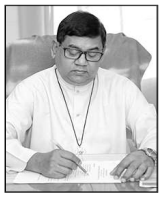

ফাদার কমল কোড়াইয়া

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের কথা। আমেরিকার ওরিগন অঙ্গরাজ্যে হলিক্রস ধর্মসংঘ পরিচালিত পোর্টল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে এমএ করছিলাম। হলিক্রস ফাদার সুব্রত গমেজ ও ব্রাদার সুবল রোজারিও একই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করছিলেন। তাঁদের সুবাদেই আমাকেও ইউনিভার্সিটিতে হলিক্রস ফাদার-ব্রাদারগণ তাঁদের সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। আমি ধর্মপ্রদেশীয় যাজক তা অনেকে জানতেনই না। হলিক্রস ব্রাদার ফুলজেন্স ডরোথি অনেক বছর বাংলাদেশে মিশনারী হিসেবে আঞ্চলিক প্রধান, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সে সময় তিনিও পোর্টল্যান্ড ইউনিভার্সিটির বিদেশী শিক্ষার্থীদের পরিচালক থাকায় আমরা অনেক বেশী সুবিধা পেয়েছিলাম।

হলিক্রস ফাদার-ব্রাদারদের সহযোগিতায় আমাদের সুযোগ হয়েছিল আমেরিকায় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে তাঁদের পালকীয় কাজ ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার। হলিক্রস ব্রাদারদের পরিচালনায় একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে আমেরিকার ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যে রেঞ্জার ইন্ডিয়ানা নামে তাঁদের একটি কৃষিখামার ছিল। প্রথমে আমার বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিল। এমন প্রতিষ্ঠান কেনইবা ব্রাদারগণ পরিচালনা করছেন। গরুর বিরাট খামার। সবজি চাষও আছে। অনুমান করি শত একর জমির উপর খামারটি প্রতিষ্ঠিত। একদিকে দুধের জন্যে গাভী আর অন্যদিকে মাংসের জন্যে ষাড় গরু। আধুনিক সব যন্ত্রপাতি দিয়ে ঘাস চাষ, গাভীর দুধ সংগ্রহ-সংরক্ষণ, মাংস প্রস্তুত-প্যাকেটজাতকরণ-সংরক্ষণ। দুগ্ধজাত বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার-ঘি, পনির, চিজ্, দই তৈরীসহ দুগ্ধজাত অনেক কিছুই এখানে প্রস্তুত করার ব্যবস্থা আছে। দুধ সংরক্ষণের জন্যে আমাদের দেশে পানির ট্যাংকের মত রিরাট ট্যাংক। বিশেষ যন্ত্র দিয়ে গাভী থেকে সরাসরি দুধ সংগ্রহ করে ট্যাংকিতে সংরক্ষণ করে তা বিভিন্ন দুগ্ধবিপণন কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করা হয়। একইভাবে গরুর মাংস। বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে হোস্টেল-বোডিং-এর জন্যে এ ফার্ম থেকে তাজা সবজিও সরবাহ করা হয়।

বয়সে তরুণ এমন একজন ব্রাদারও চোখে পড়ল না। একজন বেশ বয়স্ক ব্রাদারকে দেখলাম তিনি খুব ব্যস্ত। তবুও আমাদের একটু সময় দিলেন। তিনি জানালেন তাঁর ক'জন সহপাঠী ব্রাদার-ফাদার বাংলাদেশে মিশনারী হিসেবে পালকীয় সেবা কাজ করেছেন। আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি, এখন আমেরিকায় পড়াশুনা করছি জেনে তিনি খুশী হয়েছেন। জানতে চাইলাম এ বিরাট কর্মযজ্ঞের মর্মকথা। তিনি যা আমাদের বললেন তা রীতিমত অবাক হবার মতই। ব্রাদার বললেন, আমরা এখান থেকেই মিশনারী কাজ করছি। প্রভুর বাণী প্রচার করছি। গরুর খামারে কাজ করে মিশনারী, প্রভুর বাণী প্রচার-কথাগুলো কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হল। বুঝতে পারলাম না। আমাদের দিকে তাকিয়ে ব্রাদার একটু হেসে বললেন, অবাক হচ্ছো? আমাদের অনেক হলিক্রস ব্রাদার-ফাদার এশিয়া-আফ্রিকার অনেক দেশে মিশনারী হিসেবে কাজ করছেন। তাঁরা গরীব-দুঃখীদের নিয়ে কাজ করেন। আমরা এখান থেকে যা উপর্জন করি তা মিশন কান্ট্রিতে পাঠাই। তাঁরা তা দিয়েই গরীব-দুঃখীদের সেবা করেন। প্রভু বাণী প্রচার করেন। কথাগুলো শুনে নিজের অজান্তেই চলে এলাম আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে। আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কতইতো হলিক্রস ফাদার-ব্রাদার-সিস্টারদের সহায়তা পেয়েছি। সাহায্য করতে দেখেছি। ভাবছিলাম, এই যে আমার আজ আমেরিকায় পড়াশুনায় আসা তাওতো হলিক্রসদের ভালোবাসার উপহার, তাঁদেরই স্কলার্শিপে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে হলিক্রস মিশনারীগণ এ পূর্ববঙ্গে মিশনারী হিসেবে সেবাকাজ করছেন। বাংলাদেশে তাঁদের অবদান কি অংকে বা কথায় পরিমাপ করা যাবে? পূর্বে আমি কোন দিনই ভাবিনি কৃষি খামারের মধ্যদিয়েও প্রভুর বাণী প্রচার করা যায়। মিশনারী হওয়া যায়। মিশনারী সেবাকাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা যায়, অবদান রাখা যায়।

এ সময়োপযোগী সত্য-বাস্তব ঘটনাটি আমার যাজকীয় পালকীয় জীবনই পাল্টিয়ে দিয়েছে। পড়াশুনা শেষ করে দেশে ফিরে এলাম ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে। আমার একই চিন্তা বাংলাদেশেও আমাদের ধর্মপল্লীগুলো কীভাবে অর্থনৈতিকভাবে আমরা স্বাবলম্বী করতে পারি। দেশে ফেরার পর আমার পালকীয় কর্মক্ষেত্র হল সাভার ধরেন্ডা ধর্মপল্লী। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আমার জীবনের প্রথম ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু। হলিক্রস ফাদারগণ সুদীর্ঘ সময় খুবই সফলতা ও দক্ষতায় এ ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবা দান করেছেন। হলিক্রস সংঘের আর্থিক সহযোগিতায় গরীব দুঃখীদের খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা-বাসস্থানসহ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই অবদান রেখেছেন। অনেক গরীব নারী-পুরুষ মিশনে প্রতিদিন কাজ করে পরিবার ভরণপোষণ করার সুযোগও পেয়েছেন। আমিতো একজন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক। আমার আর্থিক সামর্থ্য-সহযোগিতা খুবই সীমিত। আমার মাথায় স্বাবলম্বী হবার পোকা তখনও কামড়াচ্ছে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে মনে শান্তিও পাই না। ধর্মপল্লীর সীমিত সম্পদ দিয়েই শুরু করলাম স্বাবলম্বী হবার প্রথম উদ্যোগ। পাঠকগণ আপনাদের সাথে স্বাবলম্বিতার পথে সামান্য অভিজ্ঞতা সহভাগিতাই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

১) পেঁপে বাগান: ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের কথা। সাভার ধরেন্ডা ধর্মপল্লীতে পালকীয় কাজ করার সময় লক্ষ্য করলাম অনেক কর্মক্ষম লোক নানা কারণেই কর্মহীন। পরিবার অভাবে দিনাতিপাত করছে। বেশ কিছু পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষ নেশাগ্রস্ত। জমা-জমি বিক্রি করে দিচ্ছে। পরিবারে অনেক অশান্তি। সন্তানেরা লেখা-পড়া করতে পারছে না। করলেও স্কুলের খরচ বহন করতে পারছে না। ধর্মকর্মেও এ পরিবারগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে। ধর্মপল্লীর আয়ও তেমন নেই। গির্জাঘরের পাশেই একটা গোলাপ বাগান। সাথেই একটা মাঠ। মাঠটি আর ব্যবহার করা হয় না। প্রাইমারী ও হাইস্কুল রাজাশন গ্রামে স্থানান্তর করায় খেলার মাঠও সেখানে হয়ে গেছে। কমলাপুর গ্রামেও প্রাইমারীস্কুল প্রতিষ্ঠা করায় খেলার মাঠও সেখানে রাখা হয়েছে। ধরেন্ডা গ্রামও স্বউদ্যোগে একটা খেলার মাঠ ব্যবস্থা করে নিয়েছে। প্রয়োজনে তাদের রাজাশন বা কমলাপুর মাঠেও খেলার সুযোগ ছিল। পালকীয় পরিষদের সাথে আলোচনা করে গির্জার পাশের মাঠটি সবজি বাগান করার পরিকল্পনা করলাম। স্থানীয় সরকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে তাদেরই সহযোগিতায় পেঁপে চাষ করার স্বল্প মেয়াদী প্রকল্প হাতে নিলাম। এ প্রকল্পে কাজ করার জন্যে পালকীয় পরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে দশজন দরিদ্র-নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্ধারণ করলাম। তাঁরা পেঁপে বাগানে কাজ করবেন। তাঁদের সাথে সহায়তার জন্যে একজন দক্ষ-অভিজ্ঞ কৃষককেও নেয়া হল। এ কর্মীবাহিনীর জন্যে কিছু নিয়ম-নীতি ঠিক

করে দেয়া হল। প্রতিদিন সকালে তাঁরা পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করবেন। তারপর গির্জায় প্রার্থনা করবেন। সকাল ৮টায় কাজ শুরু করবেন। ৯-১০টার সময় পরিবার থেকে স্ত্রী বা পরিবারের সদস্য নাস্তা নিয়ে আসবেন। সম্ভব হলে তারা একসাথে নাস্তা খাবেন। তারপর আবার কাজ শুরু করবেন। দুপুরে বাড়ী থেকে খাবার আসবে। খেয়ে গির্জা প্রাঙ্গনেই বিশ্রাম। বিকেলে আবার কাজ। সন্ধ্যায় প্রার্থনা। তারপর বাড়ী চলে যাওয়া। পরদিন সকাল থেকে আবার রুটিন মাফিক কাজ। প্রতিদিন তাঁদের একশত (১০০) টাকা মজুরী দেয়া হত। প্রথম ক'সপ্তাহ বেশ কঠিন ছিল। তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। সারাদিন মিশন চত্বরে থাকায় ও নিয়মিত প্রার্থনা-খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও কাজকর্ম করায় তাঁদের জীবনে ফিরে এলো আত্মবিশ্বাস। নিয়মানুবর্তিতা। নিজে থেকেই গির্জায় আসা অভ্যেস হয়ে গেল। নেশা গ্রহণ বন্ধ হয়ে গেল। সময় কোথায়? স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে মিলন-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল। প্রশ্ন থেকেই যায়- টাকা কোথায় পেলাম? আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র কাছে আমার এ প্রস্তাব উপস্থাপন করলে তিনি আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। পরে কর্মীবাহিনী কাজ করে তাঁদের মজুরি নিজেরাই উপার্জন করে নিয়েছিলেন। মাঠে তাঁরা সবজি বাগান করে বেশ টাকা পেতেন। তাছাড়া মাঠের মধ্যে কৃষিকর্মকর্তাদের নির্দেশনা ও সহায়তায় তাঁরা ৫০টি পেঁপে গাছ লাগিয়েছিলেন। দুই মাসের মধ্যেই প্রচুর পেঁপে ধরে ছিল। হিসেব করে দেখা গেল ৫০টি পেঁপে গাছের পেঁপে বিক্রি হয়েছে ৫০হাজার টাকারও বেশী। তাঁরাই এ পেঁপে বিক্রি করতেন। হিসেব তাঁরাই রাখতেন। পেঁপে বিক্রির টাকা দিয়েই তাঁদের দৈনিক মজুরি হয়ে যেত। তিন মাস পর আবার নতুন দশজন এ প্রকল্পে যোগদান করতেন। পুরাতনরা নিজের বাড়ীতেই শস্য উৎপাদন করার চেষ্টা করতেন। অভ্যেসমত গির্জায় আসা, প্রার্থনা করা, পারিবারিক শান্তি ও আয়-উন্নতিতে তাঁরা অনেকেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। তাঁদের নিয়মিত ফলো-আপেও রাখা হত। মাঝেমধ্যে তাঁদের সাথে মিটিং করতাম। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতাম। পালকীয় পরিষদের সদস্যগণ এ বিশেষ পরিবারগুলোর প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। সহায়তা করতেন। এ প্রকল্পের এখনও কেউ কেউ জীবিত আছেন। দেখা হলে কৃতজ্ঞ চিত্তে হারানো দিনের সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করেন। আর্চবিশপ মাইকেল আমাদের সফল উদ্যোগ দেখে পরে বিধবাদের জন্যে গাভী ও উৎসাহী পুরুষদের জন্যে রিক্সা প্রকল্প শুরুর করার জন্যেও প্রাথমিকভাবে আর্থিক সহায়তা করেছিলেন। পরে সময় করে এ বিষয় সহভাগিতা করার আশা রাখি। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান-আমরা যেন এক ইঞ্চিও আবাদি জমিও পতিত না রাখি। আমরাতো এ উদ্যোগ অনেক আগেই শুরু করেছিলাম। এখন শুধু সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার পালা।

২) অবসর গ্রহণকারী সম্মানিত ব্যক্তিদের নিয়ে প্রকল্প: সাভার ধরেন্ডার পর কিছুদিন পালকীয় কাজ করেছি মাউসাইদ ধর্মপল্লীতে। এখানেও অনেক সুখ-স্মৃতি আছে। পরে এক সময় সহাভাগিতা করব। তারপরই ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারিতে আমার দায়িত্ব পড়ে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে। প্রথমে শুধু সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক। পরে পরিচালক, সম্পাদক, রেডিও ভেরিতাসের বাংলাবিভাগের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব একসাথে পালন করেছি। এখানেও ক'টা প্রকল্প নিয়ে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমার প্রথম প্রকল্পটি ছিল অবসর গ্রহণকারী সম্মানিত ব্যক্তিদের নিয়ে। লক্ষ্য করলাম অবসরে গিয়ে অনেকেই নানাভাবে কষ্ট পান। তাঁদের সময় কাটে না। ঘরে বসে থাকতে থাকতে স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পুত্রবধু-নাতি-নাতনিদের সাথে নানা সমস্যা দেখা দেয়। যিনি এতদিন পরিবারের সমস্ত বোঝা নিজে বহন করেছেন তিনিই হয়ে পড়েন পরিবারের 'অতিরিক্ত' একজন মানুষ। যেন তাঁর মূল্যই নেই। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সীমিত সুযোগে অবসর গ্রহণকারী ক'জন সম্মানিত পুরুষকে নিয়ে শুরু করলাম ছোট একটি প্রকল্প। তাঁদের কাজ তেমন কিছুই না। সকালে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী অফিসে আসতেন। তাঁদের জন্যে বসার স্থান নির্ধারিত ছিল। সাধ্যমত ছোটখাটো কিছু কাজ করতেন। অন্য কর্মীকে সাহায্য করতেন। প্রতিবেশী অফিসে বা জেরী প্রিন্টিং প্রেসে কেউ আসলে তাদের সাথে খোশগল্প করতেন। মাস শেষে তাঁদের হাতে দেয়া হত সামান্য অর্থ। হাত খরচ হয়ে যেত। সময়ও চলে যেত। নিজে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার সুখকর অনুভূতি নিয়ে ঘুমাতে পারতেন। সেন্টারে আসা সম্মানিত ক্রেতা-গ্রাহকগণও আলাপ-চারিতায় সময় কাটাতে পারতেন।

৩) ছাত্র প্রকল্প: লক্ষীবাজার প্রতিবেশী অফিসের পাশেই অনেকগুলো স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সব সময় ক্লাশ হয় না। প্রতিদিনও ক্লাশ হয় না। তা'হলে অবসর সময় তারা কি ভাবে কাটায়? বিষয়টি নিয়ে বেশ ক'জন ছাত্রের সাথে আলাপ করলাম। প্রস্তাব দিলাম অভিজ্ঞতার জন্যে তাঁরা প্রতিবেশী অফিসের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করতে চান কি না? সামান্য পারিশ্রমিক দেয়ার প্রস্তাবও দিলাম। বললাম, বর্তমানে চাকুরীর আবেদনের সাথে তিন-চার বছরের অভিজ্ঞতা সনদ চাওয়া হয়। আমাদের সাথে যুক্ত থাকলে আপনাদের সে সমস্যাটাও সমাধান হবে। বেশ ক'জন এগিয়ে এলেন। কেউ হিসাব বিভাগে, কেউবা প্রতিবেশী বিভাগে, ক'জন জেরী প্রিন্টিং প্রেসে। বলতে ভাল লাগছে, এ প্রকল্পের অনেকেই এখন দেশে-বিদেশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। অনেক অবদান রাখছেন। এখনও আমার সাথে তাঁদের যোগাযোগ আছে। কৃতজ্ঞতাভরে তাঁরা সেদিনের কথা স্মরণ করেন।

৪) গাভী প্রকল্প ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ: ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি পালপুরোহিতের দায়িত্ব পেয়ে আমি এলাম তেজগাঁও পবিত্র জপমালা রাণী ধর্মপল্লীতে। লোকসংখ্যা অনুপাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধর্মপল্লী। অনেক খ্রিস্টভক্ত। বড় গির্জাঘর। ধর্মপল্লী চত্বরেও অনেক কাজ। করব খনন, কবরস্থান পরিষ্কার করা, গির্জাঘর ও চত্বর পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখাসহ আরও অনেক কাজ। ১৫-১৬ জন কর্মী নিয়মিত কাজ করছেন। কিন্তু আমার পর্যবেক্ষণে মনে হল, সকল কর্মী সব সময় কাজ করছেন না। কিন্তু তাঁদের ছাড়াও ধর্মপল্লীর যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় বিকল্প হিসেবে দরকার কর্মীদের কর্ম সৃষ্টি করা। লক্ষ্য করলাম কবরস্থানে প্রচুর বড় বড় ঘাস। একজন কর্মী তা পরিষ্কার করতে পারছেন না। খ্রিস্টভক্তগণ এসে রাগারাগি করেন বা ইচ্ছে মত টাকা দিয়ে তা পরিষ্কার করেন। ইচ্ছে মত নানা গাছ রোপন করেন। এতে সৌন্দর্য্যের চেয়ে জঙ্গলই বেশী মনে হয়। কবরস্থানের আবর্জনা ফেলতে সিটি করপোরেশনকে ট্রাক অনুপাতে টাকা দিতে হয়। আবার ফুলের ও সবজির বাগান করতেও প্রচুর গোবর দরকার হয়। ফাদার মিন্টু পালমা বাগান করতে খুবই পছন্দ করেন। এতটুকু খালি জায়গা পেলেই তিনি নানা সবজি-ফল-ঔষধি গাছ রোপন করেন। আম, কাঁঠাল, বেল, আমড়া, পেয়েরা, জামবুড়া আরও কত কি ফল গাছ তিনি লাগিয়েছিলেন। এত ছোট পরিসরে তিনি নিমগাছ, কলাগাছ, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, করলা, বরবটি সিমেরও চাষ করতেন। আবার তিনি ঘড়ের চালে বা বড় গাছেও এগুলো তুলে দিতেন। গাছে সবজি ঝুলে থাকা দেখতে ভালই লাগতো। সুপরিকল্পিতভাবে তিনি লালশাক, পাটশাক, শালগম, পালংশাক, মূলা, গাজর, লেটুসপাতা, ফুলকপি, বাধাকপি যতসব মৌসুমি তাজা শাক-সব্জী উৎপাদন করতেন। আমরাও মজা করে খেতে পারতাম। ফাদার রণজিত গমেজ ও ফাদার রিপন রোজারিও বাগান ও গরু পালন উভয়ই পছন্দ করতেন। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা একটা গাভী কিনব। অবশ্য আমার পূর্ববর্তী পালপুরোহিত আলবার্ট রোজারিও একটি ষাঁড় গরু রেখে গিয়েছিলেন। ষাঁড়টি ৮০ হাজার টাকা বিক্রি করে ৯০ হাজার

টাকা দিয়ে একটি গাভী কিনলাম। ১০ লিটার দুধ পেতাম। প্রথমে একটু অসুবিধা হলেও পরে অনেকেই গাভীর খাঁটি দুধ কিনতে আসতেন। কবরস্থানের ঘাসই যথেষ্ট ছিল। পাশেই ছিল মাদার তেরেজা সম্প্রদায়ের সিস্টারদের কনভেন্ট। তাঁদের ভাতের ফেন ও সবজির চোকলাও গরুর উপাদেয় খাবার। মাঝে মাঝে সিস্টার বাড়ীর রোগীরাও দুগ্ধ পেয়ে খুশী হতেন। গাভীর দুধের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমাদের আয়ও বাড়তে লাগলো। আমাদেরও আর দুধ ক্রয় করতে হত না। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান অনেকেই সকালবেলা ভিড় জমাতেন দুধের জন্যে। পাশেই স্কুল থাকায় মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল মিশনে গাভীর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়। শিশু-বুড়ো-বুড়ি ও অসুস্থদের জন্যেই বেশী দুধের চাহিদা ছিল। আমরা সকলেই একমত হলাম-এটাও একটা সেবা কাজ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিদিন এত মানুষ গির্জাচত্বরে দুধ সংগ্রহ করতে এসে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরী হয়। প্রতিবেশিসুলভ আচরণ বৃদ্ধি পায়। তাঁরা নানা দুঃখ-সুখের আলাপচারিতায় সময় কাটাতে পারেন। গল্প-গুজবে সময় চলে যেত। ঢাকা শহরের মত ইট-পাথরের এ শহরে এমন মানবিক পরিবেশইতো দরকার। একদিনতো একজন বলেই ফেললেন, আমরা বছরে একবার বা দুবার এত টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের নিয়ে সংলাপ করি। তারপর আর দেখা হয় না। কথা হয় না। চিনিও না। লাভের লাভ হল আনুষ্ঠানিকতা আর এক সাথে কিছু নীতি কথার পর খাবার-দাবার। প্রতিদিন গির্জা চত্বরে দুধ সংগ্রহ করতে এসেই আমাদের জীবন সংলাপ হয়ে যাচ্ছে। এখানে কোন আয়োজন দরকার হয় না। খরচও নেই। আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে আসি, গল্প করি। নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলি। হাসি-তামাসা করি। আমাদের ধর্মের কথাও হয়। ঢাকা শহরে এমন পরিবেশে আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। তিনি একচিলতে তৃপ্তির হাসি দিয়ে বললেন, এটাই বাস্তব জীবন সংলাপ।

তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে কর্মরত ফাদারগণ মূল্যায়ন করে দেখলাম-আমাদের লাভ ছাড়া কোন ক্ষতি হচ্ছে না। আমাদের অতিরিক্ত কোন কর্মচারীও দরকার হচ্ছে না। বরং আমাদের সকল কর্মচারীদের বেতন হয়ে যাচ্ছে এ গরু খামার থেকেই। প্রতিদিন মানুষও মরে না । কবরও প্রতিদিন খনন করতে হয় না। গির্জা চত্বরে প্রচুর ঘাস হয়। পরিষ্কার করার জন্যেও দরকার কাজে লোক। এ কর্মচারী দিয়েই গরু লালন-পালন করা যায়। একে একে আমরা ৫টা গাভী কিনেছিলাম। প্রতিটি গাভী থেকে ১৫-২০ লিটার দুধ পেতাম। এক সময় দিনে আমরা প্রায় ৮০-৯০ লিটার দুধ পেয়েছি। প্রতি লিটার দুধ প্রথমে ৮০ টাকা পরে ১০০ টাকায় বিক্রি করেছি। প্রচুর গোবর হত। অনেকে ছাদকৃষির জন্যে বিনা পয়সায় গোবর নিয়ে ছাদে বাগান করেছেন। ঢাকা শহরের অনেক ফাদার-সিস্টার-ব্রাদারদের হাউজে বিনা পয়সা গোবর সার সরবাহ করা হয়েছে। প্রতি বছরই নতুন নতুন বাছুর হত। এক বছরের বাছুর ৪০-৫০ হাজার টাকায় বিক্রি হত। মা গাভী থাকতো লাভেই। মজার বিষয় হল, আমরা সকল ফাদার-কর্মচারীই গরু লালন-পালন করতে পছন্দ করতাম। আনন্দ পেতাম। যত্নও নিতাম। এটা আমাদের উৎপাদন ও সৃজনশীল বিনোদনও ছিল।

সমস্যা যে একেবারেই হয়নি তা নয়। শীতকালে ঘাসের সমস্যা হত। বৃষ্টির সময় ঘাস সংগ্রহ করা কঠিন হত। কোন কোন মানুষ গরু বা গোবরের গন্ধ নিয়ে সমালোচনা করতেন। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। জনগুরুত্বপূর্ণ সেবাকাজের চেয়ে তাদের সমালোচনাটা গুরুত্বহীন বলেই আমরা মনে করতাম।

বর্তমানে বিদেশী আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর করে আমাদের ধর্মপল্লীর কার্যকলাপ পরিচালনা করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। করোনা মহামারী, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, অর্থনৈতিক মান্দা, ধর্মের প্রতি মানুষের অনীহা, বেকারত্বসহ নানা কারণেই চার্চের অনুদান কমে আসছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে গরীব-দুঃখীদের সংখ্যা। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের তকমার পর বিদেশী অনেক সাহায্য হয় কমে যাচ্ছে, না হয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমন বাস্তবতার মুখে আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতেই হবে। আমাদের ধর্মপল্লীগুলোকে বিষয়টি আরও গুরুত্ব দিয়ে নানাবিধ স্বাবলম্বনভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। আমাদের চার্চ পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে একযোগ একসাথে একাত্ম হয়ে সম্মিলিতভাবে আগামী দিনের ভিশন-মিশন নির্ধারণ করার এখনই উপযুক্ত সময়। এমন বাস্তবতায় আমার এ সহভাগিতা কিছুটা হলেও অনুপ্রেরণা যোগাবে বলেই আমার বিশ্বাস॥ ❑

উপাসনায় উপস্থিতি কম

(২৯ পৃষ্ঠার পর)

এমন কী বারান্দাসহ ভরপুর। বিষয়টি ভাবনারই বটে! বলা হতে পারে যেকোন স্থানে বসে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর তা শুনেন; এখন ধর্মপল্লীর গির্জা বা চেপেলের সংখ্যা এলাকাভিত্তিক বৃদ্ধি পাচ্ছে; খ্রিস্টভক্তগণ এখন উন্নত জীবনযাপনের প্রত্যাশায় প্রবাসী হয়ে ওঠছে-ইত্যাদি। যুক্তিসঙ্গত কথার পরও আমাদের কিছু অসংগতিও যে রয়েছে সেটা স্বীকার করবার ইচ্ছেটাকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করি কখনও কখনও।

একটা সময় ছিল রবিবারে গির্জায় পরিবারের সকলে কোন কাপড় পরিহিত হয়ে যাবে সেই কাপড় শনিবার দিন ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতো। কেননা, রবিবার দিন খ্রিস্টযাগে পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরিহিত হয়ে গেলে মনের মধ্যে পবিত্র ভাবটাই প্রকাশ পেতো এবং যিশুকে গ্রহণ করতো। ভোরবেলায় মা-বাবারা গির্জায় যেতেন, দাদা-বউ-দিদিরা দ্বিতীয় মিশায় ও ছেলেমেয়েরা তৃতীয় বা শেষ মিশায় অংশগ্রহণ করতেন। সকলেই দূর-দূরান্ত গ্রাম হতে পায়ে হেঁটেই যেতেন। সারা সপ্তাহে জমিতে কৃষি কাজ করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্ট করার পরও স্বাভাবিক নিয়মে গির্জায় যেতেন। তখন রবিবারদিন প্রতিটি খ্রিস্টযাগেই খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে গির্জাঘর ভরে যেতো। ঐ সময়ে কোনদিন পাল পুরোহিতের মাধ্যমে শুনেছি কিনা যে, খ্রিস্টযাগে গির্জাঘর ভরে না কেন বা উপস্থিতি কম কেন?

আজ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে খুব সহজেই গির্জায় যাওয়া যায়। আমরা শিক্ষায়-দীক্ষায় অধিক জ্ঞানলাভ করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কর্মস্থানে বসে বসে কাজ করছি। অন্যদিকে আমরা করোনা থেকে মুক্তিও লাভ করেছি। এ সকল প্রাপ্তির পর আমাদের আরও বেশি বেশি প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো উচিৎ। করোনার সময়ে অনলাইনের মাধ্যমে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার ফলে এখন গির্জায় যেতে অনীহা; কর্মসূত্রে উপস্থিত হতে পারি না, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার চাপে যেতে পারি না-ইত্যাদি নানা যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে হয়তো এখন গির্জায় উপস্থিত হতে পারি না। কিন্তু সচেতনার সঙ্গে যদি একটু ভেবে দেখি এই যুক্তিগুলো বা যেকোন কারণেই হোক গির্জায় উপস্থিতি হতে পারি না সেগুলোর বিনিময়ের পরও ঈশ্বর আমাদের কতটা সুস্থ রেখেছেন, কতই-না ভালোবেসে যাচ্ছেন। তাই আসুন, আমরা সেদিনের বাস্তব স্বপ্নগুলো পুনরায় সফলভাবে বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি যেদিন আমরা আমাদের পরিবারের সকলে মিলে গির্জায় যাবো, যিশুকে গ্রহণ করবো। তখন দেখতে পাবো গির্জাঘরে খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে পূর্ণতা পেয়েছে এবং উপাসনায় আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে যাজকের মধ্যদিয়ে আমাদের বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা ঈশ্বর অবশ্যই শুনছেন॥ ❑

করোনা পরবর্তী শিক্ষাদানের হালচাল ও আমাদের করণীয়

জয়ন্তী লাভলী ডি'কস্তা

২০২০ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয়। করোনা ভাইরাসের সংক্রমন বাড়তে থাকলে ১৭ মার্চ থেকে সরকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন। নানা সময়ে লকডাউন দেওয়া হয়। অন্য সব কার্যক্রমের মতই শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। মাঝখানে ইন্টারনেট ভিত্তিক যে অনলাইন শিখন পক্রিয়া চালু ছিল তাও নানা প্রতিবন্ধকতায় খুব সফল হয়েছে এটা বলা যায় না। আসল কথা শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ নানাবিধ সমস্যার কারণে অনলাইন শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। দীর্ঘ ১৮ মাস পর করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে স্বল্প পরিসরে শ্রেণীকক্ষে ক্লাস, এ্যাসাইনমেন্ট, সিলেবাস সংক্ষিপ্তকরণ, অটোপাস বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার গতি সচল রাখতে চেষ্টা করা হয়। শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ সময় ধরে লেখাপড়া থেকে দূরে থাকে। এভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংকট তৈরি হয়।

আমি একজন শিক্ষিকা। আমার ২৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতা এবং করোনা পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করলে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখা দেবে। দীর্ঘ দেড় বছরের বেশি সময় ধরে সরাসরি শ্রেণীভিত্তিক লেখাপড়া/শিখন কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় শিক্ষার্থীদের মানসিক বা আবেগিক যেসব পরিবর্তন হয়েছে তার তীব্র প্রভাব পড়েছে তাদের আচরণে। আর এসব বিষয় বিবেচনা করেই সরকারী বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। যেমন- শিক্ষার্থীদের শারীরিক অথবা মানসিক কোনরকম শাস্তি প্রদান করা যাবে না। তাদের কোন অপমানজনক কথা বলা যাবে না। একটা সময় দেখা যেত পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন করলে সাসপেন্ড/এক্সফেল করা হতো কিন্তু বর্তমানে একই কারণে এসব শিক্ষার্থীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। কিছু অভিভাবক না বুঝে দায়ী করছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে বা প্রতিষ্ঠানকে। হায়রে মূল্যবোধ! করোনার পূর্বে এসেম্বলী/শ্রেণীকক্ষে প্রধান শিক্ষক অথবা শিক্ষক-মণ্ডলী দাঁড়ালেই যত সংখ্যক শিক্ষার্থী হোক না কেন সবাই নীরব হয়ে যেত কিন্তু বর্তমানে একই বিষয়ে শৃঙ্খলা রক্ষায় শিক্ষক মণ্ডলীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় তাদের অনুভূতি শক্তি যেন ভোতা হয়ে গেছে।

আমরা সবাই অবগত আছি যে করোনাকালীন সময়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে গতিশীল রাখার জন্য সরকার অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর সেই সুবাদেই শিক্ষার্থীদের হাতে চলে এসেছিল মোবাইল ফোন। কিন্তু করোনা পরবর্তী সময়ে আমরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেই ফোনটা তুলে নিতে ব্যর্থ হয়েছি। তা বলে মোবাইল ফোনের শুধু নেতিবাচক দিক আছে আমি সেটা বলবো না। অনেক শিক্ষার্থী করোনাকালীন সময়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তথ্যপ্রযুক্তির দ্বারা নিজেদের সমৃদ্ধ করেছে, সুযোগ পেয়েছে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ জুডিশিয়াল তথা বিসিএস পরীক্ষায়। অন্যদিকে অনেক শিক্ষার্থী মোবাইল ফোনের দাস হয়ে গেছে। পিতা-মাতাকে ব্লাকমেইল করে মোবাইল ব্যবহার করে, রাতের ঘুম নষ্ট করে মোবাইল ব্যবহার করে। এতে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পিতা-মাতা, শিক্ষকমণ্ডলী ও সহপাঠীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে। জড়িয়ে পড়ে নানা অনৈতিক কার্যকলাপে। তাদের চোখে লেখাপড়া শেখার সে আগ্রহ তা আর দেখা যায় না বরং তার পরিবর্তে চোখগুলো যেন বেশি পরিপক্ক হয়ে গেছে। অভিভাবকগণও তাদের কষ্টের কথা, ব্যর্থতার কথা সহভাগিতা করেন শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে। মোবাইল নামক যন্ত্রটি যেন অনেকের জন্যে যন্ত্রণার কারণ হয়ে গেছে।

আমরা জানি বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে শিশুরা সামাজিকতা শেখে। বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিবার থেকে আসা শিশুরা নিজেদের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেয়। কিন্তু করোনা পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম অসহিষ্ণুতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে। কারো কথা যেন কারো সহ্য হয় না, অল্পতেই তর্ক, বিবাদ, হুমকি, মারামারিসহ বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। গত ২২ মার্চ পটুয়াখালীর বাউফল স্কুলে সহপাঠীদের আঘাতে শিক্ষার্থীর মৃত্যুসহ শিক্ষকের মৃত্যু ও লাঞ্ছিত হবার ঘটনা মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের নজীর বহন করে। এছাড়াও কিশোর গ্যাং এর নানারকম অপরাধমূলক কাজের কথা আমাদের কারো অজানা নয়।

করোনাকালীন সময়ে দরিদ্র, নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়ের কারণে অনেক শিক্ষার্থীকে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক শিক্ষার্থী লেখাপড়া থেকে ঝড়ে পড়েছে। বিশেষভাবে চরাঞ্চল, হাওরাঞ্চলা, পাহাড়ী অঞ্চল, শহরের বস্তিবাসী ও গ্রামের কিছু পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, তাদের আর স্কুলগামী করা যায়নি। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনাকালে লম্বা সময় ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে পাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত বাংলাদেশে ৪ কোটির বেশি শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া কষ্টসাধ্য বিষয়। বিশ্ব ব্যংকের হিউম্যান ক্যাপিটাল ইনডেক্স ২০২০ এর একটি সমীক্ষা বলছে প্রাক-মহামারীকালে বাংলাদেশের একটি শিশু (৪-১৮) বয়সের মধ্যে স্কুল জীবন শেষ করে কিন্তু এই মহামারিকালে প্রতিটি শিশুর জীবন থেকে ২/৩টি বছর হারিয়ে গেছে। এ ক্ষতি কিভাবে পূরণ হবে সেটাই প্রশ্নবিদ্ধ।

শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের করণীয় হতে পারে:

শিক্ষক হিসেবে আমাদের করণীয়

ক) শিক্ষক হিসেবে শ্রেণীকক্ষে বন্ধু সুলভ ও স্নেহশীল আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

খ) শ্রেণীকক্ষে আনন্দদায়ক প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলার আয়োজন করে তাদের মধ্যে সৃষ্ট জড়তা কমানো যেতে পারে।

গ) স্কুলের রুটিনে মূল্যবোধের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঘ) অভিভাবক সম্মেলন করা যেতে পারে।

ঙ) শাসন/শাস্তি একদম তুলে না দিয়ে এর ধরন পাল্টানো যেতে পারে।

চ) নতুন শিক্ষাক্রম ২০২৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে যেখানে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক শিখনকালীন মূল্যায়নের বিষয়টি আচরণগত ও মেধাগত উভয় দিকের উন্নয়ন সম্ভব হবে।

ছ) ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করণে উপবৃত্তির ব্যবস্থা।

জ) স্থানীয় নেতা, ইমাম বা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

(২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

যে দশটি কারণে আপনার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না

সুমন কোড়াইয়া

বিগত বছরই বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছিল, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষটি হবে অর্থনৈতিকভাবে খুব কঠিন। আমেরিকার মতন দেশে ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। অনেকেই বেকার দিন পার করছেন। অনেকের আয়ের তুলনায় ব্যয় বাড়ছে। এই সব কারণ ছাড়াও অর্থনৈতিক শিক্ষাটা আমরা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব বেশি পাইনি। কীভবে আমরা আয় করবো সেই শিক্ষাটা যতটা পাই, কিভাবে ব্যয় করবো সেটা পাইনি। ফলস্বরূপ অনেকে বেশি আয় করলেও ব্যয় করার সঠিক শিক্ষাটা না পাওয়ার কারণে তারা অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন না বা সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারেন না। মোট কথা আমাদের আর্থিক সাক্ষরতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আর্থিক সাক্ষরতা হচ্ছে অর্থ বিষয়ে বুঝা, কভাবে আমি আয় করবো, সেই আয় থেকে কীভাবে সঞ্চয় করবো, ব্যয় করবো, বিনিয়োগ করবো, কতটুকু ঋণ করবো ইত্যাদি সঠিকভাবে করতে পারা। আর্থিক স্বাক্ষরতা না থাকার ফলে অনেকে পৈত্রিক সম্পদ ধরে রাখতে পারেন না। আবার অনেকে আর্থিক স্বাক্ষরতা সঠিক থাকায়– শূন্য থেকে শুরু করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেন।

অনেকে বলেন, যারা অর্থনৈতিকভাবে সম্পদশালী হন তারা দরিদ্রদের ঠকিয়ে বড়ো লোক হন। এই কথাটি ঠিক নয়। কেউ কেউ অন্যদের ঠকিয়ে ধনী হতে পারেন, তাদের সংখ্যা খুবই কম, তবে যারা আস্তে আস্তে নিজেদের মেধা, সততা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনেন, তাদের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হয়।

এক সময় বলা হতো পরিশ্রম করলেই সমৃদ্ধি আসে। আসলেই কী তাই? আমাদের পরিশ্রমের সাথে যোগ করতে হবে স্মার্টনেস, দক্ষতা, সৃজনশীলতা, আনুগত্য ও নম্রতা।

আমরা প্রত্যেকেই চাই আর্থিক উন্নতি। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা মতো সেই আর্থিক উন্নতি হয় না। অনেকে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেন। আসলে নিজেকে নিজে সাহায্য না করলে ঈশ্বরও তাকে সাহায্য করে না। চলুন দেখি আমাদের প্রত্যাশানুযায়ী আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ার পেছনের কারণগুলো কী?

১. আপনি সঞ্চয় করেন না: ছোট বেলায় শিখেছি, আয় করে যতটুকু প্রয়োজন, তার পর বাড়তি বা উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করবো। এটা একটু ভুল ধারণা। এই কারণে খুব সহসাই আমরা অর্থ সঞ্চয় করতে পারি না। আমাদের এমনটা হওয়া উচিত: আয় এর পর একটা অংশ সঞ্চয়। এরপর ব্যয়। তাহলে আমরা প্রতি মাসে একটা ভালো পরিমাণে সঞ্চয় করতে পারি কিন্তু আমরা প্রয়োজন ছাড়াও বিলাসী দ্রব্যাদি ক্রয় করি, সামনে যা পাই পকেট গরম থাকলে সেই টাকা উজার করি। এই কারণেই আমরা সঞ্চয় করতে পারি না। এখন থেকে যদি প্রয়োজন ছাড়া বিলাসী পণ্য ক্রয় না করি এবং সেটা সঞ্চয় করতে পারি তাহলে আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। সম্পদ বৃদ্ধি পেলে আপনি ক্রমে ধনী হবেন।

২। আর্থিক বিষয়ে অগ্রাধিকার ঠিক না করা: আমরা অনেক সময় আমাদের আর্থিক বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হই। ধরুন আপনার নিকট পঁঞ্চাশ হাজার টাকা রয়েছে। আপনার ঘরে পুরাতন সোফা সেট রয়েছে। তারপরও এই টাকা দিয়ে আপনি ঘরের জন্য নতুন একটা সোফা সেট কিনতে পারেন, অথবা সেই টাকা আপনি কোথাও বিনিয়োগ করে অর্থ আয় করতে পারেন। আমরা আমাদের জীবনে এমন অনেক ক্ষেত্রে অর্থ খরচ করি যেখান থেকে কোনো রিটার্ন আসে না। আপনার পুরনো সোফা দিয়ে হয়ত আপনি আরও দশ বছর চালিয়ে যেতে পারতেন কিন্তু সেটা না করে আপনি অর্থটা অনুৎপাদনশীল খাতে খরচ করলেন। অনুৎপাদনশীল খাত আরও রয়েছে যেমন ঘটা করে সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা, এমনকি আমরা অনেকে ঋণ করেও বিয়ে, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, জুবিলীর মতো অনুষ্ঠান করি। এগুলো করার জন্য ঋণ না করে যদি আগে থেকে পরিকল্পনা মাফিক অর্থ সঞ্চয় করা যায় তাহলে আর্থিক ব্যবস্থাপনাটা ঠিক থাকে। অন্যথায় অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থ খরচ করে নিজেদেরকে আমরা আরও পিছিয়ে রাখি।

৩। আপনি যা আয় করেন, তার চেয়ে বেশি ব্যয় করেন: এটা আমাদের অনেকের জীবনেই ঘটে। এর প্রধান কারণ হলো বুঝে শুনে অর্থ ব্যয় না করা। এখানে আবারও আসে সেই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বিলাসী পণ্য ক্রয় করা। আমাদের উচিত, আমরা যা আয় করি, তার চেয়ে কম পরিমাণে ব্যয় করা এবং সেখান থেকে বরং কিছু অর্থ সঞ্চয় করা। আয় অনুসারে ব্যয় করে যদি ভাবি অন্য কেউ এসে আমার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করবে সেটা মহা ভুল। আমাদের আর্থিক অবস্থা আমাদেরই পরিবর্তন করতে হবে। অন্য কেউ এসে আমাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করে দিবে না।

৪। আবাসনের জন্য অতিরিক্ত খরচ করায়: বাসস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম একটি। তবে আমরা অনেকে অন্যের দেখাদেখি প্রয়োজনের চেয়ে বা সামর্থ্যের চেয়ে বেশি পরিমাণে অর্থ খরচ করি আবাসনের জন্য। এর ফলে মাস শেষে অন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে কষ্ট হয়, ধার দেনা বাড়ে। পরিবার তথা আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের সাথে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্য থেকে সমাধানের জন্য অনেকে জমি বিক্রি করে তারপর রেহায় পান। তাই আমাদের উচিত, আমার যতটুকু সামর্থ আছে সেই হিসাব করে আবাসনের জন্য খরচ করা। গবেষণায় উল্লেখ আছে, আপনার আয়ের সর্বোচ্চ ৫০ ভাগ আপনি আবাসনের জন্য খরচ করতে পারেন। এর বেশি করলে আপনাকে এর মাসুল দিতে হবে দরিদ্র জীবন যাপন করে।

৫। আর্থিক উন্নতি না হওয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে বাজেট তৈরি না করা: আপনি আয় করছেন, কিন্তু এই টাকা কোথায় যাচ্ছে, কী প্রয়োজনে যাচ্ছে তা যদি খেয়াল না করেন তাহলে আপনার অর্থ আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি পড়ার মতো অর্থও বের হয়ে যাবে। আপনি অর্থ ধরে রাখতে পারবেন না। তাই প্রতি মাসে বাজেট করতে হবে। বাজেট অনুসারে অর্থ ব্যয় করার দক্ষতা ও সামর্থ ধীরে ধীরে অর্জন করতে হবে।

৬। জরুরি তহবিল না থাকা: জীবনে বিপদ বলে কয়ে আসে না। তবে সেটার জন্য আমাদের আগে থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সেটার প্রস্তুতি নিতে হবে। আর তাই গড়ে তুলতে হবে জরুরি তহবিল। প্রতিদিন এই খাতে একটা অংকের অর্থ আপনাকে সঞ্চিত করতে হবে যেন আপনি যদি বিপদে পড়েন তাহলে সেই অর্থ দিয়ে উদ্ধার পেতে পারেন। মানে দুর্ঘটনায় হাসপাতালে যেতে হলে অন্যের নিকট হাত না পেতে নিজের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে হাসপাতালের বিল পরিশোধ করতে পারার সামর্থ তৈরি করতে হবে। আপনার যদি একটি জরুরি তহবিল থাকে, তাহলে অসুস্থতায় আপনাকে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে হবে না বা অন্যের নিকট করুণার পাত্র হতে হবে না। সমাজে বাঁচতে পারবেন সম্মান নিয়ে।

৭। আপনি মাত্র একটি আয়ের ওপর নির্ভরশীল: কথায় আছে, এক পাত্রে সব ডিম না রাখা। আপনি নয়টা পাঁচটা ডিউটি করেন। এরপর বাসায় এসে টিভি দেখে সময় পার করেন বা বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করেন। আপনার চাকরি চলে গেলে এরপর কী করবেন সেটা চিন্তা করেছেন? তাই এক পাত্রে ডিম রাখলে যেমন সব নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি এক উৎস থেকে আয় করার ওপর নির্ভর করলে আপনি অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে থাকেন। আরেকটি উদাহরণ দেই। এখন বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। খরচ কমানোর জন্য এক শ্রেণির মানুষ আছেন তারা কম মূলের পণ্য কিনেন, আরেক শ্রেণির স্মার্ট মানুষ আছেন যারা অতিরিক্ত খরচের জন্য অতিরিক্ত আয় করার প্রচেষ্টা করেন। আপনি যদি প্রতিদিন তিন থেকে চার ঘন্টা বসে বসে সময় পার না করে দক্ষতা অর্জন করেন এবং সেই দক্ষতা দিয়ে আয় করেন তাহলে আপনাকে আর্থিক ঝুঁকিতে পড়তে হবে না। সব সময় প্লান এ, প্লান বি, প্লান সি রাখতে হবে যেন একটা কাজ না করলে আরেকটা দিয়ে আপনি সমস্যা থেকে সমাধানের পথ পেতে পারেন। এখন ইন্টারনেট আমাদের জন্য আশীর্বাদের। মূল আয়ের পাশাপাশি ঘরে বসে অন লাইনে ব্যবসা, ফ্রিল্যান্সিং, ক্ষুদ্র ব্যবসা, টিউশনিসহ বিভিন্ন উপায়ে সৎভাবে বাড়তি আয় করতে পারেন।

৮। নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন না করা: আপনি হয়ত একটা চাকরি করছেন বিগত বিশ বছর ধরে বা একটি ব্যবসাই করছেন বিগত কুড়ি বছর ধরে। আপনার শুরুতে যেমন আয় ছিল, বর্তমানেও ঠিক সেই পরিমাণে আয়। তার মানে আপনি নিজেকে আরও বেশি দক্ষ করেননি। আপনি যদি নিজের সফ্ট স্কিল যেমন উপস্থাপনা, শুদ্ধ ও সুন্দর করে কথা বলতে পারা, যোগাযোগ করতে পারা, ইংরেজীতে কথা বলতে পারা, বাংলা ও ইংরেজীতে শুদ্ধভাবে লেখা, কম্পিউটার পরিচালনা করতে না পারাসহ সফট স্কিলগুলো অর্জন করতে না পারেন এবং এর জন্য যদি আপনার বেতন খুব বেশি না বেড়ে থাকে তাহলে এর জন্য আপনিই দায়ী। মনে রাখতে হবে, প্রতিষ্ঠান আপনার সেবা বিক্রি করেই আপনার জন্য আয় করে এবং সেখান থেকে আপনাকে বেতন দেয়। তাই আপনি যত বেশি পড়াশোনা করবেন, দক্ষতা অর্জন করবেন এবং প্রতিষ্ঠানকে ভালো সেবা দিবেন, ততবেশি আপনার বেতন বা আপনার ব্যবসায় আয়-উন্নতি হবে।

৯। অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করা: আপনার বন্ধুর আয় আর আপনার আয় এক নাও হতে পারে। তিনি বছরে একাধিক বার দেশ বিদেশে ঘুরতে যেতেই পারেন তার সামর্থ অনুসারে। বা আপনার বান্ধবী বা প্রতিবেশি প্রতি মাসে একাধিক বার নতুন নতুন জামা কাপড় কিনতেই পারেন কিন্তু আপনি যদি তার সাথে তুলনা করে নিজের সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও তার মতন ঘুরতে যান বা কেনাকাটা করেন তাহলে কিন্তু আর্থিকভাবে আপনি নিজে পিছিয়ে পড়বেন। তাই খরচ করার ক্ষেত্রে অন্যদেরকে নিজেদের সাথে তুলনা করবেন না, করলে নিজের ক্ষতি নিজেই করবেন।

১০। পরিবারের সদস্যদের সাথে আর্থিক বিষয়ে সহভাগিতা করা: আমার মতে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে যেকোনো বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী, সন্তানদের এক সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পুরুষ সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারে স্বামী হয়ত একা আয় করেন বা স্বামী স্ত্রী দুই জনেই আয় করেন। অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে আর্থিক অবস্থা নিয়ে কথা বার্তা হয় না। সন্তান যা চায় পিতা-মাতা সেটা প্রয়োজন না হলেও দিয়ে থাকে। এমনকি কিশোর ছেলে সাইকেল, দামি মোবাইল বা মোটর সাইকেল চাইতেই পারে কিন্তু সেটা আপনার দেওয়ার সামর্থ নাই। এই কথাটি কিশোর সন্তান এবং স্ত্রীর সাথে আলোচনাও করেন না। ফলে যিনি চাচ্ছেন তিনি কিন্তু আপনার মনের কথাটি জানেন না। ধার দেনা করে আপনি হয়ত সন্তানের চাহিদা পূরণ করছেন। এতে আয়ের চেয়ে ব্যয় বাড়তে থাকে। তাই আপনার আয় ও কী পরিমাণে ব্যয় করতে হবে তা নিয়মিত পরিবারের সদস্যদের সাথে মন খুলে আলোচনা করুন। দেখবেন পরিবারের সদস্যরা কেউ অন্যায় আবদার করবে না। বরং আপনাকে সহযোগিতা করবে।

পরিশেষে আমি এটা বলবো, খ্রিস্টান সমাজের একটা ভালো বিষয় হলো আমরা প্রায় প্রত্যেকে এক বা একাধিক ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সমবায় সমিতির সদস্য। আমাদের সঞ্চয় করার অনেক উপায় আছে। অর্থনৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সেই সব সমবায় সমিতিগুলোতে চর্চা করতে পারি। সমবায় সমিতির কল্যাণে বেশির ভাগ মানুষ জীবনে সমৃদ্ধি আনছেন আর অল্প কিছু মানুষ যারা পারসোনাল ফ্যাইন্যান্স বা ব্যক্তিগত আর্থিক বিষয়ে দুর্বল তারা তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাই সমবায় সমিতিগুলোর উচিত তাদের সদস্যদের আর্থিক সাক্ষরতার বিষয়ে আরও বেশি প্রশিক্ষণ দেওয়া। যারা সমবায়ে নেতৃত্বে আসবেন তাদেরও আর্থিক সাক্ষরতার বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় দুর্বল হওয়ায় অনেকে জীবনে একটা সময় অনেক বেশি আয় করলেও এক সময় এমন একটা খারাপ অবস্থায় পৌঁছে যান যে সেখান থেকে তারা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেন না। তাই আসুন আমরা আর্থিক বিষয়ে আরও সচেতন হই, সচেতন করি॥ ❑

সহায়ক তথ্য: ইউটিউব

করোনা পরবর্তী শিক্ষাদানের ...

(২৩ পৃষ্ঠার পর)

অভিভাবক হিসেবে আমাদের করণীয়

ক) ধৈর্য ও আশা নিয়ে সন্তানদের পাশে থাকতে হবে এবং মনে রাখতে হবে আপনার আমার সকল কর্মযজ্ঞ সন্তানকে ঘিরে। তাই সন্তানকে সময় দিতে হবে।

খ) চোখ, কান খোলা রাখতে হবে। কাদের সঙ্গে মিশছে, প্রাইভেট কতক্ষণ, সন্ধার পর বাসায় থাকছে কিনা, নেশায় আসক্ত কি না, হাতে বেশি টাকা থাকে কি না, তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার করছে কি না।

গ) নিজে স্বপ্ন দেখবেন ও সন্তানদের স্বপ্ন দেখাবেন।

ঙ) সন্তানদের সামনে নিজেকে আদর্শ দেখাতে হবে।

চ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক মণ্ডলীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ স্থাপন।

ছ) বাসায় পড়ার পরিবেশ, সময় আছে কি না। সন্তানদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা।

শিক্ষার্থী হিসেবে তাদের করণীয়

ক) প্রতিনিয়ত গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যবসায়ের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হবে।

খ) কুসৎসর্গ ত্যাগ করতে হবে।

গ) উচ্চাকাঙ্খী হতে হবে। Target/Goal ঠিক করে এগুতে হবে।

ঘ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

ঙ) দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগোতে হবে। যাতে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারো।

আমাদের জন্য স্বস্তির কথা হলো সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরোদমে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চলছে। করোনাকালীন সময়ে আমরা আত্ম-উপলব্ধি ও আত্ম-শুদ্ধির সুযোগ পেয়েছি। বেঁচে নাও থাকতে পারতাম। বেঁচে আছি, স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে নিতে পারছি এজন্য সৃষ্টিকর্তাকে অশেষ ধন্যবাদ। সেইসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের বিনামূল্যে টিকাদান কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের জন্য সাধুবাদ জানাই। এখন আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সাঠিকভাবে পালন করি তবেই আমরা বাস্তবায়ন করতে পারবো আমাদের স্বপ্ন॥ ❑

তথ্যসূত্র:

১) দৈনিক ইত্তেফাক ও প্রতিদিনের সংবাদ

এসো হে বৈশাখ নবীনতায়

ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন

পুরাতনকে ভুলে নতুনকে বরণের লেনাদেনার পসরা নিয়ে আসে যেন প্রতীক্ষিত এই দিনটি। বাঙালি সংস্কৃতির সাথে নিবিড় ভাবে মিশে আছে এই পহেলা বৈশাখ, নূতন সাজে নতুন গানে প্রাণ যেন মাতিয়ে যায়। প্রতিবছর সময়ের আবর্তনে আসে পহেলা বৈশাখ। আজও পহেলা বৈশাখ মিশে আছে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে নাড়ীর বন্ধনের মত। প্রতিটি সংস্কৃতি-মনা মানুষের কাছে পহেলা বৈশাখ একটি গুরুত্ব নিয়ে হাজির হয়। নববর্ষের আনন্দক্ষণে সকল সম্প্রদায়-ধর্ম-বর্ণের মানুষের প্রাণে নতুন স্পন্দন জাগে, খুঁজে পায় নতুন করে বাঁচার প্রেরণা। নববর্ষের আহ্বান হচ্ছে সমস্ত শক্তি ও প্রাণ দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান। বৈশাখ আসে বারে বার যেন জাগিয়ে তোলে আমাদের সকলের প্রাণ। সকলকে জানিয়ে দেয় নতুন বছরের আগমনী বার্তা। আকাশ কাঁপিয়ে, ধুলো উড়িয়ে চেনা প্রকৃতিকে একেবারে নাজেহাল এবং পতিত করে দিয়ে বৈশাখ আসে। পহেলা বৈশাখের আবির্ভাব যেন আমাদের জীবনে এনে দেয় স্বস্তির নিঃশ্বাস।

নববর্ষের নতুন সূর্যের নতুন কিরণে বাংলা মায়ের প্রকৃতিতে লাগে নব দোলা, যে দোলায় দোলায়িত হয়ে বাংলা যেমন সাজে বিভিন্ন সাজে ও রূপে তেমনিভাবে একক সত্ত্বা হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে আছে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন পেশা ও ভিন্নতা। বাংলার কিছু পেশার মানুষের জীবন যাত্রা ও কাজেই প্রকাশ করে আমরা অনেক হয়েও এক জাতি সত্ত্বা। আর মানুষের এই সুন্দর অনুভূতিটুকু আবর্তিত হয় তার মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে। এই বিষয়গুলোর সাথে সংস্কৃতি ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই মানুষের জীবনে যতোগুলো অনুভূতি আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সুখকর, আনন্দময় ও সুন্দর অনুভূতি হল ভালবাসা-সম্প্রতি-শান্তির বন্ধনে জড়ানো এই বাঙালি জাতি। আর আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ, আনন্দমূখর ও অসাম্প্রদায়িক উৎসব হল-পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ।

বাংলা নববর্ষ হল বাঙালি জাতির প্রাণের উৎসব, আনন্দের উৎসব। এই দিনে প্রতিটি বাঙালি নিজস্ব সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পান্তা-ইলিশ খেয়ে থাকে। এদিনে ধনী-গরীব, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালী অত্যন্ত আনন্দ নিয়ে ও আয়েশের সাথে পান্তা ভাত খেয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, পৃথক জাতি স্বত্ত্বা হিসাবে গর্ববোধ করে।

এই দিনটিতে মনে হয় যেন ধনী ও গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; পান্তা আহারে সকল বাঙালীই যেন আজ একই আত্মার আত্মীয়। যদিও বা বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ও এই দুর্মূল্যের বাজারে ধনী শ্রেণী বছরের মাত্র একটি দিনই আয়েশের সাথে ও সখের বশে পান্তা-ইলিশ আহার করে, সেখানে গরীবেরা অর্থের অভাবে দৈনন্দিন জীবনে ক্ষুধা নিবারণে পান্তাভাত, পিয়াজ-লবণ-কাঁচা মরিচ দিয়ে তৃপ্তি সহকারে আহার করে ক্ষুধা নিবারণ করে থাকে। এছাড়া আজও গ্রাম-বাংলায় এ দিনকে কেন্দ্র করে বাঙালী জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে নানা ধরনের মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে শহুরে জীবনেও এর প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়।

পহেলা বৈশাখ ও নববর্ষ উপলক্ষে গ্রামে-গঞ্জে ও শহরের বিভিন্ন স্থান হয়ে উঠে অসাম্প্রদায়িক মিলন মেলার এক আনন্দযজ্ঞ। যাদের কথা ভেবে প্রজা কল্যাণকামী মহান সম্রাট আকবর বাংলা সনের সূচনা করেন, সেই গ্রামের কৃষক-কৃষাণীর ফসল সংগ্রহের সমাপ্তি লগ্নে এ উৎসব তাদের আনন্দকে আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলে। আর এ উৎসব আগামী দিনে তাদের চলার পথে দান করে অফুরন্ত ও নতুন প্রাণশক্তি। শুধু আহারেই নয়, পোশাক-পরিচ্ছদও প্রত্যেকের মধ্যে বাঙালিয়ানার পরিচয় প্রকাশ করে। আগের মতো এখন অবশ্য অনেক সংস্কৃতি গুলো দেখা যায় না। যেমন- যাত্রাপালা, পালাগান, জারিগান, লাঠি খেলাসহ আরও অনেক পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী খেলাধূলা।

এই দিনে সবাই বাঙালির সাজের প্রতিযোগিতায় নিজেকে একধাপ এগিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বাঙালি ছেলেরা পাজামা-কুর্তা বা ফতুয়া ও বাঙালি ললনারাও শাড়ীতে জড়িয়ে নিজেদের তুলে ধরে প্রকৃত বাঙালি রূপে। কেননা এ যে তাদের আসল পরিচিতি। প্রাণে আনে নতুন জোয়ার। কিন্তু আজ এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বর্তমান প্রজন্ম পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ও ঢংঙে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় হারাতে বসেছে। আমরা শুধুমাত্র বিশেষ কোন দিবসকে কেন্দ্র করে ও উপলক্ষ্য করে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে অপরের সামনে উপস্থাপন করি, অন্যদিকে সর্বদাই অপর বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ লালন করি আমাদের অন্তরে। শিকড়হীন কচুরিপানার মতো জীবন-যাপন না করে নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয়ে পরিচিত হয়ে অপরের সামনে নিজেকে ও নিজের সংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরতে আমরা যেন কুণ্ঠিত না হই।

আজও বৈশাখ আমাদের জীবনে নতুনের বার্তা নিয়ে আসে। পহেলা বৈশাখের উষ্ণ ছোঁয়া পুরাতন জরাজীর্ণতাকে ধুয়ে নতুন করে তোলে। ভুলে যেতে সাহায্য করে পুরাতন স্মৃতিময় দিনগুলিকে। প্রাণে আনে নতুনের আনন্দ। পাপময় অবস্থাকে পুণ্যের আবিরতায় ঢেকে ফেলে পহেলা বৈশাখ শূন্যতার মাঝে পূর্ণতা নিয়ে আসে। পুরাতন বছরের সব জড়তা দূর করে নতুন বছরের সজীবতায় শুভাগমন ঘটায় বৈশাখ। তাই গানের ভাষায় বলি,

এলো রে বৈশাখ নবীনতায়
বাঙালির প্রাণ আজ মাতিয়ে যায়

বৈশাখ হলো বর্তমানে অপ-সংস্কৃতি ও ধর্মীয় গোড়ামী থেকে বেড়িয়ে আসার আহ্বান। বিশ্বপিতার নিমন্ত্রণে বিশ্ব ভ্রমণে বাহির হওয়ার আহ্বান। নিজেকে জানার, বুঝার ও মূল্যায়ন করে সামনের দিকে দীপ্ত পদচারণায় এগিয়ে চলার আহ্বান। শুধু একদিনের জন্য পান্তা ভাতের বাঙালি না হয়ে আমরা যেন প্রতিদিনের জীবনের বৈশাখের সেই নতুনত্বে পরিবর্তন হবার চেতনায় সামনে পথ এগিয়ে চলি। তাই আমাদের এই প্রাণের অনুষ্ঠানকে ঘিরে অন্তরের গভীরে থেকে ধ্বনি হোক একই সুর-আমরা সবাই বাঙালি। পরম যত্ন ও ভালোবাসার নিয়ে রক্ষা করব আমাদের এই স্মৃতিবিজরিত ও গৌরবময় হাজার বছরের ঐতিহ্য॥ ❑

৯ম মৃত্যুবার্ষিকী

" তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ, তুমি নেই
তুমি আছ, মন বলে তাই "

প্রয়াত সিলভেস্টার গমেজ

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
গোপাল মাদ্দর বাড়ি
নতুন তুইতাল, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

প্রিয় পাপা/দাদা/নানু,

সময়টা খুব দ্রুতই বয়ে যাচ্ছে। আজ ৯ বছর পেরিয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। **Easter Sunday** আসার সময়টাতে তোমাকে একটু বেশিই মনে পড়ে যায়। এই সময়টাতেই তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছ।

তোমার জীবনে চলার পথে অক্লান্ত পরিশ্রম, নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা, নিয়মিত প্রার্থনা করা ও গির্জায় যাওয়া, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, সবই পথ দেখায় আমাদের জীবন চলার পথে।

আমরা প্রার্থনা করি, পরম করুণাময় তোমার জাগতিক সকল পাপ ক্ষমা করে স্বর্গধামে অধিষ্ঠিত করেছেন। তুমি তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যেন আমরা সকলে একত্রে থেকে ঈশ্বরের পথে জীবনে এগিয়ে যেতে পারি এবং অন্যের পাশে দাঁড়াতে পারি।

শোকাহত -

স্ত্রী: মনিকা গমেজ
বড় মেয়ে ও পরিবার: লিলি, প্রভাত, ব্লেস
ছোট মেয়ে ও পরিবার: বেবী, জন, গ্রেস, তীর্থ ও অর্ঘ্য
বড় ছেলে ও পরিবার: ডঃ জেমস, উপাসনা, ফ্র্যাঙ্কলিন
ছোট ছেলে ও পরিবার: রিচার্ড, সন্ধ্যা, ধ্রুব, সৃষ্টি

বিজ্ঞ/১১৮/২০২২

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল

ঢাকা আর্চডায়োসিসের একটি স্বাস্থ্য-সেবা প্রতিষ্ঠান

Hospital License No: HSM4320756
Hospital Reg. Code: HSM16585

অল্প খরচে অত্যাধুনিক মেশিনে ডায়ালিসিস

মাত্র তিন হাজার টাকায় আপনি পাচ্ছেন সর্বাধুনিক মেশিনে ডায়ালিসিসের সুবর্ণ সুযোগ। আপনার সাথে থাকছেন- দক্ষ-উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার নার্স-টেকনিশিয়ান। আপনার স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসনে পাবেন আইসিউ সাপোর্ট

মাত্র দুইশত টাকায় জরুরী ডাক্তার সেবা

আপনি ২৪ ঘন্টা পাচ্ছেন মাত্র দুইশত টাকায় জরুরী ডাক্তার সেবা
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারতো প্রয়োজন মত আপনাকে অল্প ভিজিটে সেবা দেবেনই

আপনাদের সেবায় আরও নিয়োজিত

* তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত ধূলা-বালিমুক্ত, সরাসরি প্রস্তুতকারী কোম্পানী থেকে সংগৃহিত ঔষধালয়
* বিখ্যাত সিআরপি ও সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত থেরাপিস্ট দ্বারা পরিচালিত ফিজিওথেরাপী বিভাগ
* বিশ্ববিখ্যাত মেশিনে ও মানসম্মত রিএজেন্ট ব্যবহৃত প্যাথলজি বিভাগ
* অত্যাধুনিক মেশিনে আলট্রাসনো ও এক্স-রে বিভাগ
* মানসম্মত যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা পরিচালিত অপারেশন থিয়েটার ও ডেন্টাল ইউনিট, সিজারিয়ানসহ সব ধরনের অপারেশনের সুব্যবস্থা

যোগাযোগ করুন:

৯ হলিক্রস কলেজ রোড, তেজকুনীপাড়া, ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০৯৬৭৮৬০০০০৬, ০৯৬৭৮৪১০০৪২, ০১৩০০৯৭৮৬১৯
Email: info@sjvhbd.com/Website: www.sjvhbd.com
Contact: 09678600006 / 09678410042 / 01300978619

বিজ্ঞ/১০৮/২০২৩

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

"মা তুমি এসেছিলে এ ধরণীতে
চলে গেছো ফিরে চির শান্তির নীড়ে
রেখে গেছো সুখ-দুঃখের স্মৃতিগুলো
যা আজও আমাদের অন্তরে।"

ও মা, দেখতে দেখতে বছর ঘুরে এলো সেই বেদনাবিধূর ৮ এপ্রিল। যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে শোকের সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে পিতার রাজ্যে।

মা, মনেই হয়না একটি বছর পার হয়ে গেলো। মনে হয় এইতো প্রতিটি কাজে তুমি আমাদের পাশে পাশেই আছো ও সবসময় আমাদের সাথে পথ চলো। তুমি যে আমাদের শক্তি, আমাদের প্রেরণা। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য আরও অনেক আশীর্বাদ করো যেনো আমরা তোমার আদর্শে পথ চলতে পারি। তোমার রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ ও স্মৃতি আমাদের জীবন চলার পথে পাথেও হয়ে থাকবে।

মা তোমার ভালোবাসা, আদর্শ, কঠোর পরিশ্রম সকলই আজ আমাদের জীবনকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করার জন্যে অনুপ্রেরণা যোগায়।

বিশ্বাস করি তুমি আছো আনন্দলোকে পরম পিতার সান্নিধ্যে। প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো মা, তোমার জীবনাদর্শে আমরা যেনো জীবনের বাকিটা পথ চলতে পারি এবং তোমার নাতী-নাতনীদের সুপথে পরিচালিত করতে পারি।

প্রয়াত ইউফ্রেজী মঞ্জু গমেজ
জন্ম: ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৮ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
রাহুৎহাটি, বাইন্তারবাড়ি
হাসনাবাদ ধর্মপল্লী।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

বড় মেয়ে ও মেয়ের জামাই	:	লিডিয়া ইমেল্ডা গমেজ ও ডেসমন্ড শ্যামল গমেজ
ছোট মেয়ে ও মেয়ের জামাই	:	রোজলীন স্মৃতি গমেজ ও অপু ডি'কস্তা
বড় ছেলে ও ছেলের বৌ	:	থিওটোনিয়াস তুষার গমেজ ও সঞ্চিতা গমেজ
ছোট ছেলে ও ছেলের বৌ	:	জন সুমন গমেজ ও প্রিয়াঙ্কা গমেজ
নাতী-নাতনীগণ	:	প্রিন্স কর্ণেলিয়াস গমেজ, অর্ণব ডি'কস্তা, লিওনি প্রিয়াঙ্কা গমেজ, অর্ভিল ডি'কস্তা, ভিনসেন্ট কাব্য গমেজ ইউফ্রেজী কথা গমেজ ও এ্যানেষ্টিন কার্লিন গমেজ।

বিজ্ঞ/১০৭/২০২৩

তোমাদের স্মরি

সুপ্রিয়ান রোজারিও

সিলভেস্টার রোজারিও

ড্যাঞ্জেল রোজারিও

ডানিয়েল কুলেন্তুনু

টাইনি রোজারিও

রেখা রোজারিও

উষা রাণী পালমা

"সত্যনিষ্ঠা বিনম্রতার আদর্শ করে দান
আত্মত্যাগের পরম ব্রতে হল তারা মহীয়ান
ভালোবাসার প্রতীক হয়ে রইল অনুক্ষণ।"

ঈশ্বরের অসীম দয়ায় ও ভালোবাসায় তোমরা এ পার্থিব জগৎ থেকে স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভ করেছ। তোমরা আজও আছ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা আদর্শ জীবন-যাপন করতে পারি এবং তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারি।

শোকার্ত চিত্তে
তোমাদেরই সংসার পরিজন
করান, নাগরী ধর্মপল্লী।

বিজ্ঞ/১১১/২০২৩

বিদেশে উচ্চশিক্ষা/ভর্তি/ভিসা প্রসেসিং

- USA, CANADA, AUSTRALIA, UK, JAPAN, SOUTH KOREA, MALTA, HUNGARY
- দক্ষিণ কোরিয়াতে ১০০% নিশ্চিত ভিসা।
- UK & AUSTRALIA - এর জন্য আমরা কোন সার্ভিস চার্জ নেই না।
- We also offer IELTS/Japanese/Korean Language Teaching Services.

CANADA USA AUSTRALIA UK Japan SOUTH KOREA MALTA

❋ খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।
❋ সুদীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ সফলতার সহিত সার্ভিস দিয়ে আসছি।

Global Village Academy
YOUR DREAM, OUR RESPONSIBILITY

Canada, USA & Europe এ ভিজিট ভিসা ও মাইগ্রেশন ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

আপনার স্বপ্ন পূরণে একান্ত সহযোগী
যোগাযোগ করুন:
+88 01600-369521
+88 01911-052103
/globalvillagebd.com
House-11 (2nd Floor), Road-2/E Block-J, Baridhara, Dhaka-1212 Bangladesh

বিজ্ঞ/১১২/২০২৩

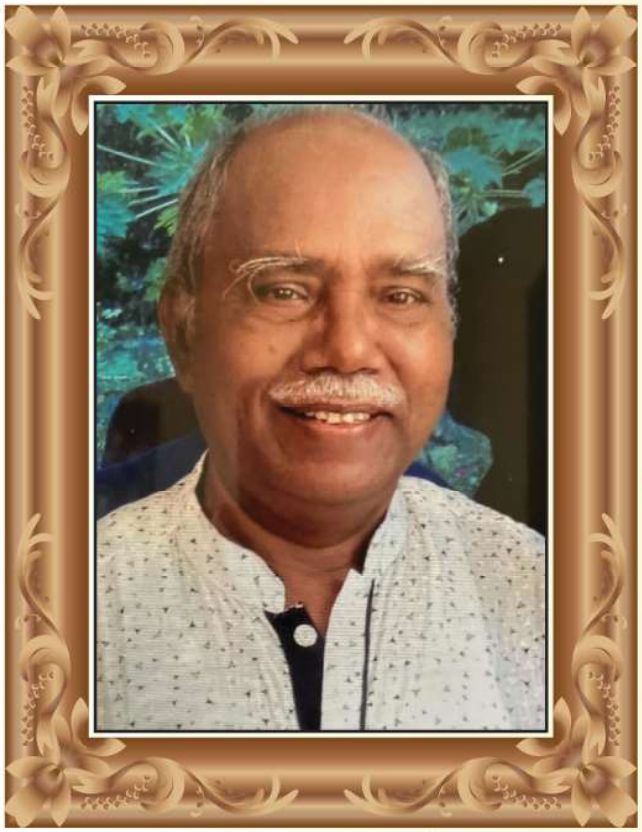

বাবা/দাদু আমরা তোমায় অনেক অনেক ভালবাসি

প্রয়াত আলফন্স রোজারিও

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া মিশন, ছোট সাতানীপাড়া
মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
(ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা)
গ্রাম: কুচিলাবাড়ি
মঠবাড়ি মিশন, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

দেখতে-দেখতে দুই বছর ছয় মাস চলে গেল, ফিরে এলো পাস্কা। এতো তাড়াতাড়ি তুমি আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে, তা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তেমন কোন অসুস্থতার লক্ষণও তোমার মধ্যে আগে থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরেও কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে- সব মিলিয়ে প্রায় এক মাসের মধ্যেই একজন জলজ্যান্ত মানুষ থেকে শুধুই ছবি হয়ে গেলে সবার কাছে। অনন্তের অসীম নীলিমায় হারিয়ে গেলে তুমি – আর কোনদিন তোমায় দেখতেও পাবো না, এই নশ্বর পৃথিবীতে। তোমাকে ছাড়া আমাদের কোন কিছুই আর পরিপূর্ণতা পায় না। কোন পার্বণ বা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান, কোন কিছুতেই না। একটা অপূরণীয় শূন্যতায় নিমগ্ন থাকে সবাই। খেতে গেলে ও সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় তোমার চেয়ারখানা খালি পড়ে থাকে। রাতে ঘরে ফিরতে দেরী হলে – আর তোমার কল বেজে ওঠে না। কেউ আর আদরমাখা গলায় বলে না "দেরী করতেছো কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে খেয়ে বিশ্রাম করো।" আবার বাড়ি ফিরলে তোমার স্নেহমাখা স্নিগ্ধ হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যেতো – সব কালিমা দূর হয়ে যেতো। এখন সেইসব কিছুই একটা ছবিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় শত কষ্টের মধ্যেও কোনদিন বলো নাই- কষ্টের কথা। "কেমন আছো" - জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে "আমি তো ভালই আছি।" শৈশবে মাকে হারিয়ে তুমি বেড়ে উঠেছিলে সীমাহীন অনাদরে – মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে। জীবনযুদ্ধে তুমি কখনও পিছু পা হওনি - ছোটবেলা হতে অধ্যবসায়ের দ্বারা কিভাবে বড় হওয়া যায় ও জীবনে উন্নতি করা যায় - তা তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছ। অলসতা তুমি মোটেও পছন্দ করতে না। তুমি ছিলে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী। সময়ের কাজ সময়ে ও নিজের কাজ নিজে করতে তুমি উৎসাহিত করতে সবাইকে। মা মারীয়ার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি ছিলো। রোজই রোজারীমালা হাতে করে হাঁটতে বেরোতে এবং সন্ধ্যায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত রোজারীমালা প্রার্থনা করতে - নিয়মিত গির্জায় যেতে খ্রিস্টযাগ শুনতে।

তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমার আদর্শে চলতে পারি এবং ঈশ্বরের পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের বাবা / দাদু-কে স্বর্গে অনন্ত শান্তি দান করুন।

সবার প্রতি রইলো পাস্কা ও বাংলা নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

তোমার সহধর্মিনী
সিসিলিয়া রোজারিও

তোমার স্নেহধন্য –
পুত্র ও পুত্রবধূগণ এবং একমাত্র কন্যা ও জামাতা

তোমার অনেক আদরের নাতি-নাতনিরা –
ঐশী ও ইভান্স, যাকোব, অর্থী, অন্তী, অহনা, প্রাপ্তি, কৃপা, অথৈ, অবনী, রাফেল, মার্সিয়া ও স্যাম।

বিজ্ঞ/১১০/২০২৩

বাংলা নববর্ষ, নব রবির কিরণ

জ্যাষ্টিন গোমেজ

ছবি: ইন্টারনেট

প্রারম্ভিক : বাংলার ঐতিহ্যকে যে সকল উৎসব অনুষ্ঠান ধারণ করে আছে সে গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলা নববর্ষ তথা পহেলা বৈশাখ। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাঙালিরা পহেলা বৈশাখকে নববর্ষ হিসেবে পালন করে আসছে। নববর্ষ বাঙালির সহস্র বৎসরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, প্রর্থনা, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য পহেলা বৈশাখ বাঙালিদের কাছে একটি প্রাণের উৎসব। বাঙালিরা এই দিনে পুরানো বছরের ব্যর্থতা, ব্যথা, নৈরাশ্য, গ্লানি ভুলে গিয়ে নতুন বছরকে মহানন্দে বরণ করে নেয়, সমৃদ্ধি ও সুখময় জীবনের প্রত্যাশায়। এই দিনকে বলা হয় বাঙালির জীবনের নব রবির কিরণ। দিনটিতে বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে যেমন পশ্চিমবঙ্গে, আসাম, উড়িষ্যা, মনিপুর ও ত্রিপুরায় মহাসমারোহে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। নববর্ষ বাংলা নতুন বছরের সূচনার নিমিত্তে বাঙ্গালিরা পালন করে থাকে, কিন্তু বর্তমানে তা সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। এখন দেশের বাইরেও অনেক জায়গায় প্রবাসী বাঙালিদের জন্য নববর্ষের দিন বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তবে অতীতে নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ 'ঋতুধর্মী উৎসব' হিসেবে পালিত হত। তখন এর মূল তাৎপর্য ছিল কৃষিকাজ। নববর্ষের প্রথম দিন বদলে যায় ঢাকা, বদলে যায় দেশ। শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলায় বর্ণবহুল হয়ে ওঠে। কাক-ডাকা ভোর থেকেই বাঙালি সংস্কৃতি লালনকারী আনন্দ-পিয়াসীরা পথে নামে। কায়মনে বাঙালি হয়ে ওঠার বাসনা জেগে ওঠে সবার মনে। বর্ণাঢ্য উৎসবের রঙে রেঙে ওঠার দিনটি প্রাণে প্রাণে প্রবাহ জোগায়।

ইতিকথা: ঐতিহাসিকদের মতে ৭ম শতাব্দীতে গৌড় বঙ্গের প্রথম সার্বভৌম রাজা শশাঙ্ক বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন। আর এখান থেকেই বাংলা বর্ষপঞ্জির সূচনা হয়। আবার কারো কারো মতে মোগল সম্রাট আকবরের হিজরি সাল হিসাবে ভারতবর্ষে ফসলের কর আদায়ের অসুবিধে হত, আসলে হিজরি সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষি ফলনের সাথে মিলত না এতে অসময়ে কৃষকদেরকে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করতে হত। তাই তিনি খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে রাজকীয় জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌর সন এবং আরবি হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম চালু করেন।

বাংলা নববর্ষকে নিয়ে পৌরাণিক বৈশাখ নামক নানা বিবৃতও রয়েছে। হিন্দু পুরাণে বৈশাখ নিয়ে নানা তথ্য বিবৃত রয়েছে। যা বৈশাখের অতীতস্বরূপ বোঝাতে গবেষকরা উল্লেখ করে থাকেন। লোক-গবেষক আতোয়ার রহমান 'বৈশাখ' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'বৈশাখ তার নামের জন্য বৈশাখ নক্ষত্রের কাছে ঋণী। পুরাণের মতে বিশাখা চন্দ্রের সপ্তবিংশ পত্নীর অন্যতম এবং জ্যোর্তিবিজ্ঞানের মতে কেবল নক্ষত্র। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্যের অবস্থানের সাথে বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থানের সম্পর্ক দেখে মাস ভাগ এবং মাসগুলির নামকরণ করেছিলেন। বিশাখা উষ্ণতার সূচক।' সঙ্গত কারণে বৈশাখের সঙ্গে যে 'উষ্ণতা' বা 'খরতাপ'- এর সামঞ্জস্য রয়েছে তা বলা বাহুল্য। বৈশাখের স্বরূপ বিশ্লেষণে এই দিকটির গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। কবি কালিদাস তার 'ঋতু সংহার'-এ বৈশাখ তথা গ্রীষ্ম ঋতুর সূচনা নিয়ে অবিস্মরণীয় কবিতা রচনা করেছেন।

তবে বাংলা নববর্ষ যেভাবেই আসুক না কেন এখন তা বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে। তাই পহেলা বৈশাখ এলেই সব বাঙালির প্রাণ বাংলা নববর্ষ বরণের আনন্দে আপনা আপনিই নেচে ওঠে। পহেলা বৈশাখ তাই পালিত হয় ব্যক্তিগত, ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক, শ্রেণিগত অবস্থানের উর্ধ্বে উঠে 'মানুষ মানুষের জন্য- এই বিশ্বাসকে সমাজ জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

বৈশাখী ভাবনা: আমাদের দেশের মতো বিশ্বের নানা দেশে বর্ষবরণের রেওয়াজ প্রচলিত আছে। তবে বিবর্তনের ধারায় আমাদের দেশের সংস্কৃতি মিশ্র-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হলেও বাঙালির নিজস্বতা একেবারে বিলীন হয়নি। দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিশেল ঘটেছে মাত্র। তবে বৈশাখ বা নববর্ষ পালনের যে চাকচিক্য তাতে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির মিল খুঁজে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাশ্চাত্যের বর্ষবরণের আদলে আমাদের দেশেও বর্তমানে কার্ডের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, সংগীত-নৃত্যের মাধ্যমে প্রাণে গতি সঞ্চার এবং সর্বশেষ ফোন সংস্কৃতির মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ এ ক্ষেত্রে নবতর ধারার সূচনা করেছে।

বৈশাখের পৌরাণিক দিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, 'মাস হিসেবে বৈশাখের একটা স্বতন্ত্র পরিচয় আছে, যা প্রকৃতিতে ও মানবজীবনে প্রত্যক্ষ করা যায়। খররৌদ্র, দাবদাহ, ধূ-ধূ মাঠ,

জলাভাব, কালবৈশাখীর ঝড়, ঝরাপাতা, গাছে গাছে নতুন পাতার আবির্ভাব, আমের মুকুল ইত্যাদি প্রকৃতি-পরিবেশের রূপ-রূপান্তরের সঙ্গে বাংলার মানুষের মন-প্রাণ-আত্মার যোগ আছে।' ফলে তৎকালীন সমাজে বৈশাখের প্রথম দিনটির জন্য কৃষিজীবীদের অন্যরকম অপেক্ষা কাজ করতো। এই দিনটি আসার আগেই ঘর-বাড়ি পরিচ্ছন্ন করা, ব্যবহৃত তৈজসপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবসা ক্ষেত্র ধোয়া মোছা করা হতো। এ কাজগুলোর মধ্যে সামাজিক সফলতা নিহিত থাকতো। গোটা বছরটি ভালোভাবে অতিবাহিত হওয়ার বিশ্বাস থেকে প্রতিটি পরিবার এ দিনটিকে যথাসাধ্য আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করতো। সৌভাগ্যের সূচক-বড়োসড়ো মাছ, মিষ্টির হাড়ি আসতো ঘরে। গতদিন অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির দিনে তৈলবিহীন নিরামিষ ব্যঞ্জন রান্না করার রীতি ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের। পরদিন সমারোহে মাছ খাওয়ার সঙ্গতি বাঁচিয়ে রাখার কথা বিবেচনা করেই।

বাঙালির চিরায়ত ঐতিহ্য নববর্ষঃ পহেলা বৈশাখ, যার সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির ঐতিহ্য। নববর্ষকে ঘিরে সবার থাকে নানা স্বপ্ন আর বাহারি পরিকল্পনা। নতুন বছরের প্রথম সূর্যোদয়ে রঙিন ও বর্ণিল হয়ে বাঙালি বরণ করে নেয় নতুন বছরকে। তারই প্রস্তুতি চলছে বাংলার সর্বত্র। নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ, বৈশাখী মেলা এগুলো যেন বাঙালি ঐতিহ্যের একই সুতায় গাঁথা সংস্কৃতি। বাঙালির এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ঐতিহাসিক শিকড় আমরা মোগল আমল থেকেই পেয়েছি। কৃষক শ্রেণির সেই ফসলি সন এখন বাঙালি সংস্কৃতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। কৃষকরা পহেলা বৈশাখের আগে তাদের সব হিসাব চুকিয়ে পুরনো বছরের সব গ্লানিকে মুছে ফেলে নব উদ্যমে বছরটি শুরু করতে সদা তৎপর থাকত। সব ধরনের ব্যবসায়িক মালিক শ্রেণি এবং ভোক্তাশ্রেণির মধ্যে লেনদেনের সমাপ্তি টানা হতো পহেলা বৈশাখের আগেই। আর পহেলা বৈশাখে হালখাতার মাধ্যমে নতুনভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়। বঙ্গাব্দের আগমনে বাঙালি আনন্দের জোয়ারে ভাসে। রমনার বটমূল বৈশাখী আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপ নেয়। কিন্তু এই বৈশাখীর রঙ লাগে গোটা দেশে, গোটা বিশ্বের আনাচে-কানাচে যেখানে বাঙালি বসত করে। নববর্ষের রঙের ঢেউ তাই এখনও বিশ্বের আনাচে-কানাচে খেলা করছে। আজও দেশ-বিদেশে যেখানে বাঙালি আছে সেখানে এই চিরায়ত রূপ ধারণ করছে আর বিশ্বব্যাপী জানান দিচ্ছে এক অনন্য নববর্ষ পালনের সংস্কৃতি চর্চার রীতি। আবহমান বাংলার চিরায়ত অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনার মূলে রয়েছে বাংলা নববর্ষ তথা পহেলা বৈশাখ। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বাংলা বর্ষ-বিদায় ও বরণের অনুষ্ঠানমালা সেই ঐতিহাসিক চেতনাকে প্রজ্বলন করে। স্বদেশ মানস রচনায় বাঙালি সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য সর্বোপরি ইতিহাসের আলোকে রক্ষণশীল ও পশ্চাৎপদ চিন্তা-চেতনাকে পরিহার করে আধুনিক জাতিসত্তাকে যথাযথ প্রতিভাতকরার সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি বাংলা নববর্ষকে দান করেছে অনবদ্য মাঙ্গলিক যাত্রাপথ। তবে বাঙালির নববর্ষ সব বাঙালির কাছে একভাবে আসেনি। কারো কাছে এসেছে খরা হয়ে, কারো কাছে খাজনা দেওয়ার সময় হিসেবে, কারো কাছে বকেয়া আদায়ের হালখাতা হিসেবে, কারো কাছে মহাজনের সুদরূপে আবার কারো কাছে এসেছে উৎসব হিসেবে।

নববর্ষের মঙ্গল শোভাযাত্রা ও বিশ্ব ঐতিহ্যঃ পুরনো বছরকে বিদায় জানিয়ে বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে ও মঙ্গল কামনায় শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রধান শোভাযাত্রাটি বের হয়। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়। মঙ্গল শোভাযাত্রায় তুলে ধরা হয় বাঙালি সংস্কৃতির নানা দিক। ফুটিয়ে তোলা হয় চিত্র, মুখোশ আর নানা প্রতীকে। প্রতি বছরই এই মঙ্গল শোভাযাত্রার একটি মূলভাব থাকে। সেই মূলভাব প্রতিবাদ এবং দ্রোহের। সেখানে অশুভের বিনাশ কামনা করা হয়। আহ্বান করা হয় সত্য এবং সুন্দরের।

বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আবেদন-ক্রমে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' জাতিসংঘের সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান লাভ করে। ইউনেস্কো মঙ্গল শোভাযাত্রাকে তাদের 'রিপ্রেজেনটেটিভ লিস্ট অব ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি'র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর ফলে পহেলা বৈশাখে মঙ্গল শোভাযাত্রায় যোগ হয়েছে এক নতুন মাত্রা। এখন এটি বিশ্ব সংস্কৃতির অংশ। বাঙালি সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী। ইউনেস্কো মঙ্গল শোভাযাত্রাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে, এটা শুধু একটা সম্প্রদায় বিশেষের নয়, এটা গোটা দেশের মানুষের, সারা পৃথিবীর মানুষের।

শেষের কথা : গ্রীষ্মের এই তাপস নিশ্বাস বায়ে পুরোনো বছরের সব নিস্ফল সঞ্চয় নিয়ে যায়, দূরে যায়, দূর-দিগন্তে মিলায়। বর্ষ বরণের উৎসবের আমেজে মুখরিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। গ্রীষ্মের অগ্নিজিহ্বা হয়তো বাতাসে লকলক করে উঠবে গেয়ে। উগড়ে দেবে বাংলার ভূ-প্রকৃতিতে অগ্নিবরণ নাগ-নাগিনীপুঞ্জ ও তাদের সঞ্চিত বিষ। তারপরও বাঙালি এই খরতাপ উপেক্ষা করে মিলিত হয় তার সর্বজনীন অসাম্প্রদায়িক উৎসবে। দেশের প্রতিটি পথে-ঘাটে, মাঠে-মেলায় অনুষ্ঠান জুড়ে থাকে কোটি মানুষের প্রাণের চাঞ্চল্য, আর উৎসবমুখরতার বিহ্বলতা। কারণ বৈশাখ মানেই বাঙালির আনন্দের দিন।

বাংলা নববর্ষে মহামিলনের এ আনন্দ উৎসবই বাঙালিকে ধর্মান্ধ অপশক্তির কূট ষড়যন্ত্রের জাল ভেদ করার আর কুসংস্কার ও কূপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুপ্রেরণা দেয়। সেই সঙ্গে করে ঐক্যবদ্ধ। নতুন বছর মানেই এক নতুন সম্ভাবনা, নতুন আশায় পথ চলা। তাই তো বৈশাখ কেবল আনন্দের নয়, প্রতিবাদেরও মাস। বৈশাখ অপশক্তিকে রুখে দাঁড়াবার শক্তি জোগায়। তাই বাংলা নববর্ষ যেন সব কিছুর নিরাপত্তা বিধান করে বাংলাদেশকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। এটাই হোক এবারের প্রত্যাশা। আশা করি এবার আবার স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ লাভ করবে বাঙালি। নববর্ষ তার জীবন থেকে ভয়, দুশ্চিন্তা, অপমান মুছে দেবে। তাকে আবার জাগিয়ে তুলবে নতুন ভাবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে নববর্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ও সাংস্কৃতিক সৌধের ভিত আরও সুদৃঢ় করুক, নববর্ষের উদার আলোয় ও মঙ্গলবার্তায় জাতির ভাগ্যাকাশের সব অন্ধকার দূরীভূত হোক, সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গিবাদী অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটুক, একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক, এটাই হোক এবারের বাংলা নববর্ষ-এর প্রত্যয়। সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

- বাংলা নববর্ষের প্রবর্তক শশাঙ্ক নাকি আকবর, জেনে নেই ইতিহাস- রাই কিশোরী- দ্যা নিউজ
- বৈশাখ, প্রবন্ধঃ আতোয়ার রহমান
- বাংলাপিডিয়া; হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, গোলাম মুরশিদ॥ ❑

উপাসনায় উপস্থিতি কম

সাগর এস কোড়াইয়া

আমি নিজেকে আজ প্রশ্ন করি "আমি কি আগের মতো প্রার্থনা করি? আমি কি পূর্বের মতোই উপাসনায় যাই অথবা পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি? প্রভু যিশুকে রুটির আকারে হৃদয়ে স্থান দিই? অথবা আমার সন্তানকে ধর্মীয় ভাবধারায় মাণ্ডলিক সঠিক শিক্ষায় শিক্ষা দিচ্ছি?"-প্রশ্নগুলো পড়ামাত্রই উত্তরগুলো সঙ্গে সঙ্গে আমার আপনার বিবেকে হয়তো উঁকি দিয়ে জেগে উঠছে- তাই না! সহজ প্রশ্নের উত্তরগুলোও সহজই হবে নিজেদের কাছে। কেননা, আমি নিজেই তো উপলব্ধি করতে পারছি বর্তমান সময়ে মাণ্ডলিক ভাবধারায় কতটুকু ধর্মীয় অনুশাসন আমি/আপনি মেনে চলছি বা সক্রিয় অংশগ্রহণ করছি।

বিশ্ব আজ একটা কঠিন সময়ের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে- আমরা এখন এই কথাগুলো প্রায়শই শুনতে পাই। বর্তমান বাস্তবতায় সত্যিই কথাটির যথার্থতা পরিলক্ষিত হতে দেখছি আমরা। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে এমনিতেই বিধ্বস্ত বিশ্বের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন। উপরন্ত ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে ও দেশের জনগণের ওপর দুর্বিসহ প্রভাব বিস্তার করেছে। করোনাকালে বিশ্বের অবস্থা যখন স্থবির, জনমানুষ যখন তাদের স্বাভাবিক চলাচলে বিধিনিষেধের বেড়াজালে আটকে গিয়েছে; তখন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন স্বাভাবিকভাবেই একটা সংকটে পতিত হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে মানুষ তার ধর্মীয় অনুশাসন পালনে কেউ গির্জায়, কেউ মসজিদে, কেউ-বা মন্দিরে, প্যাগোডায় উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তা আমরা সকলেই উপলব্ধি করেছি। বিশ্বের এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীর গুরুজনেরা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল অনলাইনের মাধ্যমে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করবার। আমরা সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ অনলাইনে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করবার সুযোগকে সাদরে গ্রহণ করেছিলাম এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যদিও বাহ্যিকভাবে প্রভু যিশুকে রুটির আকারে আমরা গ্রহণ করার সুযোগ পাইনি। কিন্তু মণ্ডলী আমাদের এ বিষয়ে একটি সুন্দর নির্দেশনার মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাসকে জাগিয়ে রেখেছিলেন। আমরা আজ এ সময়ে এসে আমাদের মণ্ডলীর গুরুজনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, ধন্যবাদ জানাই।

আমরা করোনাকালীন সময়ে করোনার প্রাদুর্ভাব থেকে নিজেকে ও বিশ্বের সকল মানুষের রক্ষার জন্যে যেভাবে প্রতিটি পরিবারে প্রার্থনার পরিবেশ তৈরী করে নিয়েছিলাম-তা সত্যিই এক অন্যরকম পবিত্র অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে মা-বাবা, ঠাকুরমা-দিদি-দাদাদের সঙ্গে সন্ধ্যায় যে প্রার্থনা করতাম সেটা আজও যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান রূপে রক্ষা করতে পেরেছি। আমরা শহরে, গ্রামে যে যেখানেই বসবাস করেছি সেখানে বসেই করোনা থেকে নিষ্কৃতি পেতে প্রচুর প্রার্থনা, অনুশোচনা, দান ইত্যাদি করেছি। এ সময়টাতে সবারই ঘরের আলতার হয়ে উঠেছিল পরিচ্ছন্ন। পবিত্র বাইবেলের ওপর ধুলোর প্রলেপ মুছে বাইবেল হয়ে উঠেছিল পুত পবিত্র আর ঈশ্বরের বাণী ছিল প্রতিদিনের উচ্চারণে। প্রজ্জ্বলিত মোমবাতির শিখায় ঘর হয়ে উঠেছিল নির্মল আলোয় আলোকিত। কারও কারও প্রার্থনার পরিবেশে হয়তো জ্বেলেছিল সুগন্ধময় আগর। গীতাবলীর গান ও ভক্তিপুষ্পের প্রার্থনাগুলো হয়ে উঠেছিল জীবন্ত। আজ করোনা অনেকাংশে মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মেধার পরিশ্রমের ফলে ও ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় আবিষ্কৃত হয়েছে করোনা টিকা। এই টিকা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে আমরাও গ্রহণ করেছি নিজেকে সুস্থ রাখার প্রত্যয়ে। করোনায় আক্রান্ত হয়ে আমাদের বহু পরিবারের স্বজনের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু কত যে বেদনা ও শোকময় তা শুধু ভুক্তভোগী পরিবারই অনুধাবন করেননি; সহমর্মিতা প্রকাশে সকলেই এগিয়ে এসেছিলেন। কেননা, বেশির ভাগ মৃত্যুগুলো হয়েছিল শিশু থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীর মানুষের এবং বেশির ভাগ মানুষই ছিল করোনার পূর্বে সুস্থ স্বাভাবিক।

আজ এ সময়ে এসে নিজেকে প্রশ্ন করি- আমার/আপনার পরিবারে করোনাকালীণ সময়ে যে প্রার্থনার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলাম তা কী অব্যাহত রাখতে পেরেছি? অথবা এ সময়ে নিয়ন্ত্রিত করোনার পর আমি বা আমরা রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি? আজ বর্তমান বাস্তবতার নিরীখে বলা হচ্ছে আমরা এখন পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করছি তা সংখ্যায় কম। গির্জাঘরগুলো এখন পূর্ণতা পাচ্ছে না খ্রিস্টভক্তদের অনুপস্থিতিতে। করোনার পর এমনটা প্রভাব পরবে হয়তো তেমন কেউ অনুধাবন করেননি। এমনকি আমি যে নিজেই খ্রিস্টযাগে যাচ্ছি না তা নিয়ে নিজের বিবেকের কাছে এবং ঈশ্বরের নিকট একজন পাপী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকছি তা উপলব্ধি করছি না। বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভস্ম বুধবার ও দুই নভেম্বর মৃতলোকের স্মরণ দিবসেই শুধু পবিত্র খ্রিস্টযাগে ভরপুর অংশগ্রহণ। পরিপ্রেক্ষিতে শুনতে পাই বছরের আর বাকি রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে আমরা কোথায় যাই? আমরা কী শুধু দুটি স্মরণ দিবসেই খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণে বিশ্বাসী? তবে, বড়দিন ও পুনরুত্থান পর্বের সময়ে গির্জায় আমাদের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই বেশি হয়। কেননা, এ সময়টি সারাবিশ্বের সঙ্গে আমাদেরও উৎসবটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করতে হয়। কথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, ইদানীং দেশের বৃহৎ কয়েকটি গির্জায় রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের সংখ্যা কমে গিয়েছে। অর্থাৎ যেখানে পূর্বে রবিবারদিন তিনটি অথবা পাঁচটি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হতো সেখানে এখন সকালে দু'টি ও অন্যটিতে সকাল ও বিকাল মিলিয়ে চারটি পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হচ্ছে। অথচ একটি সময় এ সকল গির্জাগুলোতেই ছিল প্রতিটি খ্রিস্টযাগে ভরপুর

(২২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

রাগ ছাড়ি, কথা শুনি, একসাথে পথ চলি

ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও

আজকের দ্রুত গতির এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে, অন্যের কথা এবং একসাথে চলার গুরুত্ব ভুলে যাওয়া সহজ। সাফল্য অর্জন এবং আমাদের লক্ষ্যগুলি অর্জন করার জন্য আমরা প্রয়শই আমাদের নিজস্ব মতামত এবং ধারণাগুলির উপর এত বেশি মনোযোগী হই যে আমরা অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করতে ভুলে যাই। যাইহোক, সত্যিকারের সাফল্য আসে অন্যদের সাথে সহযোগিতা করা এবং সুন্দর একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার মাধ্যমে যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুন্দর বিশ্ব বিনির্মাণে আমাদের সবার অন্যতম চাহিদা।

বস্তবিক অর্থে, কার্যকর যোগাযোগ এবং পারস্পারিক সহভাগিতার অন্যতম উপাদান হলো অন্যদের কথা শোনা। যখন আমরা অন্যদের কথা শুনি, তখন আমরা তাদের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ভাবনা এবং ধারণাগুলির অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করি। এটি আমাদের মধ্যে সহানুভূতি এবং সুন্দর বোঝাপড়া তৈরি করে, আমাদের মধ্যকার সম্পর্ককে দৃঢ় করে। তাছাড়াও অন্যদের কথা শোনা মাধ্যমে আমরা নিজেদের পক্ষপাতিত্ব এবং সীমাবদ্ধতাগুলিকে চিনতে পারি যা আমাদের আরও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে।

এখন আসা যাক, একসাথে হাঁটা প্রসঙ্গে। যখন আমরা কারো সাথে একসাথে হাঁটি তখন আমরা তার চ্যালেঞ্জ, সুবিধা-অসুবিধা ভাগ করে নিই। একসাথে চলার/হাঁটার জন্য প্রয়োজন একে অপরের প্রতি আস্থা, সততা এবং উভয়ের মধ্যে উন্মুক্ত যোগাযোগ।

দুর্ভাগ্যবশত, আজকের সমাজে অন্যের কথা শোনা এবং একসাথে হাঁটার চিত্র খুবই কম দেখা যায়। তথ্য প্রযুক্তি আমাদের মধ্যে বেগ/গতি নিয়ে আসলেও কেড়ে নিয়েছে আমাদের আবেগ/অনুভূতিকে। আমরা সবকিছুতে আমাদের নিজস্ব অহংবোধকে অগ্রাধিকার দিয়ে এক প্রকার যন্ত্র মানবে রূপান্তরিত হয়ে গেছি। কিন্তু এখন সময় এসেছে নিজের দিকে তাকানোর এবং নিজ নিজ মানবিক অনুভূতিকে জাগ্রত করার।

ঘটনা ১:

রতন, ৫৬ বছর বয়সী ভদ্রলোক, পেটের সমস্যা নিয়ে আমার চেম্বারে এসেছেন। হাতে ৪টি প্রেসক্রিপসন। তিনি তা আমাকে দেখালেন। আমি তার সমস্যা সবিস্তারে শুনলাম। তার শারীরিক পরীক্ষা করলাম। তার রোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আলাপ করলাম। তার হাতে থাকা বিগত দিনের ৪টি প্রেসক্রিপশন দেখলাম। শহরের নামকরা স্যারদের দেখানো প্রেসক্রিপশন। ৪টি কাগজ দেখে বুঝতে পারছি যে, তিনি গত ২ মাসের মধ্যে ৪ জন স্যারকে একই সমস্যা নিয়ে ৮ জন স্যারকে দেখিয়েছেন। রতন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম -

- পরীক্ষা করতে বলা হয়েছিল - করেছেন কিনা?
- তিনি বললেন - করা হয়নি?
- সব প্রেসক্রিপসনের সকল ঔষধ খেয়েছেন কিনা বা এখন কোন কোন ঔষধ খাচ্ছেন ?
- তিনি বললেন - এখন কোন ঔষধ খাচ্ছি না।
- কারণ কি?

- তিনি বললেন - অনেক কষ্ট করে স্যারদের নাম জেনেছি, সিরিয়াল নিতে অনেক কষ্ট হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় - তারা তাদের চেম্বারের সামনে থাকা অন্য সহযোগী ডাক্তারদের ছাপানো কাগজে আমার তথ্য নিয়েছেন, কিন্তু স্যারেরা আমার সাথে আলাপ না করেই চিকিৎসা দিয়েছেন। আমি তাদের সাথে কোন কথা বলতে পারিনি। তারা আমাকে একবারও কোনভাবে আমাকে পরীক্ষা করেননি। আমার কষ্টের কথা তদের বলতে পারিনি। তারা আমার সাথে আলাপ না করে কিভাবে আমার সমস্যা জানবে? মনের মধ্যে দুঃশ্চিন্তা থাকায় ঔষধ কিনলেও আর তা খেতে পারিনি। বর্তমানে অনন্যোপায় হয়ে আমাদের বাড়ির পাশের এক মুরব্বির কাছ থেকে আপনার কথা শুনে এসেছি। আমাকে আপনি বাঁচান। তার কষ্ট দেখে খুব খারাপ লাগল। তাকে বুঝিয়ে বলার পর তার পরীক্ষা মোতাবেক তাকে চিকিৎসা দেবার পর এখন তিনি সুস্থ।

ঘটনা ২:

আমাদের এক মধ্যবয়স্ক বয়োজেষ্ঠ সহকর্মী নিয়মিত ধূমপান করেন। হঠাৎ কাশির সাথে রক্ত আসাতে শহরের এক নামী হাসপাতালে দেখালেন। স্বনামধন্য চিকিৎসক তাকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললেন - তার বাম দিকের ফুসফুসে ক্যান্সার হয়েছে। তাকে জরুরীভাবে অপারেশন করাতে হবে এবং পরিস্থিতি মোটেই ভালো নয়। পরে তিনি অতিশয় মানসিক কষ্টে ভেঙ্গে পরেন। তার স্ত্রী একজন নার্স। আমাদের সাথে আলাপের পর বহু কষ্টে টাকা যোগাড় করে তারা ভারতের ভেলোরে চিকিৎসা করাতে যান। অনেক পরীক্ষার পরে সেখানকার চিকিৎসকরা তার ফুসফুসে ক্যান্সার হয়নি বলে জানান এবং আরো পরীক্ষার পরে তাকে জানান - তার যক্ষা রোগ হয়েছে এবং ৬ মাসের চিকিৎসা দিয়ে ও পরবর্তী ফলো- আপের তারিখ দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারা যার পর নাই স্বস্তি পেয়েছেন।

বাইবেলে বর্ণিত *লূক ১৮:৩৫-৪৩* পদে আমরা দেখি যিশু যেরিখো থেকে যাবার পথে একজন অন্ধ ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা রকরেন - তুমি আমার কাছে কি চাও? আর সে চিৎকার করে বলে - দাউদ সন্তান যিশু, আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে দেখার সুযোগ করে দিন এবং যিশু তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন ও তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। এখানে আমরা দেখি-যিশু অন্ধ লোকটির জন্য থামেন, তার কষ্টের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন, তার অভাব, তার কষ্ট বুঝতে পারেন এবং তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। তার জন্য দয়া করেন। তার জীবনে পরম শান্তি এনে দেন। তিনি শুধু তাকে শারীরিকভাবেই সুস্থ করে তুলেননি, মানসিকভাবেও তার মধ্যে প্রশান্তির পরশ এনে দিয়েছেন। তিনি তাকে সার্বিকভাবে এ সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। যিনি ছিলেন, মূল্যহীন, যে কোন কায়িক পরিশ্রম করতে পারতেন না, যিনি ভিক্ষা করতেন, যিনি অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন, তাকে তিনি চোখে আলো জ্বেলে দিয়েছেন, নতুনভাবে বাঁচতে পথ দেখিয়েছেন-স্বাবলম্বী করেছেন।

১ ডিসেম্বর রমনায় ক্যাথিড্রালে নেতাদের সমাবেশে বলেছেন - আপনারা যা বিনামূল্যে পেয়েছেন, তা বিনামূল্যেই অন্যের জন্য দিয়ে যান। আবার ০২ ডিসেম্বরে পুরোহিত, ব্রতধারী ব্রতধারিনীদের সমাবেশে বলেছেন - যারা অন্যের দুর্নাম করে, তারা ডাকাতদের মত তাদের মেরে ফেলে। তিনি বলেছেন- তোমাদের জিহ্বা সংযত কর। তিনি মানসিক আঘাতের কথা বলেছেন। আমরা অনেকেই অন্যকে বিভিন্নভাবে কটুকথা বলে নিজেকে

জাহির করি-অন্যকে বিভিন্ন জনের কাছে ছোট করি। যা আমরা বুঝতে পারিনা। কিন্তু যাকে বলি - তার মন খুব ভেঙ্গে যায়। তিনি হতাশ হন। অনেক ক্ষেত্রে তারা দিগভ্রান্ত হন, নিজের সাথে বোঝাপড়ায় নিজের অনেক ক্ষতি করেন। এমনকি আত্মহত্যাও করতে পারেন। এজন্য বলা হয়েছে, মন ভেঙ্গে দেয়া মানে মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া। ০১ ডিসেম্বরে তিনি রমনায় বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে সরাসরি দেখা করেছেন - কথা বলেছেন, তাদের প্রত্যেককে সময় দিয়েছেন, প্রত্যেকজনকে আলাদা করে স্পর্শ করেছেন। তাদের নিয়ে প্রার্থনা করেছেন। বিশ্ববাসী তা অবলোকন করেছেন। তিনি বিশ্ববাসীর মন জয় করে নিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে যাবার সময় তিনি বলেছেন - তিনি তাদের কষ্ট দেখে, কষ্টের কথা শুনে অনেকবার কান্না লুকাতে চেয়েছেন। কিন্তু রক্ত মাংসের মানুষ তিনি, পিতার মত রমনার বেদীমঞ্চে হাজার জনতার মাঝে তিনি কেঁদেছেন।

কয়েকদিন আগে সংবাদপত্র থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশের চিকিৎসকেরা রোগীদের সবচেয়ে কম সময় দেন। রোগীদের কষ্ট অনুভবের জন্য তাদের কথা ভালোভাবে শোনা দরকার, তাদের কষ্টে তাদের মত কষ্ট অনুভবেই কেবল তাদের জন্য শারীরিক ও মানসিক এমনকি তাদের সার্বিক মঙ্গল (Wholestic) সম্ভব ।

এজন্য কারিতাসের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি যথার্থই বলেন-শোনার মানুষ সোনার মানুষ। সৃষ্টিকর্তা এ কারণেই বুঝি আমাদের ২টি কান ও ১টি মুখ দিয়েছেন্ যেন আমরা বেশি বেশি দীন দুঃখী মানুষের কথা শুনি, স্বার্থপরতা ত্যাগ করি, দয়া ও শান্তির সমাজ গড়ি। আমরা যারা মানুষের সেবা করি, মানুষের চিকিৎসা করি, আমাদের উচিৎ শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি তাদের কথা ভালোমত শোনা, ফলে রোগীরা মানসিক শক্তি পাবে, মনে শান্তি পাবে এবং তাদের যথাযথ সার্বিক উন্নয়ন হবে।

অনেক বাসে লেখা থাকে-রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। আসলেই তাই। রাগ আমাদের অনেক ক্ষতি করে থাকে। এটি নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। তা না হলে অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। ভালোমত অন্যের কথা না শুনে হঠাৎ রেগে গেলে মহা সর্বনাশ। যারা সর্বদা প্রথম হতে চান, তাদের বুঝতে হবে্ জীবনে সর্বদা প্রথম হওয়া যায় না। জীবনে সফলতা যেমন আনন্দের, তেমনি ব্যর্থতায় তা মেনে নিয়ে এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা খুব দরকার। আমাদের পরিবারে পিতামাতাদের ও সমাজে শিক্ষকদের এবং বড়দের দায়িত্ব অনেক বেশি। আমাদের নিয়মিত ধৈর্যশীলতা অনুশীলন করতে হয় ।

ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী সর্বদা অন্যকে ভালোমত শুনেছেন তিনি সহসাই অন্যের সাথে রেগে যাননি-অহিংসার মাধ্যমেই তিনি পৃথিবীতে শান্তি আনতে চেয়েছেন। প্রভু যিশু বলেন, তোমাকে কেউ এক গালে চড় দিলে, তুমি তোমার অন্য গালও তার দিকে পেতে দাও। তিনি নিজে বিরোধীকে ক্ষমা করতে বলেছেন। এমনকি তিনি ক্রুশের উপরে, চরম লজ্জাজনক মৃত্যুর মধ্যেও তার শত্রুকে ভালোমত শুনেছেন এবং বলেছেন পিত:, তুমি এদের ক্ষমা কর, কারণ তারা কি করছে, তা তারা জানে না। এভাবেই আমাদের রাগ কমাতে হয়, রাগ প্রশমনের চর্চা করতে হয়, অন্যকে ভালোমত শুনতে হয়। বার বার একাজ করলেই পৃথিবীতে শান্তি আসবে ।

অন্যকে ভালোমত শুনার প্রভাব:

- অন্যকে ভালোমত বোঝা যায়। তিনি কি বলতে চায়, তা অন্তরঙ্গম করা যায়।
- অন্যের সাথে ভালো যোগাযোগ দক্ষতা তৈরী হয় মিত্রতা থাকে, শত্রুতা হয় না।
- অপরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে হার্ট এ্যাটাকের ঝুঁকি কম থাকে।

অন্যকে ভালোমত না শুনে রাগ করা একটি বদ অভ্যাস। রাগ একটি শক্তিশালী আবেগ। যদি এটি উপযুক্তভাবে পরিচালিত না হয় তবে এটি আপনার এবং আপনার নিকটতম মানুষগুলির জন্য বিধ্বংসী ফলাফল আনতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ - ঝগড়া, শারীরিক মারামারি, শারীরিক নির্যাতন, আক্রমণ এবং স্ব-ক্ষতি করতে পারে। অন্যদিকে, রাগ নিয়ন্ত্রণ একটি কার্যকর আবেগ হতে পারে যা আপনাকে ইতিবাচক পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করে।

রাগের শারীরিক প্রভাব:

রাগ শরীরের যুদ্ধ বা ফাইট প্রতিক্রিয়া ট্রিগার। ফলে অন্যান্য আবেগ ভয়, উত্তেজনা এবং উদ্বেগ বেড়ে যায়।

অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিগুলি অ্যাড্রেনালাইন এবং কর্টিসোলের মতো স্ট্রেস হরমোনের সাথে শরীরকে উত্তেজিত করে।

হার্ট রেট, রক্তচাপ এবং শ্বসন বৃদ্ধি, শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং ত্বক প্রবল হয়।

রাগের ফলে শারীরিক সমস্যা হয়:

মাথা ব্যাথা, হজমের সমস্যা - পেটে ব্যথা অনিদ্রা, উদ্বেগ বৃদ্ধি, বিষণ্নতা, উচ্চ রক্তচাপ চর্ম সমস্যা, স্ট্রোক, হার্ট এ্যাটাক।

যে ব্যক্তি নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে না সে নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের মধ্যে সমস্যা তৈরী করতে পারে। কিছু লোক যারা ক্রোধে উড়ে যায়, তাদের স্ব-আত্মসম্মান কম থাকে এবং তাদের রাগ অন্যদেরকে কাজে লাগানোর এবং শক্তিশালী বোধ করার উপায় হিসাবে ব্যবহার করে। রাগ দমন - কিছু লোক মনে করে যে রাগ একটি অনুপযুক্ত বা খারাপ আবেগ, এবং এটি দমন করা খুব কঠিন কাজ।

স্বাস্থ্যকর উপায়ে রাগ প্রকাশ:

সুস্থ উপায়ে আপনার রাগ প্রকাশ করার পরামর্শগুলির মধ্যে রয়েছে ।

- আপনি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকেন তবে আপনি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত, সাময়িকভাবে পরিস্থিতি থেকে দূরে সরে যান।
- জীবনের অংশ হিসাবে আবেগকে গ্রহণ করুন।
- একবার আপনি সমস্যাটি সনাক্ত করার পরে, পরিস্থিতির প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আসার কথা বিবেচনা করুন।

পরামর্শ :

- আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ডায়েরি রাখুন, লিখুন ।
- প্রশিক্ষণ, বা দ্বন্দ্ব রেজল্যুশন কৌশল সম্পর্কে শেখার চেষ্টা করুন।
- ধ্যান বা যোগব্যায়াম হিসাবে শিথিল কৌশল শিখুন।
- আপনি যদি অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির বিষয়ে এখনও রাগান্বিত হন তবে কাউন্সিলর বা মনোবিজ্ঞানী দেখান।
- নিয়মিত ব্যায়াম করুন।
- শিশুদের শিক্ষাদান করুন কিভাবে রাগ প্রকাশ করতে হয়।

শান্তির দূত কোলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা একবার বেশ কয়েকজন কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর জন্য দুধ আনতে একটি বড় দোকানে গেছেন। ব্রাহ্মণ দোকানদারের কাছ থেকে তিনি তার শিশুদের জন্য দুধ চাইলে তিনি তার হাতে ঘৃণাভরে একদলা থুথু দেন। আর মাদার তেরেজা মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনেছেন ও তার অন্য হাত পেতে দিয়ে তাকে বলেছেন - আমি আপনার দেয়া সব অপমান নিজের জন্য নিলাম, এবার দয়া করে আপনি আমার অভুক্ত শিশুদের জন্য দুধ দিন। ব্রাহ্মণ খুব অবাক হলো। তিনি তাকে তার শিশুদের জন্য দুধ দিলেন। রাগ কমিয়ে ধৈর্যসহ শুনলে ও কাজ করলে ভালোবাসায় বিশ্ব জয় করা সম্ভব। ❑

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট, বিনিময় ২০১৮, বিনিময় ২০১৯

সন্তানের জন্য পারিবারিক বন্ধন একান্ত প্রয়োজন

হেলেন রোজারিও

ছবি: ইন্টারনেট

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে"

প্রাচীন কবির এই অমৃত কথা ও আশীর্বাণী আমাদের সকল পিতামাতার একান্ত কামনা, অন্তরের অন্তঃস্থলের একান্ত প্রার্থনা। সূর্য-উদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিদিনের প্রার্থনা। আমার সন্তান যেন সুখে-শান্তিতে, সমৃদ্ধিতে, পূর্ণ নিরাপত্তায় এই সুন্দর পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে। ফুলে ফসলে সবুজ ধরিত্রীকে ভরে তুলতে পারে।

সন্তানের জন্ম হয় পরিবারে। পিতা-মাতা ও সন্তান এই তিনে পরিবার। ঐশ্ব আশীর্বাদে পূর্ণ গৃহ-মণ্ডলী। কারণ পবিত্র বিবাহিত জীবনের আশীর্বাদই পরিবার। পবিত্র পরিবার। খ্রিস্টীয় পারিবারিক জীবনের পূর্ণ প্রকাশ। সন্তান পরিবারে ঐশ্ব আশীর্বাদ। পিতা-মাতার ঐশ্ব আশীর্বাদ ও ঐশ্ব সম্পদ পরিবারে সন্তানের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নাই। বাবার অগাধ টাকা পয়সা, বিষয় সম্পদ কার জন্য? সন্তানের জন্য নয় কি? একটি দরিদ্র পিতা-মাতাও তার সন্তানের জন্য; এমন কি রাস্তার ভিক্ষুক মা বাবাও সন্তানের মঙ্গল ও ক্ষুধার আহারের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে যায়। ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে।

সন্তান-ছেলেমেয়ে পরিবারে জন্ম নেয়। শৈশব থেকে যৌবন কাল পর্যন্ত গৃহেই পিতা-মাতার কোলে, সান্নিধ্যে, মায়ের আঁচলতলে, আদর সোহাগে, স্নেহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যৌথ পরিবারে থাকলে দাদা-দাদি, কাকাকাকী আত্মীয়দের স্নেহ ছায়ায় লালিত হয়। তাদের কাছ থেকে আচার-আচরণ শিখে, মিখে ভক্তি-শ্রদ্ধা। বাবা মা জন্ম দান করে। শিক্ষক শিক্ষায় মানুষ করে তোলে। জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় সৌহার্দ্য সম্প্রীতিতে সুন্দর জীবন দান করে। এখানে শিক্ষক "দ্বিতীয় জন্মদাতা।" শিক্ষাগুরুর সম্মান মর্যাদা জীবনকে সুন্দর ও পবিত্র করে তোলে।

ছোট পরিবার সুখী পরিবার। একটি দুটি ছেলে মেয়ে নিয়ে ছোট্ট সুন্দর পরিবারে বাবা মা সুখী ঠিকই। সচ্ছলতা, শান্তিপ্রিয়, গোলমালহীন, ঝামেলাহীন পরিবার সত্যিই সুন্দর। ছোট পরিবারে বাবা-মা দু'জনই যদি বাইরে চাকুরী করে তাহলে বাচ্চারা বাড়ীতে একা। শুধু আয়া বা গৃহ পরিচারিকার তদারকিতে। এতে না আছে আন্তরিকতা না আছে সুশিক্ষার আলো। দাদা-দাদি আত্মীয় পরিজন যতটা নিরাপত্তা ও আদরে যত্নে শিক্ষা-সহবতে, খাবার দাবারে যত্নশীল হবে তার কিছুই শিশুরা পাবেনা। এমন অবস্থায় শিশুরা হয় বাধা-বন্ধনহীন। আত্মার সম্পর্ক না থাকায় শিশুরা হয় অবাধ্য, উগ্র, একগুয়ে। আত্মীয়তার বন্ধন, পারিবারিক বন্ধন না থাকায় শিশুদের মনে সহভাগিতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি জন্মায় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মান্য করে না। গুরুজনদের ভক্তি শ্রদ্ধা করে না। পরিবারে অনেকগুলো ভাইবোন থাকলে বন্ধন দৃঢ় হয় যেমন গ্রামের বাড়ীতে শরীকদের ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে থাকে সেখানে পরিবেশ ভিন্নতর হয়। সর্ম্পকের বন্ধন দৃঢ় হয়। বড়দের কাছ থেকে নৈতিক জ্ঞান, প্রার্থনা, ভাল কাজ, দয়ার কাজ পারিপার্শ্বিক জ্ঞান লাভ করে। বাবা মা বাইরে থাকলেও তাদের পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের সান্নিধ্যে পরস্পারের মধ্যে সম্পর্ক ও আত্মার বন্ধন দৃঢ় হয়। মন মানসিকতার বিকাশ ঘটে। অনেকগুলো ভাই-বোন থাকলেও তাদের মধ্যে আত্মার বন্ধন থাকে। সহভাগিতার, স্নেহ-মায়া-মমতার বিকাশ ঘটে। একে অপরকে বুঝতে, জানতে শিখে। দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, অসুখে, দয়া স্নেহের, ভালোবাসার হাত বাড়ায়। আর একজন সন্তান, সেতো একাই- জগত তার কাছে একাই।

পরিবারে বাবা-মায়ের সম্পর্ক সুন্দর থাকলে সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক সুন্দর হয়। সন্তানকে পিতামাতার যথেষ্ট সময় দিতে হবে। তাদেরকে আদরে শাসনে, স্নেহে আধ্যাত্মিকতায় ভরে রাখতে হয়। চারিত্রিক সৌন্দর্যে, পাঠ্যদানে ও শিক্ষা, সুগঠনে, মনমানসিকতায়, আত্মমর্যদায় যাতে বেড়ে উঠতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। বয়ো বৃদ্ধির সময় বিশেষ করে মাকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে। আজকাল মুঠোফোন সবার সাথে থাকে। ট্যাব, ইন্টারনেট, টিভি, ফেইসবুক ইত্যাদি সবার বাড়ীতেই। এবিষয়ে সকল বাবা মাকে সর্তকতার সঙ্গে সুদৃষ্টি দিতে হবে। সন্তানের বন্ধুরা কি রকম তা জানতে হবে। সততা বা অন্যায়ের পথে - তা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। বাধা বন্ধনহীন তারুণ্য ছেলে মেয়ে উভয়কেই সুপথ/বিপথের সন্ধান দেয়।

ফ্ল্যাট বাসায় ছেলে মেয়েদের একা রাখা নিরাপদ নয়। গ্রামের বাড়ীতে বিশেষ করে শরীক বাড়ীতে একান্নভূক্ত পরিবার হলে তা হয় সবার জন্য মঙ্গল। বিদ্যালয়ে আসা যাওয়াতেও বাবা মায়ের দায়িত্ব অপরিসীম। কোচিং সেন্টারে, বাইরে যারা পড়তে যায়, ঠিকমত গেল কিনা? পড়াশুনা আদায় করে কিনা, বাবা মাকে জানতে হবে। বাড়ীতে গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়তে বসলেও তার প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে।

অনেক সময় উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারে ছেলে-মেয়েরা তরুণ বয়সে তাদের চাহিদা থাকে অনেক। অতি চাওয়া, অতি পাওয়া জীবনকে সুন্দরভাবে গড়তে বাধাগ্রস্থ করে। ধুমপান, মাদকাসক্ত হতে দ্বিধা করে না। পোশাকে আশাকে মাত্রাধিক্য ব্যয়বাহুল্য প্রকাশ পায়। অবশ্য পরিবেশ পরিস্থিতিও সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। সন্তান মায়ের কাছে বেশি সহজ লভ্য। তাই মাকেই এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে প্রচুর। নতুবা সন্তান বিপথগামী হতে, অন্যায় অসত্যের পথে পা বাড়াবে। পরিবারের বিশ্বস্ততার মূল্যবোধ সন্তানকে ন্যায়ের পথে জাগ্রত রাখে। বিপদমুক্ত রাখে।

আমার সন্তান আমার একান্ত আপন, আমার অমূল্য সম্পদ। একে রক্ষার দায়িত্ব পিতা- মাতা, অভিভাবক সবার। বিদ্যালয়ে শিক্ষক/ শিক্ষয়িত্রীরাও। আগামী প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে, সুস্থ-সবল সুন্দর জীবন উপহার হিসেবে দেশ ও জাতির জন্য আগামী ভবিষ্যতকে রেখে যাওয়ার একান্ত দায়িত্ব আমার, আপনার, সবার। সকলের অন্তরের একান্ত প্রার্থনা। আগামী প্রজন্মকে দুধে-ভাতে রাখতে হলে সন্তানদের সুন্দর, পবিত্রতায়, সুশিক্ষায়, সুযোগ্যভাবে গড়ে তুলতে হবে। তাতে দেশ ও জাতি সুস্থ, সুন্দর সবল পৃথিবীকে সুজলা, সুফলায় ভরে তুলতে পারবো। ❑

কর্মক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত:পুরুষদের নার্সিং পেশা

পিটার ডেভিড পালমা

ভূমিকা

জীবিকা হিসেবে নার্সিং পেশা আমাদের কাছে নতুন কোন বিষয় নয়। একটি সময় ছিল যখন নার্স বললে কেবল এবং একমাত্র মেয়ে/নারীকে বুঝাতো। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনোস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে। কর্মযজ্ঞে এখন আর নারী-পুরুষের কোন প্রভেদ নেই। ফলে একদার নারীময় নার্সিং পেশাতে পুরুষেরও জড়িত হচ্ছেন। কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য এ যেন নতুন দ্বার উন্মোচিত হলো।

ইতিহাসের পাতায় পুরুষ নার্সদের অবস্থান

নার্সিং পেশায় নারীদের তুলনায় পুরুষদের অংশগ্রহণ সমপর্যায়ে না থাকলেও ইতিহাসের পাতায় অসুস্থ এবং আহতদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের উপস্থিতি সুস্পষ্টভাবে রয়ে গেছে। নোসোকোমিয়াল শব্দটি গ্রীক Νοσος/Nosos (অসুস্থতা) এবং Κομεω (Komeo) থেকে এসেছে যার অর্থ যত্ন নেওয়া। নোসোকোমি শব্দটি ল্যাটিনাইজ করা হয় এবং সেবাপরায়ন পুরুষদের দেওয়া হয়। কোডেক্স থিওডোসিয়ানস অফ ৪১৬ (xvi, ২, ৪২) এ আলেকজান্দ্রিয়ায় পুরুষ নার্সদের ৫০০ জনের তালিকা পাওয়া যায়।

পরবর্তীতে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে নিউজিল্যান্ডে প্রথম নার্সিং কাউন্সিল আইন করা হয়। ইউরোপে যখন প্লেগ রোগ ব্যাপক আকার ধারণ করে তখন পুরুষেরা প্রথমে প্রাথমিক সেবা দানকারী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬০ এর দশক থেকে, নার্সিং ধীরে ধীরে আরও লিঙ্গ-সমেত হয়ে উঠেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০২০ স্টেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'স নার্সিং অনুসারে, বিশ্বব্যাপী নার্সিং কর্মীর প্রায় ১০% পুরুষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ স্টেট বোর্ড অফ নার্সিং (এনসিএসবিএন) ২০২০ খ্রিস্টাব্দে একটি ন্যাশনাল নার্সিং ওয়ার্কফোর্স সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং দেখেছে যে পুরুষরা নিবন্ধিত নার্সদের ৯.৪% প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ৯.১%, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ৮% এবং ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ৬.৬% ছিল।

বাংলাদেশে পুরুষদের নার্সিং পেশা

জীবনমান উন্নয়নে বর্হিবিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক পুরুষেরাও নার্সিং পেশাকে জীবিকা নির্বাহের পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছে। রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ করেছেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। তাদের প্রচেষ্টা ও স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে সফলতার সাথে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তজন যারা তাদের কর্মের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টকে প্রচার করে যাচ্ছেন। বর্তমান সময়ে জীবন জীবিকায় পুরুষ নার্সদের পরিচিতি দিতে গিয়ে দু'জন খ্রিস্টান পুরুষ নার্সের সাথে আলাপনে কিছু সময় সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।

ব্রাদার এজিকিয়েল মুর্মু সিএসসি, বিএসসি (ডিইউ)

সাধু ভিয়ানী হাসপাতাল

ব্যক্তি জীবনে আমি পবিত্র ক্রুশ সংঘের একজন সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার এবং পেশাগত ভাবে আমি একজন পুরুষ নার্স। অবাক হচ্ছেন? একজন ব্রাদার কি করে আবার পুরুষ নার্স? স্বাভাবিক ভাবেই সবার মনে এই প্রশ্ন জাগতেই পারে। এই ছোট ছোট প্রশ্নগুলোর বিড়ম্বনায় আমাকে পড়তে হয় বৈকি। আমি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের সাধু পিতরের ধর্মপল্লী সন্তোষপুর গ্রামের এক খ্রিস্টীয় পরিবারের সন্তান। আমার বাবা আদ্রিয়াস মুর্মু এবং মা মায়না বাস্কে। পরিবারে আমরা তিন ভাই এবং আমিই বড়। ছোট একটি ছিমছাম নিরিবিলি গ্রামীণ পরিবেশে আমার বেড়ে উঠা। বনপাড়া যিশু হৃদয়ের হোস্টেল থেকে সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষা লিখি।

সবার জীবনে কোন না কোন না বলা গল্প থাকে। গল্প থেকেই জীবনের স্বপ্ন, ভালোবাসার স্বপ্ন, বেঁচে থাকার স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে। গল্প আর স্বপ্ন ঠিক যেন পয়সার এপিঠ ওপিঠ। শৈশবে আমি আমার দাদী এবং মার কাছ থেকে শুনে এসেছি আমি নাকি জন্মের পর খুবই অসুস্থ ছিলাম। বেঁচে থাকার মতো অবস্থা আমার ছিলো না। কিন্তু ঈশ্বর আমার সহায় ছিলেন। তাই তার ভালোবাসার স্পর্শে আমি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাই। গল্প শুনতে শুনতে স্বভাবতই আমি মানব সেবার স্বপ্ন দেখি। অনুভব করি মানুষকে সেবা করার জন্য আমার মন কাঁদে। হোস্টেলের ছেলেরা অসুস্থ হলে সেবা করা, দেখাশুনা করা, সাহায্য করা, এক ধরনের ভালোবাসা হিসেবে আমার ভিতরে কাজ করত। সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা, উৎসাহ বেড়ে উঠে।

সেবার ব্রত ধরেই আমি পবিত্র ক্রুশ সংঘে যোগদান করি। হৃদয়ের সুপ্ত বাসনাটি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমার সন্ন্যাসব্রতী ভাইয়েরা অসুস্থ হলে তাদের সেবা করা, সাহায্য করা, আপনা আপনি থেকেই চলে আসত। এতে আমার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে চলে যায় বিষয়টি। উনারা উপলব্ধি করেন যে, সেবা করার মহৎ গুণটি আমার মধ্যে রয়েছে। কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এবং আমার সদ্বিচ্ছায় ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে ২২ ডিসেম্বর জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ নার্সিং কলেজে ভর্তি হই। সেখানে তিন বছর পড়াশুনা করে ডিপ্লোমা নার্সিং অর্জন করি এবং বর্তমানে আমি পোস্ট বেসিক বিএসসি পড়াশুনা করছি। দেখতে দেখতে আজ অনেক বছর কেটে গেল। আজ আমি একজন প্রফেশনাল নার্স। আমার ছোটবেলার স্বপ্ন আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার কমিউনিটি আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ, সাহস এবং সহযোগিতা করেছে।

সব পেশাতেই প্রতিবন্ধকতা আছে। একজন ব্রাদার আবার পুরুষ

নার্স হওয়াটা অবশ্যই সহজ পথ ছিলো না। একদিকে সংঘের কার্যক্রম, অপরদিকে সেবার নতুন ধারা সব কিছু মানিয়ে চলাটা আমার জন্য সহজবোধ্য ছিলোনা। এ পেশাতে অনেক বন্ধুর পথ রয়েছে। সমাজের একটি দল রয়েছে যারা এই পেশাকে সমর্থন করেছে আবার অন্য একটি দল ছিল যারা সমর্থন করলেও আড়ালে তিক্ততা প্রকাশ করে।

একজন মৃত্যু পথযাত্রী রোগীর সাথে শেষ কথা বলা, সেবা করা, এর মাঝে কত যে আত্মতৃপ্তি মেলে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রোগীর সেবা যত্নে নিজেকে আত্মনিয়োগ করা তো খ্রিস্টেরই সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। এই ছোট ছোট সেবা কাজ, কষ্ট সহ্য করা, ত্যাগস্বীকার করায় আমি যেন স্বয়ং যিশুখ্রিস্টকে দেখতে পাই। "মাদার তেরেজা" যেমন সেবার ব্রতে নিজেকে সারাজীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তদ্রুপ তার হাত ধরে, তারই অনুপ্রেরণায় আজীবন কাজ করে যেতে চাই। এ পেশায় নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছি। খ্রিস্টসেবা তো আর্তমানবতার সেবা।

পূর্বের তুলনায় বর্তমানে পুরুষ নার্সের গ্রহণীয়তা ও মূল্যায়ন যথেষ্ট। দেশ-বিদেশে এ পেশায় কাজ করার ক্ষেত্র বেশ প্রসারিত। যদিও মূল্যায়নের প্রেক্ষাপট স্থান-কাল ও পরিবেশ ভেদে ভিন্ন হয়। বিশ্বাস ও আস্থা রাখা যায় আগামী দিনগুলোতে পুরুষ নার্সদের অবস্থান সম পর্যায়ের হবে। আমি ভালোবাসা নিয়ে যুবক ভাইদের বলতে চাই, বিশেষ করে যারা এসএসসি এবং এইচএসসি পড়াশুনা করছে তারা যেন এ পেশায় অংশগ্রহণ করে। এ পেশায় যেমন রয়েছে আত্মসম্মান তদ্রুপ রয়েছে সম্মানিও। আপনারা এ সেবাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। এ পেশার মধ্যদিয়েই ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা যায়।

কার্লো রোজারিও

(আরএন, বিএসসি) নার্সিং কর্মকতা

জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান

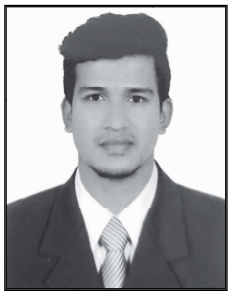

রাজশাহীর ধর্মপ্রদেশের বোর্ণী ধর্মপল্লীর বোর্ণী গ্রামে আমার বাড়ি। পিতা লরেন্স রোজারিও ও মাতা প্রীতি পিউরিফিকেশন। তিন ভাই-বোন ও বাবা-মা নিয়ে আমাদের সুখি পরিবার। আমার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হাতেখড়ি সেন্ট মেরীস প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়। নটর ডেম কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং সেন্ট ভিনসেন্ট ইন্সটিটিউট থেকে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারী। আমার সহধর্মিণী ও আমি বর্তমানে নার্সিং কর্মকর্তা হিসেবে জাতীয় অর্থপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছি।

ছোটবেলায় কখনই ভাবিনি নার্স হবো। আসলে তখন পুরুষ নার্স সর্ম্পকে অবগত ছিলাম না। যখন একাদশ ১ম বর্ষে পড়ি তখন শ্রদ্ধেয় ফাদার কার্লো বুচ্চি পিমে একজন পুরুষ নার্সের কাজ, পড়াশুনা এবং দেশ-বিদেশের পুরুষ নার্সের চাহিদা সম্বন্ধে অবগত করেন এবং উৎসাহ দেন যেন আমিও নার্সিং পেশায় যোগদান করি। ফাদারের পরামর্শে এবং ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এবং মাদার তেরেজার জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই নার্সিং সেবা বেছে নিয়েছি। ফাদারের সহযোগিতায় আমি সেন্ট ভিনসেন্ট ইন্সটিটিউট থেকে নার্সিং বিভাগে লেখাপড়া করি ও ভাল ফলাফল করি।

দেড়যুগ আগেও সমাজে পুরুষদের নার্সিং পেশাকে স্বাভাবিক ভাবে বিবেচনা না করলেও বর্তমানে যথেষ্ট সম্মানের স্থানে রেখেছে। হয়তো অনেকে ভাবেন নার্সিং করতে কোন পড়াশোনা প্রয়োজন হয় না কিংবা কোন রকম ৩ বছরের একটি ট্রেনিং নিলেই চাকরি হয়ে যাবে। কিন্তু এ ধারণা পুরোটাই ভুল। চেষ্টা ও মেধা থাকলে নার্সিং এর উপর পিএইচডি ডিগ্রি নেওয়া সম্ভব। বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশের পুরুষ নার্স হওয়াটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। আসলে নার্সিং পেশায় পড়াশোনার বিকল্প নেই। বাংলাদেশে কর্ম কমিনের অধীনে সরকারি নার্সিং এর নিয়োগ হয়ে থাকে। ১০০ নম্বরের MCQ, ২০০ নম্বরের লিখিত এবং ভাইভা এই তিনটি ধাপ পার করেই সরকারি নিয়োগ পাওয়া মেলে। এছাড়াও বাংলাদেশে অনেক ভাল বেসরকারী হাসপাতাল ও এনজিও রয়েছে যেখানে ভাল বেতনের চাকরি পাওয়া যায়।

নার্সিং মানেই সেবা। আর প্রতিদিন আমাকে অনেক রোগীকে সেবা দিতে হয়। আমি চেষ্টা করি যে সব রোগী অসহার, গরীর, পা থেকে পচা গন্ধ আসছে হয়তো এখন থেকে সঠিক সেবা না পেলে তার পা কেটে ফেলতে হতে পারে সে সব রোগীদের আগে সেবা দিতে। "সেবা কর দুঃখি জনে, সেবা কর আর্তজনে সেই তো তোর খ্রিস্টসেবা (গীতাবলী-২০৮)।" যখন থেকে নার্সিংকে সেবা এবং পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি তখন থেকেই এই গানের লাইনটি অন্তরে গেথে নিয়েছি। এইভাবে সেবা করার মাধ্যমেই আমি খ্রিস্টের সেবায় আত্মনিয়োগ করে যাচ্ছি।

আমাদের দেশে নার্সিং পড়াশোনার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। যেমন: ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারী, বিএসসি ইন নার্সিং, মাস্টারস্ অফ সাইন্স ইন নার্সিং এমনকি, পিএইচডি ডিগ্রি। সুতরাং নার্সিং পড়াশোনা করেই ভালো ক্যারিয়ার গড়া যায়। তাই আগামীতে এ পেশায় পুরুষদের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয় বলে আমি মনে করি।

উপসংহার

নার্সিং পেশায় পুরুষের অবস্থান সত্যই সাধুবাদ যোগ্য। সেবামূলক এই মহান পেশায় যারা ব্রতী হয়েছেন তারা অবশ্যই মানব সেবাকে নিজ জীবনে উপলব্ধি করেছেন। তবে কখনো কখনো আমরা নার্সদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আচরণ পেয়ে থাকি যা সত্যই কাম্য নয়। আমাদের সমাজে পুরুষ নার্সদের অংশগ্রহণ এখনো সন্তুষ্টজনক নয়। প্রত্যাশা রাখি আগামীতেও নার্সিং পেশায় আরো অনেক পুরুষ উৎসাহিত হবে এবং এ পেশাকে শুধু জীবিকা হিসেবেই নয়, অন্তর থেকে মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, প্রয়োজন নার্সিং পেশার শুদ্ধ জ্ঞান লাভ। রোগীর সেবা পরম সেবা। তাই ছোট থাকতেই সন্তানদের মানব সেবায় শিক্ষিত করতে পারলে একদিন তারাই হবে দেশের সম্পদ, প্রকৃত মানব॥ ❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১) ব্রাদার এজিকিয়েল মুর্মু সিএসসি, বিএসসি (ডিইউ), সাধু ভিয়ানী হাসপাতাল।
২) কার্লো রোজারিও, (আরএন, বিএসসি) নার্সিং কর্মকতা, জাতিয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান।
৩) https://bn.wikipedia.org/wiki/নার্সিং পেশা পুরুষ॥

২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার

জন্ম : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৫ (পুণ্য শনিবার)
পিতা : প্রয়াত জেরোম সরকার
মাতা : প্রয়াত মারীয়া সরকার
লক্ষীবাজার ধর্মপল্লী, ঢাকা।

সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

- মৃত্যুকালে এমএসএস (পুরকৌশল), BUET- এর ছাত্র ছিল।
- ১৫তম BCS পরীক্ষায় "গণপূর্ত" বিভাগে "সহকারী প্রকৌশলী" পদে চাকুরীর জন্য নির্বাচিত হয় (মরণোত্তর ফলাফল প্রকাশ)।
- BUET-এ বিএসসি (পুরকৌশল) বিভাগ হতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে "১ম শ্রেণীতে" উত্তীর্ণ হয়।
- ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে এইচএসসি পরীক্ষায় স্টার মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।
- ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষায় ৬টি লেটারসহ স্টার মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।
- দাবা খেলায় স্কুল জীবনে সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৭৭, ১৯৭৮ এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে জুনিয়র, ইন্টারমিডিয়েট এবং সিনিয়র গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহর ইন্টার স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়।
- অবসরের বন্ধু ছিল বই আর ম্যাগাজিন। সে জাতীয় দৈনিক The Daily Star - এ নিয়মিত লেখালেখি করতো। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (BUET) এবং অন্যান্য সাময়িকীতেও তার অনেক লেখা ছাপা হয়েছে।

The Daily Star এবং BUET থেকে ইউকসু'র ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের একুশের প্রকাশনা "অনল জলের চিহ্নগুলো" থেকে হিউবার্টের একটি ইংরেজি এবং একটি বাংলা কবিতা নিচে পুনঃপ্রকাশ করা হলো :

The Prayer I say the Every Other day

Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong
Where in deep silence I may make my deep-breathed utterances
Where my feelings grow evermore strong
Whilst my alter-ego's disparate gaze, forage and embrace most wistfully I long.
Yes, Sir I long for her opulent smile,
The smile without any trace of guile.
Yes, I cherish to be detained in her little prison,
The little prison where in cordial detainment
I can read my own profile.
Sir, you call us all to your own grotesque colosseum.
In great befuddlement, we rather are stuck in the marathon business of a workaholic an idler.
We fail to aspire to obviate the thrust-on mandate, fairness and decorum.
Just bustling with Trifle details, our time hums.
Sir, the prayer I say the every other day is simply this one
whereby I try to reach my un-spectacular world,
my divine arbiter, my own Joan.
Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong.
Here. with a thousand others I try to touch your sampan.

(প্রকাশনা : ম্যাগাজিন সেকশন, দ্য ডেইলী ষ্টার, নভেম্বর ২৭, ১৯৯২)

মাদার তেরেজাকে উৎসর্গীত স্তোত্রাবলী

হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার

বড় বড় স্বপ্নের বিপর্যয়ে,
বড় বড় প্রেমের পরাজয়ে মানুষ মুষড়ে পড়ে;
মানুষ অবুঝ হাহাকারে ভেঙ্গে পড়ে
এমনতর মন্বন্তরে --
যেন অশেষ নিষ্ঠুরতা লেগে আছে সময়ের খঞ্জরে
যার তীক্ষ্ণ আঘাতে মানুষ উবু হয়ে পড়ে;
এমন কোন নিবারণী শক্তি নেই যে তাকে ব্যর্থ করে
অবশেষে তোমার হাত থেকেই পুনর্বার জীবনীশক্তি
সঞ্চারিত হয়, মাদার তেরেজা
কী আশ্চর্য মন্ত্র আছে তোমার কাছে
তুমি বরাভয় দেখালে
এই সর্বত্র প্রসারিত অবিশ্বাসের মাঝে
স্বস্তিমাখা আওয়াজ উঠে,
'ঠাঁই আছে, ঠাঁই আছে'।
ক্রমশঃই একটি বিশাল হৃদয়
হয়ে উঠে একটি পরম আশ্রয়
অথচ সেই তুমি যখন কুমারী বয়সেই চক্ষুলজ্জা ফেলে
কোলে তুলে নিয়েছিলে যতো রাজ্যের অনাথ ছেলেপেলে
যখন কুষ্ঠরোগের অভিশাপে অভিশপ্ত
মানুষগুলিকেই স্নিগ্ধ ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত করেছিলে
তখন তোমার পাশে তেমন কেউ ছিলো না।
সেই সন্ধিক্ষণে সেই একাকিত্ব
তুমি বরণ করেছিলে অবহেলে।
এখন তোমারই অনাবিল ভালবাসার ছোঁয়ায়
অজাত কুজাত মানুষ হয়ে উঠে প্রিয় সমাদরণীয়
যখন তীক্ষ্ণভাষী নিন্দুকেরা খ্রিস্টের ক্ষমার বাণী আওড়ায়,
যখন উচ্ছৃঙ্খল বেলেল্লাপনায় ধুম লেগে যায়,
যখন স্বকথিত পুণ্যাত্মারা নির্দোষ কুমারীকে
জর্জরিত করে অপমান লাঞ্ছনায়,
শহীদের পবিত্র রক্ত দিয়ে হোলি খেলে পাশব উন্মত্ততায়,
তখন তুমি, হয়ে উঠো গাড় বিশ্বাসের স্বর্ণ-তরু,
তোমার সহজ কথায় ঝরে অশেষ পুণ্য।

সকল কল্যাণকামী মানুষের কাছে আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মার মঙ্গল ও চির শান্তি কামনা করে প্রার্থনার অনুরোধ জানাচ্ছি। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

জন (বড়ভাই) + বেবী (বৌদি) : মারীয়া, হিউবার্ট ও টিমথি
ফিলিপ (মেঝভাই) + জয়া (বৌদি) : এলেন ও এঞ্জেলা
মালা (বোন) + মিঠু (ভগ্নিপতি) : আর্থার।

খ্রিস্ট/১০৪/২০২৩

৫ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ছিটন জেমস্ রোজারিও

জন্ম: ২৭ এপ্রিল, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ২৭ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

গ্রাম: মঠবাড়ি (সিংহের বাড়ি)
পো:অ: উলুখোলা, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর

"তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম
তুমি রবে নীরবে
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম
তুমি রবে .....।"

ঘুরে ঘুরে চলে এলো সেই বেদনাকাতর দিনটি যেদিন তুমি আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছিলে। আমরা আজও বাকরুদ্ধ, ভাষাহীন।

তোমার শূন্যতা আজো আমাদের কাঁদায়। এক বুক ব্যথা নিয়ে তোমায় স্মরি হৃদয়ে মম। তোমার শূন্যতা কখনো পূর্ণ হবার নয়। শুধু এটুকুই আশা ও বিশ্বাস মহান স্রষ্টা যেন তোমার সকল দীনতা ও পাপ অপরাধ ক্ষমা করে তোমাকে তার কোলে ঠাঁই দেন। স্বর্গ থেকে তুমি তোমার অবুঝ সন্তান, স্ত্রী, বাবা-মা, বোন, বোন-জামাই, ভাগিনা-ভাগিনী, ঠাকুরমা ও অন্যান্য সকল আত্মীয়-স্বজনের জন্য কৃপা প্রার্থনা করো যেন আমরা পরম পিতা পরমেশ্বরের অসীম দয়ায় ফলশালী হয়ে তোমারই আদর্শ ও সততাকে সমুন্নত রাখতে পারি। এই পৃথিবীর বুকে যদি তোমার কোন পাপ-অপরাধ থেকে থাকে তবে স্বর্গনিবাসী পিতা যেন তাঁর কৃপা স্পর্শে তা ক্ষমা করে দেন। দৈনন্দিন চলার পথে তুমি যদি কারো মনে কোন কষ্ট দিয়ে থাক তবে তার জন্য তোমার পক্ষ থেকে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। ঈশ্বর তোমার পরলোকের জীবনকে তাঁর স্বর্গীয় স্পর্শে অমলিন করে তুলুন এই কামনায় –

তোমার শোকসন্তপ্ত –

তোমার বাবা: সমর রোজারিও
মা: অনিতা ক্রুশ
স্ত্রী: ঈশিতা টুম্পা কস্তা
ছেলে: অর্নেট মার্ক রোজারিও
মেয়ে: এরিসা মেরী রোজারিও
বোন: শিবলী রোজারিও
বোন জামাই: বিকাশ ডমিনিক কস্তা
ভাগিনা: অরিয়ন পৌল কস্তা
ভাগিনী: এ্যানিয়া মারীয়া কস্তা
ঠাকুমা: এড্না রোজারিও

বিজ্ঞ/১০৬/২০২৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মা,

প্রয়াত জ্যোৎস্না ফ্লোরেন্স সরকার
জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২১ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

আমার স্বর্গীয় মা, এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয়নি যেদিনটিতে তোমাকে আমরা ভুলে থেকেছি। মা তুমি আমদের সেই সম্পদ, যা কোনদিনও অন্য কিছু দিয়ে কখনই পূরণ করা যাবে না। কারণ তুমি তো আমাদের সঞ্চিত ধন, গুপ্ত ধন, যা রয়েছে আমাদের হৃদয় মাঝে। যা কখনও বদলানো যায় না।

মা, ঈশ্বর তোমাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ও যথেষ্ট সময় নিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তোমাকে দিয়েছেন অত্যন্ত সুন্দর একটি হৃদয় যা দিয়ে সারাটা জীবন তুমি আমাদের সবাইকে অকুণ্ঠ ভালোবাসায় সিক্ত করেছিলে। আমাদের সব স্বপ্ন, সব সুন্দর ইচ্ছাগুলো তোমার উজ্জ্বল দৃষ্টির মধ্যে ভরিয়ে দিয়েছেন, যাতে তুমি ঈশ্বরের সকল অনুগ্রহ আমাদের মাঝে আনয়ন করতে পার। মা, তুমি খুব সাধারণ একজন মা হয়েও তুমি ছিলে অসাধারণ এবং আমাদের পরিবারের মূল চালিকাশক্তি। তোমার দৃষ্টিতে সর্বদাই আমাদের জীবনের সুন্দর দিকগুলো প্রতীয়মান হতো। মা, তোমাকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর নিশ্চয়ই পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। স্বর্গও তোমার উপস্থিতিতে আলোকিত হয়েছে। ঈশ্বর তোমাকে তাঁর সবচেয়ে সুন্দর অলংকারে সুশোভিত করে রেখেছেন।

আমার প্রিয় মা, আমি জানি তুমি সবসময় আমাদের পাশেই আছ। তুমি আমাদের সঙ্গে থাক আমাদের সর্বদা আশীর্বাদ কর। মা আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। আমি সেই দিনের প্রতিক্ষায় আছি যেদিন স্বর্গে তোমার সাথে আবার একত্রিত হব। তোমাকে হারানোর বেদনায় এই পৃথিবীতে আমরা অনেক কষ্টে রয়েছি। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো।

তোমার আদরের কন্যা
আগ্নেশ বিশ্বাস।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

দিদা,

আমার ভালোবাসা নিও। আমি তোমাকে অনেক কথাই বলতে চাই। অনেক গল্প শুনাতে চাই। কিন্তু আমি জানি আমার বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কেননা তুমি তো সব কিছুই দেখতে পাও। তুমি সব সময় যা দেখ আমি তাই করে থাকি। ধন্যবাদ জানাই আমার মাকেও আমাকে গড়ে তোলার জন্য। আরও ধন্যবাদ জানাই আমাদের পরিবারের পিলার হয়ে আমাদের পরিবারকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর গড়ে তোলার জন্য। আজকে আমি যা হতে পেরেছি তা তুমিই গড়েছ, আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করার সমস্ত কৃতিত্ব তোমারই। আজকের আমিকে একটি শক্ত এবং অধিকতর শক্ত নিরাপত্তায় রেখেছ। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। দিদা, তুমি তো পরপারে গিয়েও আমার মধ্যেই বিরাজমান রয়েছো। তোমার আদর্শ, তোমার ভাবনায়ই আমি পথ চলছি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি তোমাকে গর্বিত করবো আমার পরিবার দেখাশুনার মধ্যদিয়ে যা তুমি দীর্ঘদিন ধরে করেছ। তোমার ত্যাগ, তোমার আদর যত্ন, তোমার ভালোবাসা কোনদিন ভুলবো না। তোমার অভাব আমরা অনেক অনুভব করি। আমি খুব বেশি বেশি করি।

দিদা, আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। অপেক্ষায় আছি সেই দিনটির জন্য যেদিন আমরা সবাই স্বর্গে একত্রিত হবো। সেদিন তোমাকে আবার আলিঙ্গণ করবো। ভাল থাক দিদা, তোমার আদরের নাতনী।

– গীতাঞ্জলি বিশ্বাস।

স্বামী : রমেশ সরকার
ছোট মেয়ে : আগ্নেশ বিশ্বাস
নাতনী : গীতাঞ্জলি বিশ্বাস
গ্রাম : সাপলেজা, পাদ্রীকান্দা
পোঃ অঃ : দেওতলা
উপজেলা : নবাবগঞ্জ
জেলা : ঢাকা।

বিজ্ঞ/১০৫/২০২৩

মহান খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থান উপলক্ষে
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী-এর পাঠক-পাঠিকাসহ সকলকে

কারিতাস জানাচ্ছে
আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

- কারিতাস অর্থ "দয়ার কাজ" বা "সার্বজনীন ভালোবাসা"।
- কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন লালন করে, যে সমাজ মুক্তি ও ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমাশীলতার মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে এবং সবাই মিলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে মিলন সমাজে বসবাস করে।
- কারিতাস বাংলাদেশ মানুষের সহযোগী হতে চায়; বিশেষতঃ সেইসব মানুষের – যারা সমাজে গরীব ও প্রান্তিক জীবনাবস্থায় আছে। সবার প্রতি সম-মর্যাদার দ্বারা কারিতাস এমন একটি সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন করতে প্রয়াসী যার লক্ষ্য হলো: মানব-মর্যাদা নিয়ে মানুষ সত্যিকার মানুষের মতো জীবন-যাপন করবে এবং অপরকে দায়িত্বশীলতার সাথে সেবা করবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাস সকল মানুষের সাথে কাজ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ
২ আউটার সার্কুলার রোড
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

বিজ্ঞ/১১৩/২০২৩

গ্রামীন উদ্যোক্তা

শুভ পাস্কাল পেরেরা

উদ্যোক্তা হলো এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজ চিন্তা ও উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি নিয়ে মুনাফা লাভের আশায় একটি নতুন ব্যবসা আরম্ভ করে। একজন উদ্যোক্তাকে আমরা একজন উদ্ভাবকও বলতে পারি। যেহেতু তিনি একটি নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি নতুন ব্যবসা চালু করেন সেহেতু তিনি একজন উদ্ভাবকও। একজন উদ্যোক্তা নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে, নতুন পণ্য নিয়ে এবং নতুন পরিষেবা প্রদানের জন্য তার নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা করে।

বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে গ্রামের এমন অনেক মানুষ আছে যারা চাকরি করা বা অন্যের অধীনে কাজ করার চেয়ে নিজেই কিছু করার জন্য অর্থাৎ আত্মকর্মসংস্থান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। বর্তমানে মহিলা-পুরুষ, যুবক-যুবতী সব বয়সের মানুষের তীব্র ইচ্ছা লক্ষ্য করা যায় উদ্যোক্তা হওয়ার। আর এটি সমাজ ও দেশের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

যখন করোনা মহামারি আমাদের সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল ঠিক তখন আমাদের মধ্য থেকে অনেক উদ্যোক্তার জন্ম হয়েছে যারা ছোট পরিসরে তাদের ব্যবসা শুরু করে বর্তমানে ভালো একটি জায়গায় রয়েছে। করোনা যেমন আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে আবার যারা চেষ্টা করেছে কিছু করার তারা অনেক কিছু অর্জন করেছে।

আজকে আমরা এমনই দুই জন গ্রামীন উদ্যোক্তার সম্পর্কে জানবো যারা নিজ উদ্যোগে ও নিজেদের চেষ্টা এবং পরিশ্রম দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমানে স্বচ্ছল রয়েছেন।

দীপ্ত উর্বান কোড়াইয়া, সফল উদ্যোক্তা

আমি দীপ্ত উর্বান কোড়াইয়া। আমার বাবা ফিলিপ যোসেফ কোড়াইয়া এবং মা রনা গমেজ। আমি তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর চড়াখোলার গ্রামের সন্তান। বর্তমানে আমি দুটি পেশার সাথে জড়িত। অটোমোবাইল টেকনিশিয়ান এবং একজন খামারি। তবে এর মধ্যে প্রধান এবং অন্যতম হচ্ছে খামার। আমার এই পেশায় আসার প্রধান কারণ হচ্ছে অন্যের অধীনে না থেকে নিজে কিছু করা, কোন কিছুর মালিক হওয়া, আর সেই লক্ষ্যে আমার এই কাজের মধ্যে প্রবেশ। এই পেশায় আসার পর আমার ঠাকু মা (বড় মা, বেনাদী কস্তা) ফাদার জেঠা (ফাদার কমল কোড়াইয়া) আমার বাবা এবং ধীরে ধীরে আমার পরিবারের অন্য সকলে আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন। এই পেশার আসার আগে আমার প্রচণ্ডভাবে ইচ্ছা ছিল একজন ফুটবল খেলোয়ার হবার কিন্তু সেটা বিভিন্ন কারণে হলো না। আমি এইচএসসি পাশ করে মটস্ এ যাই। তিন বছর ট্রেনিং শেষে চাকুরীতে যোগদান করি। আর এর মধ্যেই করোনা মহামারি শুরু হয়। চলে আসি বাড়িতে এবং জমিতে ফসল ফলাতে শুরু করি। সে বছর বিপুল পরিমাণে সবজি উৎপাদনে সক্ষম হই এবং প্রায়ই লক্ষ্য করতাম সবার মুখে মুখে আমাদের সবজির কথা উঠত। আরও লক্ষ্য করতাম আমার ফাদার জেঠা যে মিশনেই যেতেন সেখানে তিনি হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল, ভেড়া নানা গবাদি পশু প্রতিপালন করতেন ও আমাকে অনুপ্রেরণা যোগাতেন। একই সাথে ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে গরু, ছাগল প্রতিপালন করা হত। সেইগুলি কিভাবে আরও বেশি বৃদ্ধি করা যায়, সেই লক্ষ্যে কাজের অনুপ্রেরণা দিতেন। এরপর সেই লক্ষ্য নিয়ে আমি কিছু ঋণের মাধ্যমে কাজ শুরু করি এবং কিছু যন্ত্রাদি ও তিনটি গরু নিয়ে আমার যাত্রা শুরু করি। প্রথম অবস্থায় মানুষ আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। মন ভেঙ্গে যেত, বাবা, ফাদার জেঠা আবার মনোবল জোগাতেন পরামর্শ দিতেন। এভাবে ধীরে ধীরে আমার ফার্মের অবস্থাও পরিবর্তন হয়। ফার্মের গবাদি পশুর পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এরপর আমি নিজের নামে ফার্মের নামকরণ করি (দীপ্ত ডেইরী ফার্ম) একই সাথে বর্তমানে আরও কিছু প্রকল্প নিয়ে কাজ করছি। তবে এর মধ্যে অন্যতম হাঁস-মুরগীর পালন এবং শুকর পালন। আমি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম যখন আমার খামার থেকে প্রথম একটি গরু বিক্রি করি তখন থেকে আমার মনোবল আরও বৃদ্ধি পায়। আর বর্তমানে আমার পরিবারের সবায় ফার্মের প্রতি বিশেষ নজর দিচ্ছে।

প্রতিটি পেশার মধ্যেই নানা ধরনের সমস্যা আছে। যা কিনা আমার এই পেশার মধ্যেও ছিল। এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা আমরা অনেকেই মনে করি এই ধরনের পেশা নিচু প্রকৃতির। সমাজের অনেক মানুষ আছে যারা ভালো চোখে নেয় না। তখন তারা অন্যের সাথে তুলনা করতে শুরু করে। এই ধরনের পেশার মানুষকে অনেক সময় অসম্মানের পাত্র হতে হয়, যার ফলে অনেক গুছানো পরিকল্পনাও ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। কিছু কিছু মানুষ মনে করে আমি যে কাজটি করছি তা সম্পূর্ণভাবে ঠিক আবার কিছু কিছু মানুষ মনে করে এর থেকে আরও ভালো কিছু করতে পারতাম।

সত্যি বলতে পরিবারের সাহায্য ছাড়া আমি এতদূর আসতে পারতাম না। আমার এই কাজে তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা পাচ্ছি এবং তাদের অনুপ্রেরণাই আমার চলার শক্তি। প্রতিনিয়তই সমাজের মানুষের কাছ থেকে উৎসাহ এবং খারাপ মন্তব্য পাই। তবে এর মধ্যে বর্তমানে উৎসাহ দাতাদের পরিমাণটাই বেশি। কিন্তু শুরুর দিকে খারাপ মন্তব্যের পরিমাণই বেশি ছিল। কেননা আমার বাবা একজন শিক্ষক, তার ছেলে হয়ে আমি এ পেশায় নিয়জিত হয়েছি হয়তো এটা তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত। যার কারণে এইরকম নানা উক্তি বা মন্তব্য এখনো আসে।

এই পেশায় আসার পর আমি এখন গর্ব করে বলতে পারি, আমি এখন একটি ফার্মের মালিক। আমি অন্যের অধীনে কাজ করিনা, আমার অধীনে মানুষ কাজ করে। সুতরাং বলতে পারি বা বলা যায় এই দেড় বছরে আমি অনেকটাই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি এবং পরিবারের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছি।

কোন কাজই ছোট নয়। সকল কাজেরই সমান মর্যাদা। শুধু আমরা মানুষরাই সেই কাজের ভেদাভেদ সৃষ্টি করি। সুতরাং কোন কাজকে ছোট মনে না করে সমাজে কে কিভাবে, কি মনে করবে, মান সম্মানে আঘাত লাগবে, সেই ভয় না পেয়ে নিজের কর্মসংস্থান নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে। কারণ বেকারত্ব দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপ।

মানুষ যখন অলস জীবন যাপন করে, তখনই নেশা নামক ভূতটা মানুষকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু মানুষ যখন কাজের মধ্যে ডুবে থাকে তখন সে কেবলই চিন্তা করে কিভাবে সে সামনে অগ্রসর হবে এবং সে যদি পশু পালন শুরু করে তবে তার মাথায় সেই চিন্তা কাজ করবে ওদের কিভাবে সুস্থ রাখা যায়, কিভাবে আরও উন্নতি করা যায়। সে তখন মনে করবে যে টাকা দিয়ে সে নেশা করবে সে টাকা তার ঐ পশু-পাখির সুস্থতা, উন্নতির জন্য কতটা প্রয়োজন। আর এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ় মনোবল। মানুষ ইচ্ছা করলে সবই পারে সুতরাং একজন নেশাগ্রস্থ মানুষও যদি ইচ্ছা করে নেশার জীবন ছেড়ে নিজের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি নিজেই করবে তবে সেটাই হয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার, শ্রেষ্ঠ পাওয়া।

অভি সনেট রোজারিও , সফল খামারী

আমি অভি সনেট রোজারিও। পিতা রতন রোজারিও ও মাতা শ্যামলী রোজারিও। আমি নাগরী ধর্মপল্লীর বাগদী গ্রামের একজন খ্রিস্টভক্ত। আমি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। আমার একটি নিজস্ব খামার আছে যার নাম শ্যামলী এগ্রো ফার্ম। এটি একটি স্বাধীন পেশা। চাকরীতে যেমন নিজস্ব কোন স্বাধীনতা থাকে না এটির ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। আমি আমার ইচ্ছা মতো আমার এই ফার্ম পরিচালনা করি। কাজের

ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার জন্যই আমি এই পেশা নির্ধারণ করেছি এবং ভালো ভাবেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এই পেশাতে পর্যাপ্ত মূলধন না হলে সঠিকভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়ে যায়। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেনিং না থাকলে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রচণ্ড পরিশ্রম ও ধৈর্য্য না থাকলে এ পেশাতে সফল হওয়া কঠিন।

ছাত্রাবস্থাতেই মায়ের দেখাদেখিই পশু পাখি পালন করার আগ্রহ জন্মায়। এরপর বৃহৎ পরিসরে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফার্মের কার্যক্রম শুরু করেছি। আর এখন ভালভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি। সমাজ খুবই ইতিবাচক দৃষ্টিতে আমার এ পেশাকে দেখে এবং উৎসাহ দেয়। বর্তমানে যুব সমাজের একাংশ যেখানে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে সেখানে আমার এই আত্মকর্মসংস্থানের দিকটি সমাজের মানুষের কাছে যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব তৈরী করছে। তাদের দৃষ্টিতে এটি যথেষ্ট প্রশংসার কাজ এবং আমি একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবেই সমাজের কাছে পরিচিত। পরিবারের প্রতিটি সদস্য আমাকে সহায়তা ও অনুপ্রেরণা দেয়। বিশেষ করে আমার মা আমাকে প্রচুর পরিমাণে সহযোগিতা করেন। আমি সমাজ থেকে কোন ধরনের বিরূপ মন্তব্য পাইনি। বরং সবাই দারুণভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেয়। কোন ভাল কাজ কিংবা সফলতার নির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি নেই। তাই আমি বলবো আমার এ পেশায় আসার পর সাফল্যের পথেই ক্রমাগত চলছি এবং তা অব্যাহত থাকবে। এ পেশায় আসার আগে ও পরে পরিবারের নানান দিকেই পরিবর্তন এসেছে। পূর্বের তুলনায় আর্থিক স্বচ্ছলতা বেড়েছে। ফার্মের সম্প্রসারণ করতে পেরেছি। তাছাড়া কাজে ব্যস্ত আছি বলেই শারীরিক ও মানসিক শান্তি ও সুস্থতা বজায় আছে।

বর্তমান সময়ের যুব সমাজ ইন্টারনেট তথা মোবাইলে আসক্ত হয়ে নিজেদের মূল্যবান সময় ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। তাদের বলব অলস ও বেকার হয়ে না থেকে কিংবা শুধুমাত্র চাকরীর আশা না করে আমার মত আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হও এবং নিজেদের ও দেশের ভবিষ্যৎ সুন্দর করে গড়। যারা নেশায় আসক্ত কিংবা বিপথগামী তাদেরকে সঠিক কাউন্সিলিং করে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী করতে হবে। তাদের প্রতি আহ্বান সময়ের কাজ সময়েই করতে হবে। আজ তারা যদি এ ধরনের পেশায় নিয়োজিত হয় তবে সমাজ থেকে নেশা, বেকারত্ব কিংবা দারিদ্রতা দূর হবে।

শেষকথা: যেকোন ভাল কাজই সম্মানের। আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করাকে সকলেই সুদৃষ্টি দিয়ে দেখে। আমরা যেন শুধু চাকরির পিছনে না ছুটি, আমরা যেন নিজ থেকে নিজেদের জন্য আর অন্য কারও জন্যও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করি। এতে করে আমাদের সমাজের ও দেশের বেকারত্বের হার অনেক কমে যাবে। মানুষ কি বলবে? এই চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে নিজে কি করে নিজের এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ সুন্দর করে তুলতে পারি সেই চিন্তা করে তা বাস্তবায়ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ॥ ❑

উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্রেশার: নীরব এই ঘাতক থেকে বাঁচতে আপনি যা যা করবেন

বাংলাদেশ জনমিতি স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-১৮-এর হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রতি চার জনের একজন উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যায় ভুগে থাকেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব বলছে, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগে থাকেন বিশ্বের প্রায় ১৫০ কোটি মানুষ। আর এই সমস্যায় সারা বিশ্বে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর মারা যায়।

উচ্চ রক্তচাপ কী?

হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে রক্ত প্রবাহের চাপ অনেক বেশি থাকলে সেটিকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্রেশার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

দুটি মানের মাধ্যমে এই রক্তচাপ রেকর্ড করা হয়- যেটার সংখ্যা বেশি সেটাকে বলা হয় সিস্টোলিক প্রেশার, আর যেটার সংখ্যা কম সেটা ডায়াস্টলিক প্রেশার। প্রতিটি হৃৎস্পন্দন অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের সংকোচন ও সম্প্রসারণের সময় একবার সিস্টোলিক প্রেশার এবং একবার ডায়াস্টলিক প্রেশার হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের রক্তচাপ থাকে ১২০/৮০ মিলিমিটার মার্কারি। কারও ব্লাড প্রেশার রিডিং যদি ১৪০/৯০ বা এর চেয়েও বেশি হয়, তখন বুঝতে হবে তার উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে। অন্যদিকে রক্তচাপ যদি ৯০/৬০ বা এর আশেপাশে থাকে, তাহলে তাকে লো ব্লাড প্রেশার হিসেবে ধরা হয়। যদিও বয়স নির্বিশেষে রক্তচাপ খানিকটা বেশি বা কম হতে পারে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঙ্গে জটিলতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উচ্চ রক্তচাপ হলে কী সমস্যা তৈরি হয়?

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঙ্গে জটিলতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ থেকে হৃদযন্ত্রের পেশি দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং এর ফলে দুর্বল হৃদযন্ত্র রক্ত পাম্প করতে না পেরে ব্যক্তির হৃতপিণ্ড কাজ বন্ধ করতে পারে বা হার্ট ফেল করতে পারে।

এছাড়া, এমন সময় রক্তনালীর দেয়াল সঙ্কুচিত হয়ে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাও থাকে।

উচ্চ রক্তচাপের কারণে কিডনি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, মস্তিষ্কে স্ট্রোক বা রক্তক্ষরণও হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। আর বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের কারণে রেটিনায় রক্তক্ষরণ হয়ে একজন মানুষ অন্ধত্বও বরণ করতে পারেন।

উচ্চ রক্তচাপের সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হলো, অনেক সময়ই উচ্চ রক্তচাপের কোনো প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যায় না। লক্ষণ না থাকলেও দেখা যায় শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে এবং রোগী হয়তো বুঝতেই পারেন না যে তার মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে।

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক মানুষের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বেশি দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে বয়স ৪০ হওয়ার পর থেকে কয়েক মাস অন্তর ব্লাডপ্রেশার মাপা দরকার। আর যারা দীর্ঘ দিন ধরে রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের প্রতি সপ্তাহে একবার প্রেশার মেপে দেখা উচিত। তবে একবার রক্তচাপ বেশি দেখা গেলেই যে কারও উচ্চ রক্তচাপ আছে, সেটা বলা যাবে না। পর পর তিন মাস যদি কারও উচ্চ রক্তচাপ দেখা যায়, তখনই বলা যাবে যে তার উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে। উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ ঘুমাতে যাবার আগে গ্রহণ করলে সেটা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয় বলে উঠে আসে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক গবেষণায়।

লক্ষণ

উচ্চ রক্তচাপের একেবারে সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষণ সেভাবে প্রকাশ পায় না। তবে সাধারণ কিছু লক্ষণের মধ্যে রয়েছে:

- প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করা, মাথা গরম হয়ে যাওয়া এবং মাথা ঘোরানো
- ঘাড় ব্যথা করা
- বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া
- অল্পতেই রেগে যাওয়া বা অস্থির হয়ে শরীর কাঁপতে থাকা
- রাতে ভালো ঘুম না হওয়া
- মাঝে মাঝে কানে শব্দ হওয়া
- অনেক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলা

এসব লক্ষণ দেখা দিলে নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করতে এবং ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা।

উচ্চ রক্তচাপের কারণ

- সাধারণত মানুষের ৪০ বছরের পর থেকে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে থাকে
- অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা
- পরিবারে কারও উচ্চ রক্তচাপ থাকলে
- নিয়মিত ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম না করলে
- প্রতিদিন ছয় গ্রাম অথবা এক চা চামচের বেশি লবণ খেলে
- ধূমপান বা মদ্যপান বা অতিরিক্ত ক্যাফেইন জাতীয় খাদ্য/পানীয় খেলে
- দীর্ঘদিন ধরে ঘুমের সমস্যা হলে
- শারীরিক ও মানসিক চাপ থাকলে

ব্লাড প্রেশার বা উচ্চ রক্তচাপ: কেন হয়, লক্ষণ ও কমানোর উপায়

উচ্চ রক্তচাপ হলে কী করবেন

জীবন-যাপনে পরিবর্তন আর নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এজন্য কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে:

- খাবারে লবণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া- লবণের সোডিয়াম রক্তের জলীয় অংশ বাড়িয়ে দেয়, ফলে রক্তের আয়তন ও চাপ বেড়ে যায়।
- ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার করা- ধূমপান শরীরে নানা ধরণের বিষাক্ত পদার্থের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, ফলে ধমনী ও শিরার নানারকম রোগ-সহ হৃদরোগ দেখা দিতে পারে।
- ওজন নিয়ন্ত্রণ করা-শরীরের ওজন অতিরিক্ত বেড়ে গেলে হৃদযন্ত্রের অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়। বেশি ওজনের মানুষের মধ্যে সাধারণত উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা যায়।
- নিয়মিত ব্যায়াম বা কায়িক পরিশ্রম করা - নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম করলে হৃৎপিণ্ড সবল থাকে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। যার ফলে রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা কম করা- রাগ, উত্তেজনা, ভীতি অথবা মানসিক চাপের কারণেও রক্তচাপ সাময়িকভাবে বেড়ে যেতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। দীর্ঘসময় ধরে মানসিক চাপ অব্যাহত থাকলে দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা তৈরি হতে পারে।
- খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা- মাংস, মাখন বা তেলে ভাজা খাবার, অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার খেলে ওজন বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া অতিরিক্ত কোলেস্টোরেল যুক্ত খাবার খাওয়ার কারণেও রক্তচাপের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। কারণ, রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টোরেল রক্তনালীর দেয়াল মোটা ও শক্ত করে ফেলে। এর ফলেও উচ্চ রক্তচাপ দেখা যেতে পারে।

এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ হলে অতিরিক্ত কোলেস্টরেল জাতীয় খাবার পরিহার করে ফলমূল শাক সবজি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে॥ ❑

সবজি বাগানে সন্ত্রাসী হামলা

ডেভিড স্বপন রোজারিও

ছবি: ইন্টারনেট

যখন স্কুলে পড়তাম, একটা শব্দ সহজে রপ্ত করেছিলাম এবং সময়ে অসময়ে গুরুজনরা হুকুম করার সাথে সাথে, মনের অজান্তে বের হয়ে আসতো, "পারতাম না"। এ অভ্যাস যে শুধু আমার ছিল তা কিন্তু নয়। ভাই-বোন, পাড়া প্রতিবেশি অনেকেই অবলীলায় উচ্চারণ করতো "পারতাম না"। অনেক সময় বুঝে, অনেক সময় না বুঝেই বলে ফেলতাম। তবে বাবার আদেশ অমান্য করার সাধ্য আমার ছিল না। তিনি শিক্ষক ছিলেন এবং খুবই গম্ভীর প্রকৃতির।

ছোটবেলায় আমি ভীষণ অলস ছিলাম। জমি-জমা দেখাশুনা বা জমিতে কাজ করায় আমার অনীহা ছিল। সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজটি ছিল মলনে (ধান মারাই) গরু ঘুরানো। নানা অজুহাতে ধান তোলা মৌসুমে প্রায়শঃই এ কাজটি এড়িয়ে যেতাম। খড়ের আঁচড়ে সারা শরীর চুলকাতো। খাঁটি সরিষার তেল মেখেও রেহাই পেতাম না। যার জন্য পড়ার টেবিলে বসে জোরে জোরে পড়া মুখস্থ করতাম। বাবা ছিলেন টিচার, ফলে আমাকে কেউ যেন বিরক্ত না করে, সে ব্যাপারে সবাইকে সাবধান করে দিতেন।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ বিদেশে আমরা অনেকে আধুনিক কৃষক বা মালি বনে যাই। দেশে থাকতে একটি ফুলের গাছ না লাগালেও, বা চাষাবাদ না করলেও, এখানে দিব্যি শখের বাগান করে যাচ্ছি। তার প্রধান কারণ- হাত বাড়ালেই সব আধুনিক সরঞ্জাম এখানে পাওয়া যায় যেমন- সার, মাটি, কীটনাশক, ঔষধ ইত্যাদি। খুব উর্বর জমি কোনরকম লাগালেই মোটামুটি খাওয়ার সবজি পাওয়া যায়।

তদুপরি সুন্দর সময় কেটে যায়। টাটকা সবজি যেমন খাওয়া যায়, আবার তেমনি আত্মীয় স্বজনদের মাঝে বিলানোর পরও প্রায় সারা বছর ফ্রিজে জমা রেখে খাওয়া যায়। ফলে প্রতিবছর অনেকে বাড়ির পেছনে এক চিলতে জায়গা পেলে মনের আনন্দে বাগান করে থাকে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। এ বাগানের কাজে আনন্দ যেমন আছে আবার যন্ত্রণাও আছে প্রচুর। তারই কেচ্ছা মনের দুঃখে নিম্নে তুলে ধরলাম।

বাল্যকালে, গ্রাম্য ডাক-সাইটে এক মাতব্বরকে প্রায়ই তার চেলাদের বলতে শুনতাম:-

"মাইর খাইয়া আমার কাছে আবি না। মাইর দিয়া আবি, বিচার করুম।"

আমাদের সমাজে কিছু দুধর্ষ লোক আছে, পবিত্র বাইবেলের বাণী, খনার বচন, সমাজপতিদের নানা আদেশ-উপদেশ-পরামর্শ কিছুই মানে না। সামাজিক ভয়ভীতির তোয়াক্কা করে না। নানা ছলেবলে পরের সম্পদ আত্মসাৎ করতে তারা সিদ্ধহস্ত। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেয়। এদের কাছে ন্যায়-নীতি বলে কোন ধর্ম নেই। অনেকে এদের আবার জন্মগতভাবে দোষী বলে থাকে।

বাগানে পানি দিয়ে একটি চেয়ারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, আর ফেলে আসা জীবনের আবোল-তাবোল সব চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। আমি তখন কল্পনার রাজ্যে বিরাজ করছি।

হঠাৎ হি হি হাসির শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম- ছাদে বসে দু'টো শালিক ব্যঙ্গ করে আমাকে বলছে-

"কি দাদা, বাগানে তো নানা যন্ত্রপাতি ও আঠার ফাঁদ পেতে রেখেছো। শিকার লাগাতে পারছো না বুঝি?"

বলাবাহুল্য, বেশ কয়েক বছর আগে একটি লেখায় এদের অত্যাচারের কথা কিঞ্চিত আলোকপাত করেছিলাম। আমাদের ঘরের পেছনে এক চিলতে বাগান। প্রতি বছর শখের সবজির বাগান করে থাকি। সব ধরণের দেশী শাক সবজি সামান্য যত্নেই প্রচুর ফলে। কোন পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রতিবছর পাখি ও জন্তুদের অত্যাচারে প্রত্যাশিত ফসল ঘরে তোলা সম্ভব হয় না। এদেরকে আটকাতে বিভিন্ন মেশিন কিনেও ওদের চতুরতার কাছে হার মেনেছি বারবার। নানা উপায়ে এরা ঠিকই বাগানে প্রবেশ করে এবং মুহূর্তে তছনছ করে দেয় সাজানো বাগান।

ইসোদর পালমা, মেরীল্যান্ডে থাকে। সে বললো, "দাদা, এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রায় দু'হাজার ডলার খরচ করে দুই ছেলেকে নিয়ে তিনদিন ধরে বাগানের চারিদিকে শক্ত লোহার জালের বেড়া দিলাম ঠিকই, হরিণকে আটকাতে পারলেও র‍্যাকুন, ইঁদুর, খরগোশ, কাঠবিড়ালী আটকাতে পারলাম না। তারা ঠিকই কাঁটাতারের বেড়া টপকিয়ে আসে। ভালো করে সার মাটি দিয়ে জমি প্রস্তুত করে পালং শাক, পাট শাক, লালশাক ও ধনিয়া বীজ বুনলাম। কিন্তু চড়ুই ও শালিক পাখি মিলে মহোৎসবে খুঁটে খুঁটে খেয়ে ফেললো।"

একজন অভিজ্ঞ লোক আমাকে বুদ্ধি দিল, বীজ বুনে প্লাস্টিক দিয়ে আদ্যোপান্ত ঢেকে দাও। তার পরামর্শ মতো বীজ বোনা স্থানটি ভালোমত ঢেকে দিলাম। কাজ হলো। পাখিরা বসলো বটে, কিন্তু খেতে পারলো না। এদের ব্যর্থ নাচানাচি দেখে একটি জনপ্রিয় শ্লোকের

কথা মনে পড়ে গেল-

"আইলো পাখী ঝমঝমাইয়া
বইলো পাখী, পাখ মেলাইয়া,
ধরলো আধার খাইলো না।"

যদিও এর উত্তর হবে 'ঝাঁকি জাল'। পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে বসার ধরণটা কিছুটা সেরকম।

ঢেকে রাখার ফলে বেশ কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত বাগান লাল সবুজের চারায় ছেয়ে গেল। ভারী সুন্দর দেখতে। একটু বড় হবার পর লাল শাক ও ধনিয়া তুলে সে স্থানে নার্সারী থেকে পছন্দমত যেমন- বেগুন, ওলকপি, শসা, ঢেড়স, টমেটো ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বাড়ন্ত চারা এনে লাগালাম।

ফুলকপির চারাগুলো বেশ ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে, সাথে বেগুন, ঢেড়স, টমেটো, বিনসের গাছে ফুল ধরেছে। দেখতে ভারী মজা লাগে। প্রতিদিন সকাল-বিকাল দু'বেলা পানি দেই। বিভিন্ন মেশিন লাগিয়ে দূর্গকে সুরক্ষিত করেছি। এখন মোটামুটি নিশ্চিন্ত।

তবে শিকারী প্রথমদিন এসেছিল রাজকীয় ভঙ্গিমায়। এসে দেখে গেছে, কোন গাছটি তার জন্য উপযুক্তভাবে বেড়ে উঠেছে। আমি এক ঝলক দেখেছিলাম মাত্র কিন্তু আমার শব্দ পেয়ে মুহূর্তে সে হাওয়া হয়ে যায়। আমি ভাবলাম হয়তো বা দেখার ভুল। এতো সাবধানতা অবলম্বন করেও যদি শখের সবজিগুলো জন্তুরা খেয়ে ফেলে তবে দুঃখের সীমা নেই।

র‍্যাকুন (Raccoon) অত্যন্ত বুদ্ধিমান একটি প্রাণী। এরা নিঃশব্দে দ্রুত চলাচল করতে পারে। এটা একটি ভয়ংকর ক্ষতিকারক দুষ্টু প্রাণী। এরা প্রায় সব কিছুই খায়। র‍্যাকুন দেখতে গাঁট্টাগোট্টা ও বলিষ্ঠকায় জন্তু। সাধারণতঃ প্রায় দুই থেকে তিন ফুট লম্বা এবং দশ থেকে পঞ্চাশ পাউন্ড পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে। চোখের উপরে একটি বিশিষ্ট কালো মুখোশ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত যা সহজে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। এদের সারা শরীর পশমযুক্ত ও ঝাঁকড়া চুল ও লেজবিশিষ্ট। বছরে গড়ে চার-পাঁচটি বাচ্চার জন্ম দিয়ে থাকে। র‍্যাকুন সাধারণত রাতে সক্রিয় হয়ে উঠে। এরা গাছপালা, পোকামাকড় এবং প্রাণী খায়। যখন তারা মানব বসতিতে আসতে শুরু করে তখন ময়লা আবর্জনা খায়। এরা যেমনি দ্রুত তেমনি হিংস্র। অনেক সময় সামান্য আঘাত পেলে আক্রমণকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম- সারাটা জীবনতো বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের সাথে সহাবস্থান করেছি, এখন না হয়, কিছু জন্তু জানোয়ারের সাথে মিলে মিশে থাকি।

আমার বাগানের পেছনের দিকে কিছু খালি কার্টুনবক্স (মোটা কাগজের তৈরি বক্স) জমা করে রাখা ছিল। অনেক দিন ধরে ফেলি ফেলি করে ফেলা হয়নি। উপরন্তু বাজারের আবর্জনা ফেলে স্থানটিকে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেল, র‍্যাকুন বন্ধুর আর দেখা নেই। এদিকে বাগান ফুলে ফলে ছেয়ে গেছে। দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে।

একদিন বিকালে বাগানে একটি চেয়ারে বসে চায়ের কাপে মৃদু চুমুক দিচ্ছিলাম, আর মনের আনন্দে একটি গান গাইছিলাম-

"বন্ধু কই গেলা, কই গেলা, কই গেলারে,

আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কই গেলারে॥"

হঠাৎ ময়লা স্তূপের মাঝ থেকে খচ্‌খচ্‌ আওয়াজ ভেসে এলো। আমার কানও খাড়া হয়ে গেল। সাথে সাথে মনেও সন্দেহের খচ্‌খচানি শুরু হয়ে গেলো। খুব সাবধানে শব্দের উৎপত্তিস্থলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

হঠাৎ দেখি কার্টুন বক্সের মধ্যে দু'টি চোখ, জল জল করছে। দেহটা গলা পর্যন্ত মাটির তলে কেবল মুখটি উঁচু করে কালো মায়াবী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভয়ে সরে এলাম। ও যদি ভাবে ওকে আমি আক্রমণ করবো তবে আমাকে আক্রমণ করে বসতে পারে। মনে মনে র‍্যাকুনটির বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। কার্টুন বক্সের মধ্যে ঢুকে মাটির মধ্যে গর্ত করে বসে আছে। ওকে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। সুযোগ বুঝে বের হয়ে পেটপূর্তি করে আবার নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকে পড়ে।

আপোষ করা ছাড়া কোন উপায় রইলো না। কিছু কফি পাতা ছিড়ে, দূর থেকে ওর সামনে ছুড়ে দিলাম। মনে মনে বেশ আত্মতৃপ্তি পেলাম এই ভেবে, মারাত্মক করোনাকালীন সময়ে কত মানবিক সংস্থা ক্ষুধার্ত মানুষের সাহায্যের জন্য খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্রসহ নানা সামগ্রী নিয়ে ছুটে এসেছে। আমি কিছুটা না হয় করলাম।

আমার এ বদান্যতাকে সে দূর্বলতা ভাবলো। মনঃতুষ্টি নিয়ে রাতে ঘুমিয়ে ছিলাম। ঠিক দুপুরের দিকে কাঁচামরিচ তুলতে গিয়ে দেখি বাগানে এক নির্মম ঝড় বয়ে গেছে।

প্রতিটি কপিগাছ উপড়ানো। পাতা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেখলে মনে হবে কেউ লাঙল দিয়ে গভীরভাবে চাষ করে গেছে। শুধু তাই নয়, লাউ, বেগুন, শসা সব অর্ধেক করে খাওয়া। র‍্যাকুন যে এভাবে ভালোবাসার মূল্য দেবে তা কল্পনাও করতে পারিনি।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। শুধু গর্ত দেখা যায় কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। ভীষণ রাগ হলো। ভাবলাম- রাজনৈতিক মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ যেমন ঠান্ডা জলের কামান দাগে, আমিও তেমনি ফুটন্ত গরম জল ঢেলে দেব। কিন্তু কেমন জানি মায়া হলো। কঠিন সিদ্ধান্তটি নেয়ার আগে আরেকটু ভেবে দেখলে কেমন হয়? আমার মেয়ে মিঠুকে ফোন করলাম, কারণ সে অনলাইন থেকে মেশিনগুলো কিনে দিয়েছিল। তাকে বিস্তারিত বলার পর সে বললো, "এমনতো হওয়ার কথা নয়। নিশ্চয় সেটিং (Setting) এ কিছু একটা ভুল আছে। তুমি আবার ম্যানুয়াল দেখে সেট করো।"

বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে আমি চিন্তা করিনি। তাড়াতাড়ি মেশিন খুলে দেখি- সত্যি তো- র‍্যাকুনের জায়গায় তীর চিহ্নটি নেই, আছে খরগোসের দিকে। তাইতো বাছারাম আমার বাগান নির্বিঘ্নে তছনছ করেছে।

আল্ট্রাসাউন্ড প্রতিরোধক ডিভাইসগুলো (Ultrasound Deterrent Device) র‍্যাকুনদের শারীরিকভাবে ক্ষতি না করে দূরে সরিয়ে রাখার একটি দূর্দান্ত উপায়। ছোট, সাশ্রয়ী এবং সংক্ষেপে বলতে গেলে ডিভাইসগুলোর (Device) শব্দ বা আলো ও শব্দের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে র‍্যাকুনগুলোকে ভয় দেখানো হয়। ডিভাইসগুলো থেকে জন্তু ধরার শিকারী শব্দ উৎক্ষিপ্ত হয়, আবার কোন কোন সময় পুনঃপুনঃ তীব্র শব্দ নির্গত হতে থাকে যা শুধু র‍্যাকুন শুনতে পায়।

আমি মেশিনটি পুনরায় স্থাপন (Set) করে High Frequency দিয়ে দিলাম। মুহূর্তের মধ্যে কার্টুন বক্সে ঝড় বয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম একটি, পরে দেখি পরপর দু'টি র‍্যাকুন পড়ি কি মরি করে যেভাবে লাফিয়ে পালালো আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম।

এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলাম, চান্দুদের আর দেখা নেই। চিরবিদায় নিয়েছে। কার্টুনবক্স সরিয়ে সমস্ত স্থানটি পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি এক সুবিশাল দুর্গ তারা বানিয়েছিল বক্সের ভেতরে। গর্ত ভরাট করে সব পরিষ্কার করলাম। বাড়ন্ত চারা এনে আবার নতুন করে লাগালাম। দেরিতে হলেও ভালো ফলন হলো। আত্মীয়স্বজনদের মাঝে বিলিয়েও যথেষ্ট পরিমাণ নিজেদের জন্য ফ্রিজ ভর্তি করে রাখলাম। আশা করছি তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে এ বছর সব কিছু সামাল দিয়ে মহানন্দে বাগান করতে পারবো॥ ❑

ক্ষণিকের মোহ

শিউলী রোজলিন পালমা

ছবি: ইন্টারনেট

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের কথা মনে হলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে ফিরোজের! কী সৌভাগ্যের বছরই না ছিল! '৭৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরেই ঢাকার "মফিদুল্লাহ্ ডিগ্রি কলেজ" এর প্রিন্সিপাল হিসেবে চাকুরী পায় ফিরোজ। '৮০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে স্ত্রী সুমা ইসলাম ও দুই মেয়ে ফারাহ্ ও জারাহ্ কে নিয়ে ঢাকায় আসে ফিরোজ। বাসা নেয় পুরানা পল্টন, কলেজ থেকে রিক্সায় বাসায় যেতে সময় লাগে মাত্র ১৫ মিনিট। বাসা থেকে দু'কদম হাঁটলেই "ফুলকুঁড়ি নার্সারী স্কুল", সেখানেই ক্লাশ ওয়ানে ফারাহ্ ও নার্সারী ক্লাশে জারাহ্ ভর্তি হয়ে যায়। দুই মাস ফুলকুঁড়ি স্কুলে পড়ার পরই ফারাহ্ ভিকারুননেসা নুন স্কুলে ক্লাশ ওয়ানে ভর্তির সুয়োগ পেয়ে যায়। ফিরোজ ঢাকার একটি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে ভিকারুননেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করে এ স্কুলে মেয়েকে ভর্তির একটি আবেদনপত্র জমা দিয়ে এসেছিল। মার্চ মাসে একটি সিট খালি হওয়াতেই ভর্তির সুযোগ পেয়ে যায় ফারাহ্।

কলেজের প্রিন্সিপাল হলেও বেতন খুব বেশি নয় ফিরোজের। ঘর ভাড়া, খাওয়া দাওয়া, বাচ্চাদের স্কুলের খরচ, কুষ্টিয়ায় টাকা পাঠানো সব সামাল দেয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। অবশ্য স্ত্রী সুমার সব রকম সমর্থন আছে ফিরোজের জন্য। সুমা বলে, 'আমাদেরকে ঢাকায় আনতে পেরেছ, ফারাহ্, জারাহ্ ঢাকা শহরের সেরা স্কুলে পড়বে এর চেয়ে বড় সফলতা আর কী হতে পারে! এখানে টিকে থাকার জন্য সব রকম কষ্ট করব আমরা, প্রয়োজনে প্রতিদিন শুধু আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খাব। আর আমার একটা চাকুরী হয়ে গেলে তোমার উপর চাপ অনেকটাই কমে যাবে।' সুমার কথায় ভরসা পায় ফিরোজ।

সুমা যখন কুষ্টিয়ার 'ভেড়ামারা ডিগ্রি কলেজ' এ পড়ে তখন ফিরোজ ছিল এই কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক। প্রথম দর্শনেই অসম্ভব রূপবতী ও বুদ্ধিমতী ছাত্রী সুমার প্রেমে পড়ে যায় ফিরোজ। কোন রকম বাঁধা ছাড়াই উভয় পরিবারের পূর্ণ সমর্থনে পারিবারিক ভাবেই তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর কয়েকদিনেই বুদ্ধিমতী সুমা ফিরোজদের পরিবারের সবার ভরসার স্থল হয়ে উঠে। যেকোন কাজ অতি দ্রুত দক্ষতার সাথে করে ফেলে, যেকোন মানুষকে অল্প সময়েই মোটিভেট করে কাজ আদায় করে ফেলে। দেবর, ভাসুর, জা, ননদ, ননদের জামাই কেউই সুমার কথার বাইরে যেতে পারে না কারণ সুমার যুক্তির সামনে কেউ কোন যুক্তি দাঁড় করাতেই পারে না। শুধু পরিবারেই নয় ফিরোজের কলেজের নানা সমস্যার সমাধানেও সুমার পরামর্শ খুবই ফলদায়ক হয়। সুমাই ফিরোজকে বুঝিয়েছে, আরো ভালভাবে জীবন কাটাতে হলে ঢাকা যেতে হবে। আমরা ঢাকা গেলে আমাদের সন্তানরা তো ভাল থাকবেই, আমাদের ভাইস্তা, ভাস্তি, ভাগ্নে, ভাগ্নিদেরও ঢাকায় যাওয়ার পথ সুগম হবে। সুমার দিকনির্দেশনায়ই আবেদন করে ঢাকায় চাকুরী পায় ফিরোজ। সুমা না থাকলে এর কিছুই হতো না।

ঢাকায় আসার ষষ্ঠ মাসে প্রথম ইন্টারভিউতেই সুমার চাকুরী হয় তৌফিক গ্রুপে, তৌফিক গ্রুপের কর্ণধার তৌফিক আজিজ খানের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে। তৌফিক গ্রুপের ব্যবসা অনেক। শিপিং, প্যাকেজিং, এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় আছে কোল্ডস্টোরেজ, সল্ট রিফাইনারি ইন্ডাস্ট্রি, মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবার নামে নামে আছে কার্গো ভেসেল। মা আলফাতুননেসা, রোকেয়া কুইন, মিথিলা সিস্টারস্, বরকত ভয়েজার, শতকত প্যারাডাইস এগুলো সবই সাগরে চলাচলকারী তৌফিক গ্রুপের ভেসেল। তৌফিক আজিজ খানের মত চরম পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, অবিরত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাকারী একজন মানুষকে কাছ থেকে দেখে জীবনের একটি নতুন দিক যেন সুমার সামনে উন্মোচিত হল। তৌফিক গ্রুপের এ ব্যবসা প্রথম থেকেই এত বড় ছিল না। অনেক চড়াই উতরাই, অনেক ঝুঁকি, রাতদিন হাড়ভাঙা খাটুনি করেই তৌফিক সাহেব গড়ে তুলেছেন এই তৌফিক গ্রুপ। তবে তৌফিক সাহেব ব্যবসার অনেক দায়দায়িত্বই এখন ছেড়ে দিয়েছেন দুই ছেলে, মেয়ের জামাই ও ভাতিজাদের উপর। বড় বড় গাড়িতে চড়ে সকাল বেলা ধাপধুপ করে অফিসে ঢুকে তৌফিক সাহেবের ছেলেরা ও ভাতিজারা। কিন্তু সবার মাথার উপর সবার শক্তি হয়ে আছেন তৌফিক সাহেব। সর্বক্ষণই সব প্রজেক্টের নানা জটিলতার ত্বরিত সমাধান দেন তিনি।

সর্বক্ষণ ব্যস্ততার মাঝেও তৌফিক সাহেব তার ঘটনাবহুল ব্যবসায়িক জীবনের বড় বড়

অর্জনের গল্পগুলো সুমার সাথে বলেন। সুমা অভিভূত হয়ে যায় এমন স্বপ্নবাজ, দূরদর্শী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ও বেপোরোয়া সাহসী মানুষের গল্প শুনে। সুমার মনে হয় তৌফিক সাহেবের সাথে থাকা মানেই প্রতিমুহূর্তেই নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মাঝে থাকা, নতুন নতুন অর্জনের মাঝে থাকা। তৌফিক সাহেবও সুমার কাজে যথেষ্ট সন্তুষ্ট, সব দিকনির্দেশনা দ্রুত বুঝে, কাজও করে দ্রুত, কাজ শেখার ইচ্ছাও আছে প্রবল, সারাক্ষণ হাসিখুশী, পারিবারিক অসুবিধার কথা বলে ছুটির জন্য ঘ্যান ঘ্যান করে না, অফিসের কাজের বাইরেও নানা পার্টিতে না যেতে অজুহাত দেখায় না। তৌফিক সাহেবের মা-বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল থেকে শুরু করে, দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীদের জন্য দেয়া পার্টি, বড় বড় ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়ার পর সেলেব্রেশন পার্টি সবটাতেই তৌফিক সাহেবের আশে পাশে সুমাকে থাকতেই হয়। সুমা একদিন অনুযোগের স্বরে তৌফিক সাহেবকে বলেছিল, 'আপনার অতসব পার্টিতে আমি যেতে পারব না। পার্টিতে পরার মত অত শাড়ি আমার নেই।' এরপর থেকে প্রতি পার্টির আগে তৌফিক সাহেব সুমাকে একটি খাম ধরিয়ে দিয়েছেন যেন পছন্দমত শাড়ি, জুতা, ব্যাগ ও অর্নামেন্টস্ কিনতে পারে। এভাবেই ধীরে ধীরে ষাটোর্ধ্ব তৌফিক সাহেব কখন যে অনুর্ধ্ব ত্রিশ সুমার অনেক অনেক কাছের হয়ে গেছে, সেটা যেন সুমাও বুঝতে পারেনি।

সুমার দামী পোশাক-আশাক, কেনা-কাটা, অফিস নিয়ে বেশি ব্যস্ততা যত বাড়ছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সংসারের অশান্তি। মেয়েদের যত্ন হচ্ছে না, মেয়েদের রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে, উৎসব অনুষ্ঠানেও কুষ্টিয়া যাওয়ার সময় বের করা যাচ্ছে না। সুমা নানাভাবে সব অসুবিধা সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে। মেয়েদের যেন অযত্ন না হয় তাই গ্রাম থেকে মাকে ঢাকায় আনা হয়েছে, দুই মেয়েকে পড়ানোর জন্য দুজন টিচার রাখা হয়েছে। নিরাপদে স্কুলে যাওয়া আসার জন্য ফারাহ্ কে স্কুল বাসে দেয়া হয়েছে। বাসায় মাকে রান্নায় সহায়তা করার জন্য লোক রাখা হয়েছে। তবুও অশান্তি। ফিরোজ সারাক্ষণ রেগে থাকে।

- তৌফিক সাহেব কেন তোমার পোশাক কিনতে একস্ট্রা টাকা দেয়?

- দেখ ফিরোজ, এত সন্দেহ করো না, উনি আমার বাবার বয়সী।

- এতদিন এটাই ভাবতাম, এখন যেভাবে এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি শুরু হয়েছে, বাবার বয়সী মানুষ আর বাবার স্থানে আছে বলে মনে হচ্ছে না।

- চাকুরী করি, চাকুরীর প্রয়োজনে নানা জায়গায় যেতে হবে, বাড়ি ফিরতে দেরী হবে, এটাই স্বাভাবিক।

- এজন্যই বলছি, এ চাকুরীটা ছেড়ে দাও, খিলগাঁও গালর্স হাইস্কুলে টিচার নিবে, এপ্লাই করো, হয়ে যাবে। টিচিং- এ থাকলে বাসায় যথেষ্ট সময় দিতে পারবে। টাকাটাই সব না, পবিত্র জীবন-যাপনের মূল্য টাকা দিয়ে হয় না।

-তুমি তো আছ টিচিং পেশায়, এ পেশায় থেকে কী করতে পারছ সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সারাক্ষণ একঘেঁয়ে কথাবার্তা, এডমিশনের চাপ, স্টাফদের নিয়ে সমস্যা, টিচারদের নিয়ে সমস্যা, বোর্ডের সাথে সমস্যা। এই ছোট্ট একটা কলেজ নিয়ে মানুষ কিভাবে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয় ভেবে পাই না। কুনোর ব্যাঙ একটা। পবিত্র জীবন আমাকে শেখানোর দরকার নেই, তোমরা শুধু শিখেছ ফকিরের জীবন।

পহেলা বৈশাখের সকালে যখন সবাই সাদা লাল কাপড় পরে পরিবার নিয়ে ছুটছে রমনার বটমূলে, তখন সুমা তার মা, দুই মেয়ে ও দু'তিনটা কাপড় চোপড়ের লাগেজ নিয়ে তৌফিক সাহেবের ধানমন্ডির বাসায় উপস্থিত। ফিরোজের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ। অনেকদিন যাবত মানসিক নির্যাতন চলছিল, এখন শুরু হয়েছে শারিরীক নির্যাতন। গতরাতে কিভাবে গলাটিপে হত্যার চেষ্টা হয়েছে সবই তৌফিক সাহেবকে খুলে বলে সুমা। তৌফিক সাহেবের অর্ডারে তৌফিক গ্রুপের পিওনরা কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাসা ঠিক করে সুমাকে বাসায় উঠিয়ে দিয়ে আসে। সন্ধ্যার মধ্যেই ঘরে চলে আসে আলমিরা, খাট, ফ্রিজ, টিভিসহ সব জিনিসপত্র। নিয়মিত বাসায় আসতে থাকে তৌফিক সাহেবের বড় বড় বাজার। বাজার আসে, তৌফিক সাহেব নিজেও আসেন, থাকেন লম্বা সময়। সুমার মা মহাখুশী, বলেন, 'এমন বাজার কোনদিন করতে পারছে ফিরোজ? শুধু লম্বা লম্বা জ্ঞানের কথাই শুনলাম, আমাকে তো ঠিকমত আম্মাও ডাকে নাই। আর তৌফিক সাহেব বয়সে আমার চেয়ে দশবছরের বড়ই হইবো, তবুও কী সুন্দর করে আম্মা আম্মা ডাকে।'

তৌফিক সাহেব বাসায় আসলে সুমার মা এগিয়ে যায়, বড় বড় মাছ, মাংস, মিষ্টির প্রশংসা করে। শুকনা রুটি আর আলুভাজি খেতে খেতে সুমার মুখ যে তিতা হয়ে গিয়েছিল সেগুলোও বলে।

সুমাকে বাসায় ফেরাতে ফিরোজের অনেক আবেদন-নিবেদন, আবেগঘন চিঠি, অনেক মানুষকে দিয়ে সুমাকে বুঝানোর চেষ্টা সব বিফল করে দিয়ে ঢাকায় আসার পাঁচ বছরের মাথায় ফিরোজ সুমার ডিভোর্স হয়।

মেয়ে মেয়েজামাই-এর ডিভোর্সে সুমার মা যতটা খুশি সুমা ততটাই অস্থির। এভাবে লুকোচুরি আর কতদিন? সুমা একটা স্থায়ী বন্ধন চায়। অধিকার নিয়ে বাঁচতে চায়। সুমা বিয়ের জন্য তৌফিক সাহেবকে চাপ দেয়। তৌফিক সাহেব বিরক্ত হয়ে বলে, 'সবকিছুই তো দিচ্ছি, শুধু তোমার একটা কাগজ দরকার তাই তো? সেটাও দিব তবে সময় বুঝে।' সুমা বলে, 'শুধু কাগজ না ধানমন্ডির বাড়ি তোমার বউয়ের নামে, ফতুল্লার কারখানা আমার নামে দিতে হবে।'

ফিরোজ সুমার ডিভোর্সের অল্প কয়েকদিন পরেই তৌফিক গ্রুপের হেড অফিসের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। তৌফিক সাহেবের ছেলে ভাতিজারা কেউ ধামধুম করে অফিসে আসে না, মন খারাপ করে একা একা আসেন তৌফিক সাহেব। সবার মধ্যে চাপা গুঞ্জন। একদিন তৌফিক সাহেব সুমাকে ডেকে বললেন, 'সুমা, অফিসে প্রবলেম চলছে, তুমি কিছুদিন বাসায় থাক, আমি ফোন করলে আবার অফিসে আসবে।' সপ্তাখানেক পর তৌফিক সাহেব সুমার রেজিগনেশন লেটার লিখে একজন পিওনকে দিয়ে সুমার বাসায় পাঠালেন সুমার সাইন আনতে। সুমার সাইন করা রেজিগনেশন অফিসে আসার পরদিন থেকে তৌফিক সাহেবের ছেলে ভাতিজারা আবার ধামধুম করে অফিসে আসা শুরু করল।

তৌফিক সাহেবের ফোনে তিস্তা ব্যাংকে সুমার চাকুরী হয়ে গেল কিন্তু বেতন অনেক কম। তৌফিক সাহেব আগের মতো আর সুমার বাসায় আসেন না, সুযোগ বুঝে বাসার বাইরে মাঝে মাঝে দেখা করেন, টাকা পয়সাও দেন, তবে খুবই অনিয়মিত। টাকা পয়সা দেয়া একদমই বন্ধ হয়ে যায় তৌফিক সাহেব হার্টের চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ একমাস সিঙ্গাপুর থাকার কারণে। সিঙ্গাপুর থেকে ফেরার পর অসুস্থ বাবাকে আর একা ছাড়েন না ছেলেরা। সব সময় স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, ভাতিজাদের কেউ না কেউ সাথে থাকেন।

নিজের সল্প আয়ে ঢাকা শহরে চলতে খুবই কষ্ট হয় সুমার। মা বলে, অনেকদিন বাজার হয় না, রুটি আর আলুভাজি আর কতদিন খাবি? উত্তর দেয়া না সুমা॥ ❑

সম্পর্ক

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরী থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব-সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দু'টি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদণ্ডই অর্জন করতে পেরেছে। তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন বিশ্বকে বিস্মিত করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ নিয়মিত বাংলাদেশে আসছেন বাংলাদেশের অর্জন কাছ থেকে দেখতে এবং বুঝতে।

দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেকর্ড পরিমান নম্বর পেয়ে পাশ করার পর পূর্ণ বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তমাল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত এসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করার জন্য তমাল বাংলাদেশে এসেছে দুই মাস হতে চললো। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক এবং পারিবারিক সম্পর্কগুলোর উপর কতটুকু প্রভাব ফেলেছে তা চিহ্নিত করতে হবে তমালকে। বই, পত্রিকা অথবা জার্নাল পড়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছালে হবে না। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তির মতামত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

ইতোমধ্যে তমাল ফিল্ড পর্যায়ের কাজ শেষ করেছে। এসাইনমেন্টের খসড়া প্রস্তুতের কাজ চলছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। ভীষণ ব্যস্ত সময় পার করছে তমাল। খসড়া প্রস্তুত করার পর তমালের বন্ধু শৈবালের সাথে খসড়া নিয়ে আলোচনা করবে তমাল। শৈবাল বাংলাদেশের একটি প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। শৈবালের সাথে আলোচনা করে, শৈবালের মতামত নিয়ে এসাইনমেন্টটি চূড়ান্ত করতে চায় তমাল।

বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কর্ণারের রুমটি তমালের স্টাডি রুম। রুমটি বেশ নিরিবিলি। এ রুমটিতে আলোচনা শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে তমাল। শৈবাল পাশে বসে আছে। তমালের মা চা এবং গরম গরম সিঙ্গারা দিয়ে গেছেন। মায়ের হাতের গরম সিঙ্গারা তমালের ভীষণ প্রিয়। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন সময়ে গরম সিঙ্গারাসহ নিজের দেশের আরও অনেক কিছু মিস্ করে তমাল। চা-সিঙ্গারা খেয়ে আলোচনা শুরু করবে ও'রা। ফিল্ড পর্যায় থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে পাল্টে যাওয়া সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের ধরণগুলো ও'দের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। শৈবাল বরাবরই মনোযোগী শ্রোতা। কোন বিষয় মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ শোনার পর ও' মন্তব্য করে। আলোচনার মাঝখানে আলোচককে থামিয়ে প্রশ্ন করার বাতিক ও'র নেই। কোন পয়েন্ট যেন ভুলে না যায় এ জন্য সব সময় কলম ও নোটবুক নিয়ে বসে ও'। আজও কলম ও নোট বুক নিয়ে বসেছে শৈবাল।

চায়ে শেষ চুমুক দিতে দিতে তমাল বলে- তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক, কি বলিস্ শৈবাল? কলেজ রোডে অবস্থিত "বই-স্বর্গ" লাইব্রেরীর মালিক মানিক ভাইয়ের মতামত দিয়ে শুরু করলাম। মানিক ভাই বলেছেন, মানুষ বর্তমানে ফেইসবুকে বেশি সময় দিচ্ছে। বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর বদলে সারাক্ষণ ফেইসবুক নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাস্তব জীবনে বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষতি হচ্ছে। বন্ধুদের আড্ডার আন্তরিকতা নষ্ট করছে ফেসবুক। দেখা যায় আড্ডার ভেতরেই কেউ কেউ বুঁদ হয়ে আছে ফেসবুকে। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে ট্রল বা মিমের মাধ্যমে এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে আক্রমণ করছে। অথচ বাস্তব জীবনে তাদের সম্পর্ক হয়তো মোটেও আক্রমণাত্মক নয়। সামাজিক মাধ্যমে নিছক মজা করতে গিয়ে শুরু হচ্ছে বাস্তব জীবনের সামাজিক দ্বন্দ্ব। আর এ দ্বন্দ্বের বলি হচ্ছে সম্পর্ক।

মানিক ভাইয়ের মতামতটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তাই হুবহু উপস্থাপন করলাম। এ বিষয়ে তোর কি কোন মন্তব্য আছে শৈবাল?

আমিও মানিক ভাইয়ের মতামতের সাথে একমত। সত্যিই ফেইসবুক বর্তমানে আমাদের সমাজ ও পরিবারে দুষ্ট ক্ষতের মতো কাজ করছে। ফেইসবুক-এর ইতিবাচক দিকের তুলনায় নেতিবাচক দিকগুলোই আমাদের সমাজ ও পরিবারকে বেশি প্রভাবিত করছে। তবে মানিক ভাইয়ের মতামতের সাথে আমি আরও একটি বিষয় যোগ করতে চাই। তা হলো স্মার্ট ফোন। স্মার্ট ফোনের অপব্যবহারের ফলে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে আমি মনে করি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছাড়াও স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে মানুষ অন-লাইন গেমসহ অন্যান্য তথাকথিত বিনোদন মাধ্যমের প্রতি আসক্ত হচ্ছে। স্মার্টফোনই তাদের সব সময়ের সাথী হয়ে ওঠছে। একই বাসায় অবস্থান করে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান কেউ কারও সাথে কথা বলছে না। স্মার্ট ফোনের জন্য বেশি সময় বরাদ্দ রাখার কারণে অন্যান্য কাজগুলো কম সময়ে যেনতেনভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। পারিবারিক এবং সামাজিক বন্ধন গুরুত্ব হারাচ্ছে। পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একদম ঠিক বলেছিস্ শৈবাল। তোর কথাগুলো আমি যোগ করে নিলাম। এবার আমি পরের মতামতটি নিয়ে কথা বলবো। এ মতামতটি দিয়েছেন আমাদের স্থানীয় কলেজের একজন শিক্ষক। তিনি আমাকে তার নাম বলতে মানা করেছেন। তাই তাঁর নাম বললাম না। তিনি বলেছেন- অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সন্তানদের সাথে মা-বাবার সম্পর্ক। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফলে ছেলেরা আধুনিক ফ্লাট অথবা বাড়িতে বসবাস করছে। আধুনিক ফ্লাট বা বাড়িগুলোতে আধুনিক ছেলে, ছেলে-বৌ এবং নাতি-নাতনীদের সাথে সে-কেলে বাবা অথবা মা বড়ই বে-মানান! তাই বাবা-মাকে বাসায় রাখা নিয়ে ছেলের সংসারে অশান্তি হচ্ছে। পিতা-মাতার সাথে সন্তানের যে চিরন্তন সম্পর্ক তা আর থাকছে না। বৃদ্ধ বয়সে অনেক বাবা-মা'র স্থান হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে। দেশে দিন দিন বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলেজের শিক্ষকটি যখন আমাকে ভারতীয় সংগীত শিল্পী নচিকেতার 'বৃদ্ধাশ্রম' গানটি শোনালেন আমি আমার চোখের পানি আটকাতে পারিনি।

কলেজ শিক্ষক সঠিক কথাই বলেছেন। পরিবারের কোন ছেলে বা মেয়ে বাড়ি, গাড়ি এবং ফ্লাটের মালিক হওয়ার কারণে বর্তমানে আরও কিছু ঘটনা ঘটছে। তুই শুনতে চাইলে বলতে পারি। শৈবাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তমালের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ, বল শৈবাল। তোর অভিজ্ঞতাগুলো আমার খুব কাজে লাগবে।

ঐশধামে যাত্রার অষ্টম বার্ষিকী

প্রয়াত মার্গারেট পেরেরা

জন্ম: ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ এপ্রিল, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

তোমাকে ছাড়া আমরা বড় অসহায়;
বেঁচে আছি শুধু তোমার স্মৃতি নিয়ে

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মাঝে। আমাদের হৃদয় থেকে হারিয়ে যাওনি তুমি। তোমার শিক্ষা ও আদর্শ আমাদের জীবন চলার পথের পাথেয়। তোমার অস্তিত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আমাদের জীবন চলার মাঝে।

দেখতে দেখতে আটটি বৎসর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার অনন্তধামে আশ্রয় নিয়েছো। তুমি যেদিন চলে গেলে সেদিন ছিল রবিবার, ঐশ করুণার পার্বণ দিন। তুমি সরল বিশ্বাসী ছিলে বিধায় ঈশ্বর এমনি একটা বিশিষ্ট পার্বণ দিনে তোমাকে তার কাছে তুলে নিলেন। তবে একটি মুহূর্তের জন্যও আমরা ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না কোনদিন। তোমার স্মৃতি চির ভাস্বর আমাদের সবার হৃদয়ে। গ্রামবাসীরাও তোমাকে ভুলতে পারেনি। তবে সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে তুমি পরম পিতার ভালবাসার আশ্রয়ে রয়েছ।

তোমার মৃত্যুর মাত্র ১০ মাস ২০ দিন পর তোমার বড় ছেলে (খ্রীষ্টফার সমীর গমেজ) পরপারে চলে যায়। আর তাই তোমার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী ও তোমার বড় ছেলের *চল্লিশা* একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এত অল্প সময় ব্যবধানে তোমাদেরকে হারিয়ে আমরা বড় নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে পড়েছি।

ব্যক্তিগত জীবনে মার্গারেট পেরেরা খুবই সহজ-সরল-বিনয়ী, কষ্ট সহিষ্ণু, ঈশ্বর নির্ভরশীল ও অতিথিপরায়ন ছিলেন যা এখনও আমরা সদা অনুভব করি। তিনি সেনা সংঘের একজন সদস্যা ছিলেন। নিয়মিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও প্রতিদিন একাধিকবার রোজারিমালা প্রার্থনা করতেন। আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ খবরাদি নেয়া ও তাদের পরিদর্শন তার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। যদিও নিজে তেমন লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি, তথাপি সন্তানদের সর্বদাই লেখাপড়ায় অনুপ্রাণিত করেছেন এবং সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখেও যেতে পেরেছেন।

স্বর্গধাম থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন শত প্রতিকূলতার মাঝেও তোমার দেখানো আদর্শ পথে আমরা চলতে পারি। প্রেমময় পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই আদরের

মেয়ে-মেয়ে জামাই: লিলি-মন্টু

ছেলে-ছেলে বৌ: প্রয়াত খ্রীষ্টফার সমীর-সবিতা, ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ, অমল-অনিমা

নাতি-নাতনি: শংকর-নিপা, সাগর-রিবিকা, সজল-বীথি, সুজন-সিলভিয়া, শৈবাল-ফাল্গুনী, বৃষ্টি-মামুন, অনিক, অমিত, অর্ণব

পুতি-পুতিন: সুজানা, সায়ানা, সামারা, সৃজন, শুভ, দুরন্ত, দুর্জয় , আরিয়া

বিজ্ঞ/১২৪২০২৩

অনন্ত বিশ্রাম দাও তারে

প্রয়াত জর্জ যোসেফ গমেজ
জন্ম : ৮ অক্টোবর, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ মার্চ, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
বোয়ালী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর
তুমিলিয়া মিশন।

প্রিয় ঠাকুর দা,

তুমি ছিলে একজন আদর্শবান, জ্ঞানী, সত্য সাধক ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ মানুষ। আমাদের পরিবারে তথা সমাজের জন্য তুমি ছিলে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তোমার অগাধ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সততা ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের জন্য মানুষ আজও তোমাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তুমি ছিলে একজন স্বনামধন্য সঙ্গীত রচয়িতা, সুরকার ও গায়ক। তোমার রচিত যিশু খ্রিস্টের যাতনাভোগের গান (কষ্টের গান) সাধু আন্তনীর পাল গান, বৈঠকী গান, কীর্তণ ও জারিগান খ্রিস্টান সমাজে এখনও ব্যাপক সমাদৃত। আমরা সৌভাগ্যবান তোমার পরিবারে জন্মগ্রহণের আশীর্বাদ আমরা প্রভুর নিকট থেকে পেয়েছি। তোমার সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়ে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি। তোমার সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত, শিক্ষা ও নির্দেশনা আজও আমাদের পথের পাথেয় হয়ে আছে। আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে প্রভুর সান্নিধ্যে আছো এবং তোমার সঙ্গে আছে আমাদের বাবা, ছোট ভাই, ঠাকুরমা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। এই কন্টকময় পৃথিবীতে আমরা যেন শেষ পর্যন্ত তোমার আদর্শ অনুসরণ করে যেতে পারি। এই প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কামনা করে–

তোমার আশীষ ধন্য

নাতি : দোলন যোসেফ গমেজ
নাতি বৌ : জ্যাকলিন গমেজ
নাতনী ও জামাই : জুঁই ট্রিনিটা গমেজ ও শেখর গমেজ, ববি মারীয়া গমেজ ও উজ্জ্বল দরেছ
নাতি ও নাতনীর ছেলে মেয়ে : ঝুমঝুম এগ্নেস, মাধুর্য আন্তনী
মুগ্ধ ম্যাথিও, সমৃদ্ধ আন্তনী (শুদ্ধ) ও রিনঝিন
তোমার ছেলে বউ : আগ্নেশ স্কলাস্টিকা গমেজ
ছেলে : স্বর্গীয় নীহার আন্তনী গমেজ
মেয়ে : সিস্টার মেরী মিটিল্ডা গমেজ এসএমআরএ
সিস্টার মেরী ক্লটিল্ডা গমেজ এসএমআরএ ও আত্মীয়স্বজন

তুমি রবে নীরবে

প্রয়াত নীহার আন্তনী গমেজ
জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ এপ্রিল, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ
বোয়ালী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর
তুমিলিয়া মিশন

প্রিয় বাবা,

এখনও প্রতিটি মুহূর্তে আমরা অভাব অনুভব করি। সাতাশ বছর পূর্বে তুমি যখন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে। এই বিশাল পৃথিবীতে আমরা ছিলাম দিশেহারা। তোমার স্নেহমাখা মুখ, ভালবাসার পরশ আর মধুমাখা ডাক আমাদের বুকে আজও প্রতিমুহূর্তে সতেজ অম্লান। তোমাকে হারানোর কষ্ট আর শূন্যতা আমৃত্যু বয়ে যেতে হবে। তুমি ছিলে সহজ, সরল, নির্লোভ এক আদর্শবান মানুষ। ঈশ্বর কত সহজেই তোমাকে বেছে নিলেন তার বাগান সাজাতে। আমরা এই জটিল পৃথিবীতে বেঁচে আছি তোমার আদর্শ বুকে ধারণ করে। তুমি আমাদের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। আদর্শের আলোকবর্তিকা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশি, সবাই তোমাকে ভালবেসে স্মরণ করে। জানি পরম পিতার কোলে তুমি আছ আশ্রিত ও মহাসুখী। আমাদের ঠাকুর দাদা, ঠাকুর মা ও ছোট ভাই দীপংকর গমেজ (দীপু) আর তুমি নিশ্চয় স্বর্গে ঈশ্বর বন্দনায় অবিরামরত। পৃথিবীতে আমাদের প্রিয় মাকে নিয়ে তোমার দেখানো আদর্শের পথে আমৃত্যু হেঁটে যেতে চাই। মা প্রতি মুহূর্তে তার ভালবাসার আঁচলে আমাদের ঢেকে রাখে। তোমার অভাব পূরণের চেষ্টা করে। তুমি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ যাচনা কর যেন আমাদের মা, আত্মীয়-স্বজন ও তোমার নাতনী ও নাতিনদের নিয়ে সুন্দর খ্রিস্টীয় জীবনযাপন করতে পারি। ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ যে, তোমার মত আদর্শবান বাবার সন্তান জন্মানোর সৌভাগ্য দিয়েছেন। এ ভালবাসা সীমাহীন আকাশের মত।

তোমার স্নেহের

আমাদের মা : আগ্নেশ স্কলাস্টিকা গমেজ
ছেলে : দোলন যোসেফ গমেজ
ছেলে বৌ : জ্যাকলিন গমেজ
মেয়ে ও জামাই : জুঁই ট্রিনিটা গমেজ ও শেখর গমেজ
ববি মারীয়া গমেজ ও উজ্জ্বল দরেছ
নাতনী : ঝুমঝুম এগ্নেস গমেজ ও রিনঝিন দরেছ
নাতি : মাধুর্য আন্তনী, মুগ্ধ ম্যাথিও ও সমৃদ্ধ আন্তনী (শুদ্ধ)

বিজ্ঞ/১০৬/২০২৩

শৈবাল বলে, মনে কর, পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনজনের ফ্লাট বা বাড়ি এবং গাড়ি আছে। দুই ভাই-বোনের নেই। ফ্লাট, বাড়ি, গাড়ির মালিক তিনজনের সাথে বাকি দুই ভাই-বোনের দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। ফ্লাট, বাড়ি, গাড়ির মালিক ভাই-বোনদের চলাফেরা, বন্ধু-বান্ধবদের আভিজাত্য, শপিং করা, রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়ার সাথে বাকি দুই ভাই-বোন তাল মেলাতে পারে না। তিন ভাই-বোনের সামনে তারা বড়ই বেমানান। সংসারে চলার পথে এক সময় তারা ঠিকই তাদের করণীয় বুঝতে পারে। উঁচুতে উঠে যাওয়া ভাই-বোনদের তারা বিব্রত করতে চায় না। ফলে ভাই-বোনের সম্পর্ক আর আগের মতো থাকে না। এইতো গত সপ্তায় আমার এক বন্ধু আমাকে বলছিলো- আমরা অনেক সময় অর্থ-বিত্তের মালিক ক্ষমতাবান আত্মীয়দের পরিচয় দিয়ে সমাজে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করি। এ ধরণের চেষ্টা করার আগে আমাদের খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার ঐ ক্ষমতাবান আত্মীয়রা আমাদেরকে তাদের আত্মীয় পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে কিনা।

অনেক ধন্যবাদ শৈবাল। তোর নিকট থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য পাচ্ছি। যা আমি ফিল্ড পর্যায় থেকে পাইনি। এখন আমি যার মতামত নিয়ে কথা বলবো তিনি আমাদের স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সনাতন স্যার। তিনি বলেছেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পারিবারিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করার পাশাপাশি সামাজিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করেছে ভীষণভাবে। সমাজে কোন ব্যক্তির সাথে কোন ব্যক্তির সম্পর্ক হবে তা নির্ধারিত হচ্ছে অর্থ-বিত্ত দ্বারা। অর্থ-বিত্তের মালিকদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠছে। অন্যরা দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থ-বিত্তের মালিকেরা সামাজিকসহ, জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলো দখল করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা-দীক্ষা, নৈতিকতা এবং সততার কোন মূল্য নেই। অর্থ-বিত্তই সকল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে। একজন লোক কিভাবে অর্থ-বিত্তের মালিক হচ্ছে- তা নিয়ে কারও কোন প্রশ্ন নেই। লুট-পাট, দুর্নীতিসহ যেনতেনভাবে অর্থ-বিত্তের মালিক হওয়াকেই বর্তমানে 'সফলতা' বলা হচ্ছে। 'যোগ্যতা' বলা হচ্ছে। 'সৎ' জীবন-যাপন করাটা বর্তমানে 'বোকা'দের কাজ। 'অযোগ্য'দের কাজ। 'আত্মার' সম্পর্ক, 'হৃদয়ের' সম্পর্ক একথাগুলো বর্তমান প্রজন্মের নিকট বড়ই সেকেলে শোনায়।

সনাতন স্যার আরও বলেছেন, স্কুল-কলেজে শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যকার মধুর সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে অর্থ-বিত্তের কারণে। যে ছাত্রটি একাধিক বিষয়ে কোচিং করছে, শিক্ষককে বিভিন্ন সময়ে দামী উপহার দিতে পারছে তার সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক গড়ে ওঠছে। ক্লাশের দরিদ্র ছাত্রটি দুইভাবে অবহেলার শিকার হচ্ছে। প্রথমতঃ শিক্ষকদের দ্বারা দ্বিতীয়ত: অর্থ-বিত্তের মালিক ক্লাশমেটদের দ্বারা। গাড়ি, বাড়ির মালিক ক্লাশ-মেট এবং অভিভাবকদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠছে। তারা নানা উছিলায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছে। দামী রেস্টুরেন্টে খাচ্ছে। ব্র্যান্ডের জিনিস ব্যবহার করছে। দরিদ্র ক্লাশমেটরা এদের কাছে পাত্তাই পাচ্ছে না। এরা নানা উছিলায় প্রায়শঃ দরিদ্র ক্লাশমেটদের দরিদ্রতা নিয়ে উপহাস করছে।

আজ এ পর্যন্তই থাক শৈবাল। আগামীকাল আবার বসবো, তমাল বলে।

ঠিক আছে, আগামীকাল আমার হাতে সময় আছে। বসা যাবে। তবে আজ তোকে একটি অনুরোধ করবো, তমাল। রাখবি তো?

তুই আমার প্রাণের বন্ধু। তোর অনুরোধ রাখবো না তো কারটা রাখবো? বল, কি তোর অনুরোধ?

তাহলে শোন, শৈবাল বলা শুরু করে-

কোন একটি দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায় অতিবাহিত করার সময় সমাজ এবং পরিবারে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। অনেক ধরণের বত্যয় চোখে পড়ে। অর্থ-বিত্ত দ্বারা প্রায় সকল কিছু পরিমাপ করার চেষ্টা হয়। আমাদের দেশেও তেমনটা হচ্ছে হয়তো-বা। শুধু সমস্যা চিহ্নিত করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসাইনমেন্ট জমা দিয়ে ভাল নম্বর পেয়ে খুশী থাকলে চলবে না তমাল। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো কিভাবে তাদের দেশের এ অস্থির সময়টা পার করেছে, কিভাবে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের ফাটল মেরামত করেছে তা জানতে হবে। বুঝতে হবে। সে অনুযায়ী আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে তোকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

আরেকটা কথা, তুইতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিস। তোর পড়াশুনার জন্য তোর বাবার তেমন একটা অর্থ ব্যয় হয়নি বললেই চলে। তার মানে তোর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পেছনে আমাদের দেশের সরকার অর্থাৎ জনগণের টাকা ব্যয় হয়েছে। তাহলে এদেশের প্রতি এদেশের জনগণের প্রতি তোর নিশ্চয় দায় আছে। তুই এ দায় এড়ানোর ছেলে না আমি জানি। তুই নিশ্চয়ই এ দায় মেটানোর চেষ্টা করবি, তমাল। তোর প্রতি আমার এ বিশ্বাসটুকু আছে।

ঠিকই বলেছিস শৈবাল। আমারও এমনটা মনে হয়েছে। আমাদের কিছু একটা করতে হবে। আমি যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে আমার ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের সাথে কথা বলবো। তাদেরকে অনুরোধ করবো তারা যেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে ভেঙ্গে পড়া পারিবারিক এবং সামাজিক সম্পর্কগুলোকে কিভাবে জোড়া লাগানো যায় সে ব্যাপারে কাজ করার জন্য আমাকে এসাইনমেন্ট দেয়। এসাইনমেন্ট নিয়ে আমি আবার দেশে আসবো এবং সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় বের করার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করবো। আর আমি পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ শেষে আমি দেশে ফিরে দেশের জন্য কিছু করার চেষ্টা করবো। জনগণের প্রতি আমার দায় মেটানোর চেষ্টা করবো।

সাব্বাস বন্ধু। আমি নিশ্চিত, তোর হাত দিয়ে অবশ্যই ভাল কিছু অর্জিত হবে।

অর্জন-টর্জন রেখে তোরা খেতে আয়। অনেক রাত হয়েছে। সবাই তোদের জন্য ডাইনিং টেবিলে অপেক্ষা করছে। মায়ের ডাকে ও'দের টনক নড়ে। তাইতো, অনেক রাত হয়েছে। সকালে বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের নিকট যেতে হবে। খাবার টেবিলে বাবা এবং ভাই-বোনেরা অপেক্ষা করছে। ভাই-বোনদের তুলনায় অবস্থানগত দিক দিয়ে তমাল বেশ এগিয়ে আছে। তমাল সেটা ও'র ভাই-বোনদের কখনো বুঝতে দেয় না। ভাই-বোনের মধ্যকার মধুর সম্পর্ক কোন কারণে নষ্ট হোক তা চায় না তমাল। তমাল এবং শৈবাল খালি চেয়ার টেনে বসে। বাবা-মা, ভাই-বোনদের মধ্যকার আন্তরিক এবং নিবিড় সম্পর্কের দ্যুতিতে ডাইনিং রুমটি আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে॥ ❑

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!!

জেন কুমকুম ডি'ক্রুজ রচিত গল্প গ্রন্থ **"মাঘ ফাগুনের গল্পগাথা"** সাপ্তাহিক প্রতিবেশী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১৫ এপ্রিলের পর বইটি প্রতিবেশী প্রকাশনীতে পাওয়া যাবে। আজই খোঁজ করুন।

রক্ত

সাগর কোড়াইয়া

মেডিকেলে পরিচিত একজনকে রক্ত দিয়ে বাইরে এলাম। অনেকে বলছিলো, একটু বিশ্রাম নিয়ে বের হলে ভালো হতো। কারো কথা শুনিনি। বিস্কুট ও জুসের বোতলটা তেমনি হাতে ধরা আছে। অনেকে হাতের দিকে তাকাচ্ছে। হয়তো বুঝতে পেরেছে এইমাত্র রক্ত দিয়ে বের হয়েছি।

মেডিকেলের সামনে দাঁড়ালাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম শরীরটা ঝিমঝিম করছে কিনা! সে রকম কোন লক্ষণ মনে হলো না। আকাশের দিকে তাকালাম। কাকগুলো কা কা শব্দে উড়ে যাচ্ছে। আবার অনেক কাক এসে গাছের ডালে বসছে। একজোড়া দম্পত্তি অটো রিকশা থেকে নামতেই কাক ওর শুভ কাজটি পুরুষটির শার্টে সেরে ফেলেছে। লোকটি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে দিলো।

দেখে আমার হাসি পেলো খুব। ভদ্রতাশোভিত হবে না ভেবে কোন রকমে হাসি লুকালাম। লোকটি হয়তো বুঝতে পেরেছে। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে চলে গেলো। এরপর খুব করে হেসে নিলাম। শেষ কবে রক্ত দিয়েছি মনে করতে চেষ্টা করি। কোন ভাবেই মনে করতে পারছি না।

তবে কি রক্ত দেবার কারণে স্মৃতিশক্তি লোপ পেলো! মজার ব্যাপার আজ নিয়ে কতবার রক্ত দিয়েছি তা হিসাব কষে বের করে ফেললাম। আজ নিয়ে উনিশবার। বিশ্ব রেকর্ড গড়া যায় কিনা ভাবছি। একবার কথায় কথায় একজনকে রক্ত দেবার সংখ্যাটি বলতে বলেছিলো, তাই তো বলি আপনার স্বাস্থ্য এতো ভালো কেন!

রক্ত দেবার কারণে স্বাস্থ্য ভালো কিনা জানি না তবে শরীরের প্রতি যত্নটাই হচ্ছে আসল।

ডিগ্রী পড়ার প্রাক্কালেও আমার রক্তের গ্রুপ সমন্ধে জানতাম না। কখনো জানার প্রয়োজনবোধ করিনি। ছোটবেলায় কতবার শরীরের বিভিন্ন অংশ কেঁটেছে। রক্ত বেরিয়েছে বগ্‌বগিয়ে। দৌড়ে গাঁদা ফুলের পাতা ও দূর্বাঘাসের রস লাগিয়ে দিয়েছি। মুহূর্তে রক্তপড়া বন্ধ। স্যাবলন এসেছে আরো পরে। স্যাবলনের গন্ধটা চমৎকার লাগতো। কাঁটাস্থানে স্যাবলন লাগালে মশার কামড়ের মতো ব্যথা হতো প্রথমে। ঘুণাক্ষরেও রক্তের গুরুত্ব সে সময় বুঝিনি। মুরগী, খাসি, গরু ও অন্যান্য প্রাণী জবাই করার পর রক্ত দেখে কৌতুহল জাগে সবার রক্ত কেন লাল!

একটা সময় রক্ত দিয়ে প্রেমপত্র লেখা স্কুলপড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা পায়। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু একবার ওকে লেখা একটি মেয়ের প্রেমপত্র এনে দেখায়। দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম লাল কালিতে লেখা। ভুল ভাঙ্গলো বন্ধুর কথায়। মেয়েটি নাকি ব্লেড দিয়ে হাত কেটে চিঠিটা লিখেছে। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। পরে বেশ কয়েকটি কারণে বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম। কিভাবে ব্লেড দিয়ে নিজের হাত কেটেছে ভাবতেই আমার শরীর শিহরিয়ে উঠে।

আমার রক্তের গ্রুপ জানার ঘটনাটিও বেশ মজার। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে রমনা পার্কে বিনা খরচে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করানো দেখে প্রথমে আমার আগ্রহ জাগে। এক বড় ভাইয়ের সাথে রক্তের পরীক্ষা স্থানে যাই। অনেককে লাইনে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করতে দেখে আগ্রহ আরো বেড়ে গেলো। সুইয়ের খোঁচায় আঙ্গুল থেকে রক্ত বের করে পরীক্ষা করতে দেখে নিজের শরীর শিউরিয়ে উঠে। লাইন যত এগিয়ে যেতে থাকে ততই আমার ভয় বাড়ছে বুঝতে পারলাম।

অবশেষে ভয়ে রক্ত পরীক্ষা না করিয়েই সেখান থেকে চলে গেলাম। আমার সঙ্গে আসা বড় ভাইয়ের সে কি রাগ! শুধু শুধু বড় ভাইকে হয়রানি করানো। রমনা পার্ক থেকে বের হওয়ার সময় ভাবলাম, রক্ত পরীক্ষার এ রকম সুযোগ আর কখনো পাবো কিনা জানি না। ভয়ে ভয়ে বড় ভাইকে বললাম, এবার রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করেই ছাড়বো।

যেই বলা সেই কাজ। ততক্ষণাৎ আবার ফিরে আসি। লাইনে দাঁড়াই। দীর্ঘ সময় পর আমার রক্ত দেবার পালা আসে। বুঝতে পারি শরীর কাঁপছে। সামনে রাখা চেয়ারে বসি। হাত বাড়িয়ে চোখ বন্ধ করে অন্য দিকে মাথা ঘুরিয়ে থাকি। এই বুঝি সুইয়ের ফলাটা আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকে গেল। গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে। আমার হাতের আঙ্গুলগুলো যে থরথর করে কাঁপছে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। আমার অবস্থা দেখে সবাই সেকি হাসি।

দায়িত্বরত লোকটি বললো, ভাই উঠেন।

আমি বললাম, কেন, রক্ত নিবেন না?

রক্ত নেওয়া তো শেষ।

শুনে আমি তো থ বনে গেলাম। কিছুই বুঝলাম না; এরই মধ্যে রক্ত নেওয়া শেষ! অদ্ভূত কাণ্ড তো! কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম। নিজের রক্তের গ্রুপ জানার পর থেকে নিজের মধ্যে অন্য রকম একটা ভালো লাগা কাজ করতে থাকে। নিজের সাথে নতুনভাবে পরিচিত হলাম বলে মনে হলো।

এরপর সুযোগ পেলেই রক্ত দিতে শুরু করি। আমার রক্ত অন্যের শরীরে প্রবেশ করছে ভাবতেই অন্য রকম একটা অনুভূতির জন্ম নেয়। এ বুঝি রক্তের আত্মিয় হয়ে গেলাম।

একবার মগবাজারের একটি ক্লিনিকে সিনিয়র এক ভাইয়ের সাথে ছোট একটি ছেলের জন্য রক্ত দিতে গিয়েছি। রক্ত দেওয়া শেষ। আমাদের জুসের বোতল দেওয়া হলো। আমি তৃপ্তির ঢেকুর তুলে খেয়ে নিলাম। দেখি সিনিয়র ভাইটি জুস না খেয়ে ময়লার ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করতেই জানালো খাবে না।

আমি শুনে অবাক! বলে কি? কতবার যে খাওয়ার অনুরোধ করলাম। কে শুনে কার কথা। অবশেষে না খাওয়ার রহস্য উৎঘাটন করতে সক্ষম হলাম। সিনিয়র ভাইয়ের সিগারেট খাওয়ার নেশা জেগেছে। আমিও চালাকি করে সিনিয়র ভাইকে নিয়ে রিকশায় চড়ে বসলাম। প্রতিশ্রুতি দিয়েছি কাকরাইল গিয়ে পৌঁছে সিগারেট খাওয়ার সুযোগ দিবো। কাকরাইল এসে পৌঁছালাম। অবশ্য আগেই রিকশাওয়ালাকে গোপন সঙ্কেতে বলে দিয়েছিলাম যেন রিকশা না থামায়। রিকশাওয়ালা নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো।

কাকরাইল এসে কত কাকুতি মিনতি যেন রিকশা থামাই। আমিও ধনুক ভাঙ্গা পণ করে বসে আছি। না শোনার ভান করে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখি। রিকশা নিয়ে সোজা গন্তব্যস্থলে চলে এলাম। রিকশা থেকে নেমে সিনিয়র ভাইয়ের সে কি রাগ। প্রায় একমাস যাবৎ আমার সাথে কথা বলা বন্ধ ছিলো।

রক্ত দেবার সময় প্রথম প্রথম ভয় পেতাম। ধীরে ধীরে সে ভয় দূর হয়েছে। একবার রাতের বেলা স্কয়ার হাসপাতালে রক্ত দিতে যাই। রক্ত দেবার পূর্বে সে কত ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা। ম্যাচিং হয় কিনা দেখবার জন্য প্রথমে সামান্য রক্ত দিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা। আমার বিরক্তির শেষ নেই। বসে আছি তো আছিই। এসির বাতাসে শীত লাগছে। শরীরের রক্ত জমে যাবার অবস্থা। এদিকে রাতও বাড়ছে। ভাবছি ম্যাচিং না হলেই বরং ভালো। অবশেষে চারজনের মধ্যে আমাদের দু'জনের রক্ত ম্যাচিং হয়। রক্ত দিতে গিয়ে আমার শরীরে কাঁপন ধরে যায়।

সে রাতেই আবার ফিরে আসি। পরদিন থেকে শরীরে প্রচণ্ড জ্বর। এক সপ্তাহ ভুগে তবে সুস্থ হয়ে উঠি। ততদিনে শরীর ভেঙ্গে গিয়েছে।

রক্ত দেবার এ রকম আরো বহু ঘটনা আছে। রক্ত পাবার আশায় মানুষের পাগলপ্রায় হবার অবস্থা দেখে খারাপই লাগে। যদি সম্ভব হতো অসহায় মানুষগুলোকে একাধিক ব্যাগ রক্তই দিয়ে দিতাম। কিন্তু তা তো কখনো সম্ভব নয়।

রক্ত দেবার পর অনেকের আন্তরিকতা দেখে ভালোই লাগে। সবাই ঠিকানা রেখে দেয়। সব সময় যোগাযোগ রাখবে বলে। তখন বড় আপন মনে হয় সবাইকে। তবে সময়ের পরিক্রমায় সবাই ভুলে যায়।

শরীরে রক্ত না দিয়েও তো ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করতে পারতেন! রক্তবিহীন কি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যেতো না! যাই হোক সেটা ঈশ্বরের কারুকাজি। মানুষের সেখানে কোন হস্তক্ষেপ নেই॥ ❑

গুরুমা

সুনীল পেরেরা

শহর থেকে সেই কাকডাকা ভোরে রওনা দেয় বান্দরবানের এই পাহাড়ি এলাকায় অচেনা-অজানা স্থানটি খুঁজতে খুজতে বিকেল গড়িয়ে গেল। অবশেষে নদীর ঝাঁক ঘুরে, তিনটি পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যে ছেলেটি আমাকে পথ চিনিয়ে এখানে নিয়ে এলো তার ডান হাতের দু'টি আঙ্গুল নেই। ছেলেটির নাম শশী। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে গুলি খাওয়া শুকরের সামনে পড়ে গিয়েছিল। আহত পশুটিকে ঝাপটে ধরতেই তার হাতের দু'টি আঙ্গল কামড়ে ধরে। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে পশুটি তার আঙ্গুল দু'টি কচকচিয়ে খেয়ে ফেলে। এ অবস্থায় চিৎকার শুনে তার বন্ধু চিতু এসে তাকে রক্ষা করে। তবে পশুটিকে তারা ঠিকই মেরেছিল।

শশী তার ডান হাতের তিনটি আঙ্গুল সামনে প্রসারিত করে অদূরে একটি কুটির দেখিয়ে দিল। আমার সঙ্গে তাকে যেতে বলায় সে আৎকে জিবে কামড় দিল। পরে বলল, গুরুমার সংকেত না পেলে ওখানে যাবার অনুমতি নেই। সে কারণে সে আমাকে বনের প্রান্তে একা রেখেই ফিরে যাবার আগে দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে গুরুমার উদ্দেশে তিনবার প্রণাম জানালো। তাকে কয়েকটা টাকা বখশিষ দিতে গেলে শঙ্কায় সে এমন ভাব করল যেন এই ক'টি টাকা গ্রহণ করলে গুরুমার অভিশাপে তার বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে। শেষে অনেক বুঝিয়ে একটা চকোলেট ধরিয়ে দিলাম। যাবার বেলায় সেকি কৃতজ্ঞতা। আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে জোড় হাতে শ্রদ্ধা জানালো পাহাড়ি রীতিতে।

বিকেলের পড়ন্ত বেলায় দূরে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ঢেউ খেলানো শেষবরণ পাহাড়গুলো যেন আলস্যে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারি সারি অগণিত পাহাড়। একটা ছোট্ট টিলার পা ছুঁয়ে তপোবনের সন্ন্যাসীর কুটিরের সম্মুখভাগের পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণের ন্যায় এক চিলতে উঠুনেই গুরুমার আশ্রম।

ততক্ষণে সূর্য পাহাড়ের আঁড়ালে তলিয়ে গেছে। সন্ধ্যার গৈরিক আলোয় অপরূপ লাগছে গুরুমার আশ্রমটি। আশ্রমের সামনে একটা ক্ষুদ্র জলাশয়। আকাশের খণ্ড চাঁদ পাহাড়ের তলা থেকে উঠে এসেছে। জলাশয়ের নিস্তরঙ্গ জলের উপর চাঁদের জ্যোৎস্নার একটি ক্ষীণরেখা মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। আধো আলোয় প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে দেখছি। বনের মধ্যে এই কালীসন্ধ্যায় যত না রাত হয়েছে, তার চেয়েও বেশি রাত নেমেছে যেন।

গত সাতদিন আগে আমার নামে একটা চিঠি পেলাম। চিঠিতে লেখা

"গুরুমা অসুস্থ। তার মনের শেষ বাসনা, আপনার মত একজন জীবন-সাধকের সাথে একবার সাক্ষাৎ করতে চান। যদি অনুগ্রহ করে তার আশ্রমে পদধূলি দেন তাহলে তিনি যারপর নাই খুশি হবেন। বান্দরবান শহরের বাসস্ট্যান্ডে আপনার জন্য সব ব্যবস্থা করা আছে। এখানে পৌছানোর পর একটি ছেলে আপনাকে গন্তব্যে পৌছে দেবে। আপনি হয়তো তাকে চিনবেন না কিন্তু সে আপনাকে ঠিকই চিনে নেবে। সেই ভাবেই তাকে নির্দেশনা দেওয়া আছে।"

ইতি....

ইতির পর আর কোন নাম নেই। গুরুমা কে তারও কোন পরিচয় পত্রে উল্লেখ করা হয়নি। শুধু দুর্গম পাহাড়ি এলাকার একটি গ্রামের নাম লেখা রয়েছে। মনে বারবার প্রশ্ন জেগেছে, কে এই গুরুমা? আমার সাথে এ ধরনের কোন নারীর কখনো পরিচয়ও হয়নি। কিন্তু চিঠির ভাষায় বোঝা গেল ঐ নারী আমার মনের মানুষের কেউ। আমার অন্তর-আত্মার অতল গভীর গোপন তথ্যটিও তার জানা আছে। পথ চলতে চলতে এই উপলব্ধি হয়েছে যে, একমাত্র গভীর প্রেমের টান না থাকলে এমনি অজানা দুর্গম অভিযানে কেউ আসার সাহস পাবে না।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার খেয়াল নেই। হঠাৎ করেই কুটিরে আলো জ্বলে উঠল। এবার সাহস ভরে এগিয়ে গেলাম কুটির প্রাঙ্গণে। দেখা গেল, মাটির পাত্রে তেলের সলতে লাগানো প্রদীপটি ঘরের এক কোনে একটি উচুস্থানে রাখা আছে। বাতাসে প্রদীপ শিখাটি কাঁপছে তিরতির করে। ঘরের ভেতর তপো:ক্লিষ্ট সাধিকার মত এক নারী পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সদ্যস্নাত ঝক ঝকে দেহলতা, বনজ ফুলের মৌ মৌ মিষ্টি গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। মনোমুগ্ধের ন্যায় এগিয়ে গেলাম। নারী আমাকে ইশারায় ভিতরে আসতে বলল। এবার ঘুরে দাঁড়াতেই বিস্ময়ে আমি হতবাক। ইনিই কী সেই গুরুমা? কী ধারালো কঠিন চেহারা, অর্ন্তভেদী ক্ষুরধার দৃষ্টি। চিবুকের উপর আট্‌কে থাকা এক বিন্দু জল, তার উপর মোম-মোলায়েম আলো পড়ে হীরের টুকরোর মতো চিকচিক করছে।

এ গুরুমা আমার কৈশোর-যৌবনের প্রিয় সাথী-তটিনী। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, তবে গায়ের রং ছিল দুধে-আলতা। ছোট্ট পাখির মতই ছটফটে স্বভাব। পাড়া-বেড়ানি মেয়েটা একদম ঘরে থাকতেই চাইত না। ওর ডাগর চোখে ছিল পৃথিবীর বিস্ময়। কারণে অকারণে উচ্ছল হাসিতে কিরণ ছড়িয়ে কথা বলত। আর হাসতে হাসতে ওর শরীরটা দুলে দুলে কাঁপত সেই হাসিতে আমার মতন আরও অনেকের অন্তরে কাঁপন ধরিয়ে দিত। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলত, "জানিস রাসু, মেয়েদের রূপ-যৌবন শুধু পুরুষদেরই মুগ্ধ করে না, মেয়েদেরও চোখ টানে। আমার বান্ধবীরা সবাই আমার রূপে মুগ্ধ তাই হিংসে করে।"

তবে রূপ শুধু তটিনীর শরীরেই নয়, ওর চরিত্রে, ব্যবহারে এবং মাধুর্যেও। তাকে নিয়ে কত স্বপ্নের জাল বুনেছি, কত সুখ-স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু কখনো প্রেম নিবেদন করার তাগিদ অনুভব করিনি। তার বদলে একটি মাত্র গানে তটিনীই আমাকে যৌবন চিনিয়েছিল। কোন এক বৈশাখী-চাঁদনী রাতে তার চাঁপাকলির মত হাতের আঙ্গুলে আমার হাত রেখে মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিল, "তোকে ভালোবাসি রাসু।"

এরপর হঠাৎ একদিন আমার মা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত মাকে নিয়ে ভারতের ভ্যালুরে চলে যাই। সেখানে তিন মাস মাকে নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি চলে। ভাগ্যের পরিহাস, অবশেষে মায়ের লাশ নিয়ে ফিরে এলাম। বিয়োগ-ব্যথা বুকে চেপে রেখে তটিনীর কাছে ছুটে গেলাম। তটিনী তখন স্বামীর সাথে হানিমুনে। পরে জানতে পারলাম তটিনীর এ বিয়েতে অমত ছিল, কান্নাকাটিও

করেছে বিস্তর। শিক্ষিত বিত্তবান পাত্র পেয়ে বাবা-মা অনেকটা তটিনীর অমতেই বিয়ে দিয়ে দেয়। শহুরে পাত্র, কিছুদিন পরে দু'জনে বিদেশে চলে যায়।

সংসার জীবনে মানুষের ঈর্ষার কারণেই সন্দেহের সরীসৃপটা দিনে দিনে তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। আমার সাথে তটিনীর ভালোবাসার খবরটা এক সময় তার স্বামী রাজেসের কানেও যায়। নানা অছিলায় এ নিয়ে সংসারে জ্বলে ওঠে নরকের আগুন। জীবন শুরু না হতেই তাদের স্বপ্নের সোনার সংসার ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।

তটিনী সাহসী মেয়ে। শেষ পর্যন্ত মানসিক যন্ত্রণায় টিকতে না পেরে সে নিজেই সব কিছু ছেড়ে চলে আসে। না, সে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে নি। তার স্বামী আমার কাছেও ছুটে এসেছিল চরম প্রতিহিংসায়। এ ঘটনার দশটি বছর পর্যন্ত তটিনী নামের মেয়েটির কোন সন্ধ্যান কেউ জানতে পারেনি।

বাইরে দূরন্ত বাতাসের শন্‌শন্ শব্দ গাছের পাতায় সুর-তরঙ্গের তাল তুলেছে। উর্ধ্বে আদিগন্ত আকাশ আর আকাশ, নীচে সবুজে লেপা অবারিত প্রকৃতি। এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি বলে নিজেকে খুবই বেমানান আর অসূচী মনে হচ্ছে।

নারী এবার সিক্ত কণ্ঠে বলল, "বৈরাগীর আশ্রমের মত আমার ছোট্ট কুটিরে কোথায় বসতে দেবো?" একষ্ঠ আমার কাছে স্বর্গীয় দেবদূতের কণ্ঠসম মনে হলো। অতীতের যৌবনবতী তটিনীর চেয়ে আমার সামনে দণ্ডায়মান বর্তমানের গুরুমাকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হলো।

এবার মনে জোর টেনে বললাম, "অন্তর গহীনে জীবন্ত প্রাণ-দেবতাকে লুকিয়ে রেখে, অদৃশ্য কোন দেবতার আরাধনায় দশটি বছর কাটিয়েছ? আমার তো মনে হয় ইপ্সিত দেবদর্শন তো হয়ইনি বরং নিজেকে নিজের সাথে প্রতারণা করেছ।"

আমার কথার টিপ্পনীতে তটিনীর চঞ্চল চোখ দুটো প্রাণের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্বাভাবিক কণ্ঠে সে বলল, কোন দেবতার সন্ধ্যানে আমি যোগিনী হইনি। আর ঈশ্বরকে পাবার জন্য তো জপতপ ঘরে বসেও করা যায়।"

এবার তটিনী আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, "ঈশ্বরকে দেবার মত আমার সব কিছুইতো তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। এখন তাকে দেবার মত আর যে কিছুই নেই।" লক্ষ্য করলাম, তটিনীর মুখমণ্ডলে পাতলা বিষণ্নতার ছায়া পড়েছে। স্বাভাবিক থেকে যে বঞ্চিত হয়, সে তো অস্বাভাবিকের দিকে ছুটে চলবেই। তটিনী হয়তো কিছু সময় তৃষিত হরিণীর মতো ছুটে বেরিয়েছিল অজানা গন্তব্যে। তারপর সত্য আর মিথ্যার সীমারেখা ভেঙ্গে চুরমার করে জীবনকে দাঁড় করিয়েছে একান্ত নিভৃতে।

এবার সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কী সবকিছু হারিয়ে আবার নতুন করে সবকিছু পাবার স্বপ্ন দেখো?" তটিনী আমার প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে বলল, "অতীতকে কবরে দেওয়াই ভালো। আমার কাছে অতীত বলতে কিছু নেই। যা বর্তমান তাই অতীত আর ভবিষ্যৎ। যার জীবনের কোন সীমারেখা নেই, তার তো কিছুই নেই, সবই শূন্যতায় ভরা।"

তটিনী এবার একটা পাতার মাদুর পেতে দিল। বসে তাকে যতই দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি তার কথা আর আবেগের জোর দেখে। এতো ঝড়-ঝাপটার পরও কী অসম্ভব তার মনের ত্যাজ, কী দুর্জয় তার অভিমান। জানি, মেয়েদের অভিমান এক দুর্ভেদ্য পাঁচিল। তবে তার মনের ভেতর যে শূন্যতার তেপান্তর যা বাইরে থেকে তাকে দেখে বোঝা যায় না। তাই ভাবি, মানুষের মনের স্রোত কখন কোন ধারায় যে বয়ে যায় তার কোন ঠিক নেই।

এরই মধ্যে বনে নেমে এসেছে এক রহস্যময় নিস্তব্ধতা। পাহাড়ের পাদদেশে সুউচ্চ গাছগুলো প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলোর বিবর্ণ আভা গাছের পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। তটিনীর ছিমছাম কুটিয়ে তৈজষপত্র বলতে শুধু একটা জলভরা পিতলের কলসী আর কিছু থালাবাটি, গ্লাস। ঘরের এককোণে মেঝেতে কিছু তাজা ফুল আর ধূপদানী। বুঝলাম বিদ্বেষের আগুনে পুড়ে সে দগ্ধ হয়নি, বরং পরিণত হয়েছে খাঁটি ইস্পাতে। মনের সমস্ত কষ্ট ঝেড়ে উঠি দাঁড়িয়েছে। বারবার পতনই তাকে বোধ আর বিশ্বাসে উঠে দাঁড়াতে শিখিয়েছে, পেয়েছে আত্মরূপান্তরের প্রেরণা। হয়তো একাকিত্বের তীব্র মানসিক যন্ত্রণাই তাকে শেষ করে দিচ্ছে।

তটিনীর চোখে নির্বাক ধূসর শূন্যতা। হয়তো অতীতের কোন স্মৃতি স্মরণে এসেছে। একটা বিমর্ষ নিঃশ্বাস ফেরে আচ্ছন্ন গলায় বলল, "এই পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে আকর্ষণীয় আর কী আছে বলো? অথচ এই মানুষই সবচেয়ে বিষাক্ত প্রাণী।"

তটিনীর ছলছল চোখ বেয়ে বর্ষার প্রথম বৃষ্টির মত বড় দু'ফোঁটা অশ্রু মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। তারপর প্রাণপণ ব্যাকুলতা নিয়ে আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো যে, আমি স্পষ্ট দেখলাম, তার কাঁচের মত স্বচ্ছ চোখে আমার জন্য এখনো ভালোবাসা স্থির হয়ে আছে। সে চোখে একটা অলৌকিক স্বর্গীয় উদ্ভাস ভোরের প্রথম ফোঁটা ফুলের মত লাগছে।

এবার মনকে ভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে মুখে সারল্যের হাসি ফুটিয়ে মিহি সুরে শুধালো, "তুমি কেন এমন কণ্ঠিপড়া বৈষ্ণবের মত চেহারা করেছ? কেমন যেন ঋষি ঋষি ভাব। শুনেছি ভাগ্যবতী বধূকে নিয়ে সুখের সংসার পেতেছ, তবে বৈরাগ্য কোন দুঃখে?

আমিও তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে জানতে চাইলাম, "তুমি দীক্ষিত গুরুমা হয়েছ অথচ তোমার জপ-তপের কোন আলামতই দেখছিনা। তপোবনে তো সন্ন্যাসীদের কতো সখি-শিষ্য থাকে, তোমার এখানে একগ্লাস জল দেবারও কাউকে দেখছিনা।" একথা বললাম এ কারণে যে, তোমার আশ্রমে আসার পর থেকে আমার এক গুরুমার কথা মনে পড়ছে। একবার একটা গবেষণার কাজে দিল্লী গিয়েছিলাম। সেখানে এক ব্যতিক্রমধর্মী গুরুমার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

তটিনী মৃদু হেসে বলল, "তুমি কি মাধবী গুরুমার কথা বলছ? তিনি কিন্তু আমারও গুরুমা। আমি তার কাছেই দীক্ষা নিয়েছি।"

বললাম, "গত মার্চ মাসে মাধবী গুরুমা মারা গেছেন। খবরটা শুনে আমিও কম কষ্ট পাইনি।" কথাটা বলে আমার চোখে জল এসে গেল।

এবার তটিনীর হাইমাউ করে কান্নার কথা। কিন্তু তটিনী আমার দিকে এমনভাবে ঘৃণার চোখে তাকাল যে আমি রীতিমত বিব্রত। তখন তাকে ঘটনা খুলে বললাম।

তোমার গুরুমা অর্থাৎ রানু নামের সেই মেয়েটির বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় হাসনাবাদ মিশনের একই গ্রামের খালপাড় বাড়ির সন্তান। এক সময় পরিবারের সাথে তিনি কলকাতায় চলে যান। সেখানেই ঐ অঞ্চলের এক যুবকের সাথে তার বিয়ে হয়। পরে চাকরির সুবাদে তারা দিল্লীতে চলে যান।

পারিবারিক নানা অশান্তির কারণে এক সময় দু'জনের বিচ্ছেদ ঘটে। রানু সংসার বিবাগী হয়ে নানা ঘাট ঘুরে হিমালয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীদের মাঝে স্থিত হন। দীর্ঘ সময় এই পাহাড়েই তার জীবন কাটে। দীর্ঘ সাধনার পর তিনি 'শ্রী শ্রী মাধবী মা' নাম ধারণ করে যোগিনী হয়ে আবার ফিরে আসেন দিল্লীতে। তবে স্বামীর সংসারের সাথে কোন যোগাযোগ হয়নি তার। শহরের দক্ষিণাপুরীর টনকপুর নামক স্থানে আন্তর্জাতিক মানের বিশাল আশ্রম গড়ে তোলেন। আমি যখন তার আশ্রমে গেলাম তখন পাশের কক্ষে দেখলাম বিশাল কালীমূর্তি। অসংখ্য তার ভক্তসংখ্যা। সাক্ষাৎকারের আলাপ চারিতায় খুব সতর্কভাবে অল্প কথায় আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন। জীবনের অনেক সাদা-কালো অধ্যায়ের গল্প বললেন। এক পর্যায়ে লক্ষ্য করলাম তার চোখের কোনায় বিন্দু বিন্দু জলের কণা। তিনি আমাকে তার লেখা কিছু বাংলা ইংরেজি বই উপহার দিলেন। তার বিদেশ ভ্রমণের কথা বললেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ইংরেজি ভাষায় লেকচার দেন তাদের ধ্যান-সাধনার তথ্য দিয়ে। মনে তখন প্রশ্ন জেগেছিল, সামান্য একজন গৃহবধূ কি করে এতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন? আমার মনের অবস্থা পাঠ করে গুরুমা বললেন, "সাধনায় সবই সম্ভব যদি তা মনে প্রাণে হয়। সবই তার আশীর্বাদ।" এবার গুরুমা উপরের দিকে হাত তুলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে প্রণাম জানালেন গভীর শ্রদ্ধায়। গুরুমা ভক্তদের অনেক ভূত-ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে দিল্লী এবং কলকাতায় যারা গুরুমার দর্শন পেয়েছেন তাদের অনেকেই স্বীকার করেছেন তার অলৌকিক শক্তির কথা। আমার এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমি কোন ভিন্ন দেবতার পূজো করিনা। আমার জপ-তপ সবই সেই এক প্রভুর চরণে, যাকে আমি আমার সাধনায় অন্তরে ধারণ করেছি। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর।"

তটিনীর দু'চোখে শ্রাবণের ধারা। গুরুমার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সিক্তকণ্ঠে বলল, "আমিও সেই অসীম ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকলের সঙ্গে একাত্ব হয়েই ধ্যান-সাধন করি। মানুষকে ভালোবাসার চেয়ে আর কোন বড় জপ-তপ হতে পারেনা।'

এসময় কুটিরের বাইরে খোল-করতালের মৃদু শব্দ শুনে চম্‌কে উঠি। শব্দ জলতরঙ্গের মত ক্রমেই নিকটবর্তী হতে লাগল। দেখা গেল কুটির প্রাঙ্গণে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন বালক-বালিকা আর যুবক-যুবতী বাদ্যযন্ত্র নিয়ে হাজির। তবে সংকেত পাবার অপেক্ষায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

তটিনী এবার মৃদু হাসি দিয়ে জানালো যে, এরাই তার জপ-তপ আর ধ্যান প্রার্থনার সঙ্গী। রোজ সন্ধ্যায় কুটির প্রাঙ্গণে ভজন-কীর্তন হয়। তুমি এসেছ বলে ওরা এতক্ষণ অপেক্ষা করেছে আমার আদেশের। ওরা অনেককেই দূর পাহাড়ের ওপার থেকেও আসে।

ভজন-কীর্তন শুরু হলো তটিনীর মৌন ইশারায়। সে নিজেও বাইরে বেরিয়ে এলো। একটা শিশু তাকে জোড় হাতে প্রণাম জানিয়ে হাত ধরে দলের মাঝে নিয়ে গেল। নৃত্যরত তটিনীকে অপূর্ব লাগছে। কী চমৎকার গানের কথা ও সুর। কী অপূর্ব ওদের বাদন। প্রতিটি যন্ত্রই যেন কথা বলছে। আমি তন্ময় হয়ে দেখছি। সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি স্বর্গোদ্যানে দাঁড়িয়ে আছি একপাল দেবদূতের সাথে।

ভজন শেষে ওদের মুড়ি আর বাতাসা খেতে দেওয়া হলো। যার যার কোচরে নিয়ে ওরা ঘরে ফিরে গেল। আমাকে ঘটিতে জল দেওয়া হলো। হাত মুখ ধুয়ে অপেক্ষা করছি খাবারের জন্য। আতপ চালের ভাত আর পাঁচমিশালী সবজি ভাজি ও নিরামিশ মুগ ডাল। সঙ্গে এক বাটি দুধ ও কলা। তটিনী নিজে শুধু দুধ কলা ছাড়া আর কিছুই খায়নি। এটাই তার রাতের খাবার। সব খাবারই তাদের নিজেদের উৎপাদন।

ঐ কুটিরেই মাটির বিছানায় আমার শয্যা দেওয়া হলো। তটিনী চলে গেল অদূরে বনের মাঝে এক ভক্তের কুটিরে। আমার প্রয়োজন ও নিরাপত্তার জন্য রাখা হলো দু'টো যুবককে। ওরা সারারাত গাছতলায় আমার প্রহরায় থাকল।

পরদিন বিদায়ের আগে তটিনী আমার বুকে মাথা রেখে কাঁদল অনেকক্ষণ। বিনীত প্রার্থনা জানালো, যেন এই সব অবহেলিত জনগণের মাঝে বিশ্বাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পাহাড়ের আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তটিনী তার ডান হাতটি আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় উচুতে তুলে রাখল ঠিক গুরুমার মতই।

এ ঘটনার ঠিক এক বছর পর আবার একটা চিঠি পেলাম তটিনীর আশ্রম থেকে। প্রথম চিঠিটা তটিনী নিজেই লিখেছে নিজের নাম না দিয়ে। কিন্তু এবারের চিঠি লিখেছে শশী। চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই, হাতের লেখাও ভিন্ন।

"গুরুমার অজান্তে এই চিঠি লিখছি। জানি, এর জন্য আমাকে শাস্তি পেতে হবে। আপনি চলে যাবার পর গুরুমা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক সময় তিনি আর ভজন-কীর্তনেও অংশ নিতে পারেন না। চিকিৎসা চলছে কিন্তু রোগ সারার কোন লক্ষণ নেই। কবিরাজ মহাশয় বলেছে এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। একমাত্র রোগি নিজেই পারে তার চিকিৎসা করতে। এটা মানসিক রোগ।

এই অবস্থায় আপনাকে চিঠি লিখতে বলেছিলাম কিন্তু তিনি রাজী হননি, উপরন্তু আমি তিরস্কৃত হয়েছিলাম। অবশেষে গুরুমার অবস্থা অনুধাবন করে নিজেই লিখতে বাধ্য হচ্ছি। এই চিঠি যখন আপনার কাছে পৌঁছাবে তখন হয়তো ইহজগতে মা আর বেঁচে থাকবেন কিনা জানি না। কবিরাজ মহাশয় অবশ্য আমাদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বলছেন, মা গভীর ঘুমে অচেতন। তবে আমার বিশ্বাস মা আর কোন দিন চোখ মেলে তাকাবেন না। আমরা সাতদিন ধরে নিরবধি খ্রিস্টনাম ভজন-কীর্তন করে যাচ্ছি। গতকাল উকিল বাবু আশ্রমে এসে গুরুমার একটি উইল করা দলিল দেখালেন। উইলে লেখা রয়েছে আশ্রমের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবেন সকল সন্তানেরা। এই দলিল সপ্তাহ দুয়েক আগে সম্পন্ন হয়েছে। দলিলের শেষ অংশে পুনশ্চ দিয়ে লেখা, যেন তার মৃত্যুর পর উইলটি হস্তান্তর করা হয় আপনার মাধ্যমে। সে কারণেই আপনাকে আরেকবার আশ্রমে আসার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতি শশী

আট আঙ্গুলের শশী নামের ছেলেটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজটি সম্পন্ন করার সুযোগ দিয়েছে। তাই পত্রটি হস্তগত হবার পরদিনই গুরুমার আশ্রমের উদ্দেশে দ্বিতীয়বার যাত্রা শুরু করলাম। মনের সমস্ত কষ্ট বুকে চেপে রেখে যদি তটিনীর শেষ ইচ্ছাটি পূরণ করতে পারি তাহলে হয়তো তার আত্মা শান্তি পাবে। তটিনী নিজের জীবনের সমস্ত সুখ জলাঞ্জালি দিয়ে অবহেলিত দরিদ্র মানুষগুলোর অন্তরে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের বীজ বপন করে তাদের আলোকিত জীবনের পথে ফিরিয়ে এনেছে। এর জন্য ক্ষমাশীল পিতা তাকে কলুষমুক্ত করে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করবেন। আমার বশ্বাস, তটিনীকে দয়ালু ঈশ্বর নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন॥❑

হৃদয়ের অন্তরালে

খ্রীষ্টিনা গমেজ

ছবি: ইন্টারনেট

ভালোবাসা আর সংসার করা একই কথা নয়। এই চরম সত্যটি কণা জীবনের অনেক দীর্ঘ সময়ের পর বুঝতে পারে। আগেও যে বুঝেনি তা নয়। কিছু বলতে গেলে ওর স্বামী তমালের সাথে ঝগড়া-ঝাটি শুরু হয়ে যায়। তমাল শান্ত স্বভাবের, আর কণা হাস্যোজ্জ্বল, প্রাণবন্ত একটা মেয়ে। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সবাইকে আপন করে নিয়েছে। আশে পাশের প্রতিবেশিদের সাথেও তার সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে কোন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে সে। এটা অবশ্য মেয়েদের একটা বিশেষ গুণ, যা সৃষ্টিকর্তাই দিয়ে থাকেন। কেননা মেয়েদের জীবনটা অনেকটা পরগাছার মতই। বাবা মায়ের বাড়িতে বড় হয়ে, বাকী জীবন তাদের কাটাতে হয় শ্বশুড় বাড়িতে। তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু নিয়ে একান্ত নিজের সংসার গুছিয়ে নেয়।

তমাল ও কণার বিয়েটা হয়েছে অভিভাবকদের ইচ্ছায়, যাকে বলে (Arrange Marriage)। এখানেই যত বিপত্তি। তমালের মা এসে কণাকে দেখে পছন্দ করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে যায়। আর ছেলেকে দেখানোর জন্য এক কপি ফটো (কণার) নিয়ে যায়। ছবি দেখে তমালও বারণ করেনি। তবে বিয়ের পর এমন-অমন ইত্যাদি শুরু করে দেয়। এভাবে বিভিন্ন আকার ইঙ্গিতে কণাকে বুঝিয়ে দেয় যে, স্ত্রী হিসেবে ওকে তার পছন্দ নয়। এমনটি যাদের জীবনে হয়েছে, শুধু তারাই বুঝতে পারে এই কষ্টের পরিধি কতটুকু। একটা মেয়ে বিয়ে হয় মনে অনেক আশা, স্বপ্ন নিয়ে। নতুন পরিবেশে অচেনা একটা মানুষকে, অচেনা সবকিছুকেই আপন করে নিতে আসে। কিন্তু যখন বুঝতে পারে যে, ঐ মানুষটির মনের মত সে হতে পারেনি, তখন এক অজানা কষ্টে ওর মনটা ভরে যায়। তীর ভাঙ্গা নদীর যেমন ঢেউয়ের আঘাতে তীর ধ্বসে পরে, কণার মনের অবস্থাও ধীরে ধীরে সে রকম হতে লাগলো। বিয়ে যেহেতু হয়েই গেছে, ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তো আর কোন উপায় নেই। কণা যথেষ্ট ধৈর্য্যশীলা ও বুদ্ধিসম্পন্ন একটা মেয়ে। তাই ওর মনের কষ্টগুলো কখনো কাউকে বুঝতে দেয়নি। এমনকি তার স্বামীকেও ওর এই কষ্ট প্রকাশ করেনি। তবে কণা আঁচ করতে পারে যে, তমালের মনে অন্য কোন নারীর ছায়ামূর্তি আছে, যার কথা সে স্ত্রীর কাছে বলতে পারছে না। আবার ভিতরে চেপে রাখতেও কষ্ট ও অস্বস্তি বোধ করছে।

বিয়ের আগে কোন ছেলে বা মেয়ের জীবনে এমন কিছু ঘটতেই পারে। ভাল লাগা বা ভালোবাসা হতেই পারে। তবে প্রতিটি ছেলে বা মেয়েকে বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রীর কাছে এসব ব্যাপারে খোলাখুলি ভাবে বলে, এতে কোন সন্দেহ বা প্রতিহিংসার দাবানল স্থান পায় না। বরং অন্যের কাছ থেকে শুনলে সংসারে ছাই চাপা আগুনের মতো অশান্তি চলতে থাকে। সংসার জীবনটা সুখের/আনন্দের ছোট ছোট ভুল গুলো বড় আকার ধারণ করেই একসময় নরকে পরিণত হয়।

একসময় তমাল ও কণার সংসারে দুটো সন্তান আসে। ওরাও সন্তানদের লালন-পালনে ব্যস্ত হয়ে যায়। ভালোভাবে পড়াশুনা করিয়ে মানুষের মত মানুষ করে তুলতে ওদের শহরে নিয়ে আসে। ভাল স্কুল ও কলেজে পড়ছে ওরা। সুখ-দুঃখ নিয়েই চলছে তমাল ও কণার সংসার।

সম্প্রতি এক বিয়ে বাড়িতে স-পরিবারে বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিল ওরা। কণা হালকা সাজ গোজ পছন্দ করে। বিয়ের উপলক্ষে খোঁপায় ফুল দিয়ে মনের আনন্দে একটু সেজেছে। ও জানে, তমালের যদিও ওর সৌন্দর্যের দিকে কোন খেয়াল নেই। কণা স্থান-কাল বুঝে ওর নিজের আনন্দেই সাজ গোজ করে। ডিজিটাল যুগে এখন আর ক্যামেরা কেউ ব্যবহার করে না। মুঠোফোনেই আজকাল সবাই ছবি তোলে। ওরাও ফোনে ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে গেল। কণা ওর ছবি কেমন উঠেছে দেখার জন্য তমালের ফোনটা নিয়ে ছবি দেখতে গিয়ে ফোনে হঠাৎ এক নারীর ছবি কণাকে মুর্হূতে হতবাক করে দিল। ঐ নারীর প্রোফাইল থেকে তমাল একটি ছবি তার নিজের গ্যালারীতে বড় করে রেখে দিয়েছে। কণার আর বুঝতে বাকী রইলো না। কিছু দিন আগে ঐ নারী তমালকে Facebook-এ Friend Request পাঠিয়েছে। ব্যস, আর দেরী নেই। তার প্রোফাইলে গিয়ে সেরা ছবিটা তমাল সেভ করেছে, যেটা নিজের গ্যালারীতে সযত্নে রেখে দিয়েছে। ভালই হলো, এতে কণার কাছে তমালের মুখোশটা খুলে গেল। আসলে সবার জীবনের প্রতিটি ঘটনার পেছনে নাকি একটা ঘটনা থাকে, এটা সত্যি। কণার কাছে এবার সব পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল। কেন এই মানুষটা নিজের স্ত্রীকে আপন করে নিতে পারেনি? কারণ ঐ নারীর ছবিটাই তমালের হৃদয়ে গেঁথে আছে। এক ছবির উপর কী করে

কণার ছবি বসাবে। কি করেই বা কণাকে ভাল লাগবে। দুইজন দুই স্বত্তা যে!

এবার ঐ ভদ্র মহিলা প্রসঙ্গে একটু বলে নেই। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগের কথা। অনেক লম্বা সময় যদিও। তবে ষাটোর্দ্ধ বয়সের তমালের কাছে এখনো হয়তো সে আশির দশকেই পড়ে আছে। শরীর বুড়ো হলেও মন না কি বুড়ো হয় না। আর মনের মানুষ কখনো বুড়ো নয় নিশ্চয়ই। একটা সময় তমাল ওর মায়ের সাথে পাত্রী দেখতে যেতো এ বাড়ি ও বাড়ি। ছেলেরা সাধারণত প্রথমে মা, বোন অথবা ভাই-বৌ, এদের পাঠাতো পাত্রী দেখতে। পরে মেয়ের বাড়ি থেকে রাজী হলে ছেলে নিজে কনে দেখতে ও নিজেকে দেখাতে যেতো। ঐ মেয়েটি হয়তো ছিলো Extra Ordinary। তাই ঐ রমনীকে তমালের খুব পছন্দ হয়েছিল। তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নও দেখেছিল। পরক্ষণে, অর্থ্যাৎ ২দিন পরই কোনো কারণে তা নাকচ হয়ে যায়। মেয়ের বাড়ি থেকে না করে দেয়। কিন্তু তমাল তার মন থেকে এক বিন্দুও তাকে সরাতে পারেনি। ৪০টা বছর ধরে তাকে মনের মাঝে লালন করছে। নিজের স্ত্রীর সাথে দিনের পর দিন অভিনয় আর প্রতারণা করে দায়িত্ব আর ভালোবাসাকে একই পাল্লায় চাপিয়ে জীবন পার করেছে।

বিয়ের ব্যাপারে সব ছেলে বা মেয়েরা সাধারণত সিরিয়াস থাকে। আর তাই কোন ছেলে বা মেয়ের সম্বন্ধ ফিরিয়ে দেয়া মানে তার স্বামী বা স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা নেই, এটাই বুঝায়। আর তাই জীবদ্দশায় কেউ কারো সাথে মুখোমুখি হতে চায় না। তাছাড়া তমালকে শুধু ফিরিয়ে দেয়নি, ওর নামে নানা বদনামও রটিয়েছে। এত অপমান জনক কথাবার্তার পরও তমাল তার ঐ প্রেয়সীর সাথে দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে! Facebook এ তাকে দেখার পর থেকে তমালের মনের গোপন গভীর ভালোবাসা এবং তাকে কাছে না পাওয়ার আক্ষেপ আর মনের গহীনে দাবিয়ে রাখতে পারছে না। তাই তো স্ত্রীকেই জিজ্ঞেস করছে, তার সাথে দেখা হলে কী বলবে? কীভাবে বলবে ইত্যাদি? কতটা ব্যক্তিত্বহীন হলে এমন কথা বলতে পারে একটা পুরুষ মানুষ।

সেদিন বিয়ে বাড়ির ঐ ফটোর ঘটনা থেকে কণা কোন কিছুই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। দীর্ঘ সময় কী করে একই ছাদের নীচে একই বিছানায় জীবন পার করলো। আর সে-ই কিনা ওর সাথে এত বড় প্রতারণা করলো। অথচ এই স্বামীকে নিয়ে সে একটা সময়ে মনে মনে গর্ববোধ করতো। আমাদের সমাজে এমন মুখোশধারী অনেক তমাল আছে, যাদের দেখে চেনা যায় না। তারা সমাজে চরিত্রবান ও সুখী সেজে বসে থাকে। তাদের মনের মাঝে কয়টা নারীর স্বত্তা আছে, তারা নিজেরাই হয়তো জানে না। আর তাই তো কণার মত মেয়েরা তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে হতাশাগ্রস্ত জীবন পার করছে।

হ্যাঁ, প্রকৃতি কাউকে ছাড় দেয় না। কথাটা খুবই সত্যি। আর তাই তো সেদিন প্রাকৃতিক ভাবেই ছবিটা কণার চোখের সামনে এসে পড়েছিল। সে তো সরল বিশ্বাসে, সরলভাবেই জীবন পার করছিল। জীবনের শুরু থেকেই অবশ্য ওদের মাঝে একটা দূরত্ব ছিল, কণা সেটা ঠিকই উপলব্ধি করতো। কিন্তু সঠিক ভাবে বুঝতে পারতো না। তবে বছর দশেক আগে থেকে সেই দুরত্ব প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। একটা সময়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের যে একটা নিবিড়তা থাকে, তা মোটেই ছিল না। কণা এ নিয়ে যখনই তমাল কে কিছু বলতে যেতো, সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো। দু'একবার কণার গায়ে হাতও তোলে। কারণ তার স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা নেই। ভালোবাসা থেকেই তো অনুভূতিটা জাগে। এজন্য প্রায়ই কণা হতাশায় মরিয়া হয়ে উঠতো। এভাবে সে একসময় মানসিক অসুস্থ হয়ে পড়ে।

সেদিন হঠাৎ পাওয়া আঘাতে কণা যেন এক জীবন্ত লাশ হয়ে গেছে। বাহিরে সাজানো-গুছানো, কিন্তু ভেতরে হৃদয় পোড়ার গন্ধ কেউ পায় না। মনের দিক থেকে কণা ভীষণ নিরীহ ও একা হয়ে পড়েছে। স্বামীকে সে এখন আর নিজের বলে মনে করতে পারে না। ঐ দিনই তাদের মানসিকভাবে ডিভোর্স হয়ে যায়। মন থেকে যেখানে ডিভোর্স হয়ে যায়, কাগজে-কলমেরটা তো শুধু আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এভাবেই তিলে তিলে গড়া একটি সাজানো সংসার একসময় কোন এক কঠিন ঝড়ে ভেঙ্গে যায়। শুধু কণার মত অসহায়, সহজ সরল মেয়েদের হৃদয়ের অন্তরালে জমে থাকা কষ্টগুলো আমৃত্যু নীরবে তাদের যন্ত্রণা দিয়ে যায়॥ ❑

ঘোচালে অন্ধকার

অপর্ণা ভ্যালেন্টিনা গমেজ

তোমার নামে যাপিত জীবন
মুক্তি তোমারই হাতে
তোমার পথ ধরেই পাব ঠিকানা
অদৃশ্য তবু শতত বিদ্যমান আমার বিশ্বাসে।

আমার মনে তুমি স্রষ্টা, তুমি ঈশ্বর
পিতার প্রাণ, প্রিয় পুত্র তুমি
অথচ অধম আমি,কতটা অকৃতজ্ঞ!
তুমি আমাকেই ভালোবেসে জীবন দিয়েছ ক্রুশেতে।
আমার পাপের বোঝা বয়েছ কালভেরীতে
পেতে নিয়েছ দণ্ড
পুনরুত্থানে মুক্তির দ্বার করেছ উন্মোক্ত
আমি কতটা অভাগা সেই তোমাকেই
ভুলে যাই অহমিকার অন্ধকারে
অন্যের চোখের কুটো ধরি।
ক্ষমা তুমি করবে জানি, যতদূরেই যাই আমি
ফিরতে আমাকে হবেই তোমার পথে
আমার জীবনের সত্য যে তুমি
অনুতাপের জল তোমার চরণে ফেলি
প্রভু আমাকেও দাও সুযোগ
যেন করতে পারি সেবা দুঃখী জনের
প্রতিবেশিকে আপন ভেবে
করি তোমার গুণগান
সর্বত্র হোক তোমার জয়গান।
তুমি ঈশ্বর পুত্র, করুনার আধার
যুগে যুগে তুমিই মহান॥

গ্রীস্ম ঋতুর আগমন

মালা চিরান

আমাদের দেশ ছয় ঋতুর বাংলাদেশ
দু'মাস পরপর ঋতু বদল হয়
গ্রীষ্মের আগমনে সূর্যের খরতাপে
চারিদিকে যেন আগুন ঝরে।
প্রকৃতির রূপ বদলে যায়
নদ-নদী, খাল-বিল, মাঠ প্রান্তর শুকিয়ে যায়
দিগন্ত জুড়ে আঁকা যেন হয়
ছবি নিপুণ তুলির হাতে।
গ্রীষ্মের দুপুরে আমতলায় বসে বনভোজনে মেলা
আসে বাংলা মাসের প্রথম বছর বৈশাখ
বাঙালির প্রাণ প্রিয় উৎসব গ্রাম্যমেলা বৈশাখ
খেলনা, মৃৎশিল্প মাটির হাঁড়ি-পাতিল
পুতুল, তালপাতার পাখা
লোহার কাঠের নানা সামগ্রী ।
বিন্নী ধানের খই, বাতাসা, নাড়ু
বিভিন্ন মিষ্টি হাতি, ঘোড়া
থাকে যাত্রা পালা, সার্কাস খেলা
নাগর দোলা, ম্যাজিক খেলা বাঁচ্চাদের খেলনা॥

যিশুতে বিশ্বাস

মিল্টন রোজারিও

কোন এক আশ্বিন দিনের কথা। এক বিষধর সাপের কামড়ে মৃতপ্রায় এক নারীর যিশুতে বিশ্বাসে বেঁচে ওঠার ঘটনা। গল্পটা এমন - বর্ষা কাল, নৌকায় করে ঘুরে বেড়াতে কার না ভালো লাগে। বাবা নারায়ণগঞ্জে চাকুরী করতেন। শনিবার বাড়ীতে আসতেন। তখন রবিবার ছুটির দিন ছিল। প্রায় রবিবার দুপুরে ভাত খেয়ে আমরা তুইতাল নানী বাড়ীতে বেড়াতে যেতাম। আমাদের বাঁধাধরা একটি নৌকা ছিল। নৌকার মাঝির নাম বদরুদ্দিন। বাবা বাড়ীতে এলে বদরুদ্দিনও আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যেতো যেন। সকালে গির্জায় নিয়ে যাওয়া; গির্জা থেকে ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে আসা। দুপুরের খাবার খেয়ে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ছিল তার কাজ। আমরা বদরুদ্দিনকে চাচা বলে ডাকতাম।

এক সময় গ্রামবাংলায় প্রচুর বর্ষার পানি হতো। তুমি তো সেই পানি দেখই নি। গ্রামের প্রতিটি বাড়ীর ঘাটে বর্ষার কালো টলটলে পানি। ১০/১২ হাত পানির নীচে মাছেদের ছুটোছুটি ছিল চোখে পড়ার মত। এসব কথা চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো তখন নদীতে, খালে-বিলে এমন কি বাড়ীর আশেপাশে আড়া-গাড়ার পানিতেও। মাছের দাপাদাপি শুনেছি আমাদের বাড়ীর পিছনের খালে। বড়শীতে টাকি মাছ জেলা দিয়ে অনেক বড় বড় বোয়াল মাছ ধরা হতো। জানিস মাছের কথা বলতে গেলে সে অনেক গল্প বলা যাবে। তখনকার দিনে মানুষজন নানা কৌশলে মাছ ধরতো। তোকে পরে এক সময় মাছ ধরার গল্প শোনাবো।

তুহিন তন্ময়ের কথাগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল আর অবাক হচ্ছিল। কারণ, তুহিন আর তন্ময়ের বয়সের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে। এই প্রজন্মের ছেলে তুহিন। ঢাকা ভার্সিটিতে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স পড়ছে। তন্ময়ের সাথে ঢাকা মিরপুর জাতীয় স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়া বনাম বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় T-20 খেলা দেখতে গিয়ে ওদের পরিচয় হয়, বন্ধুত্ব হয়। পরিচয়ের এক পর্যায়ে দুইজনই জানতে পারে যে তারা পরস্পরের খুব কাছের মানুষ এবং আত্মীয়। বন্ধুত্ব হবার আরো একটি কারণ হলো দুইজনেই অস্ট্রেলিয়ার বিরাট ভক্ত। তুহিন বলে, দাদা কি যেন বলছিলেন, বলেন না। আমার সেই অতীত দিনের কথা শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। তন্ময় আবার বলতে শুরু করে। আমরা দুপুরে খেয়ে দেয়ে বদরুদ্দিন চাচার কেড়িয়া নৌকায় চড়ে বসতাম নানি বাড়ীতে যাবো বলে। তুইতাল যাওয়ার পথে তখন প্রচুর বড় বড় ধান ক্ষেতের জমি পাড়ি দিতে হতো। বর্ষায় এত পানি হতো যে, সব জমিজমা ডুবে যেতো। কৃষকরা তখন জমিতে আমন ধান রোপণ করতো। পানি বাড়ার সাথে সাথে সেই ধান গাছও বেড়ে উঠতো। নৌকা নিয়ে ধান ক্ষেতের পাশে গেলে পানি দেখা যেতো না। যেদিকে এবং যত দুরে চোখ যেতো শুধু সবুজ আর সবুজ দেখা যেতো। এই সবুজেই চোখটি আটকে থাকতো। ঐ দৃশ্য ভোলার নয় রে। এখনও মনে হলে নষ্টালজিয়াতে জড়িয়ে যাই। আরও একটা মজার ব্যাপার ছিল কি জানিস? তুহিন বলে, কি সেটা? তন্ময় বলে, গঁয়া। গঁয়া চিনিস? না। গয়াঁ কি দাদা? গঁয়া হলো ধান ক্ষেতের এক প্রকার ফড়িং। নৌকা যখন ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে চলতো, তখন ধান ক্ষেতের সবুজ রঙ্গের গঁয়া উড়ে উড়ে নৌকার ছঁইয়ে, আমাদের গায়ে এসে বসতো। আমরা ভয় পেয়ে যেতাম। আমার বাবার খুব সাহস ছিল। বাবা না সেই সব গঁয়া খপ্ করে ধরে আমাদের ধরতে বলতো। আমরা তো তখন ছোট ছিলাম তাই ভয়ে ধরতাম না। বেশ মজার তো।

শৈল্লার বট গাছের কথাতো শুনেছিস। ঐ বিরাট বটগাছটি ছিল চকের মাঝখানে অতন্দ্র প্রহরীর মত। বর্ষার সময় চকের যত সাপ ব্যাঙ ইঁদুর ঐ বট গাছের ভিটায় গিয়ে আশ্রয় নিতো। অনেক পাখীও বসবাস করতো বটগাছে। আমরা সেই বটগাছটি ডাইনে রেখে সোজা পুরান তুইতালের খাল ধরে নানী বাড়ীতে চলে যেতাম। জানিস তুহিন, নানী বাড়ীর ঘাটে এত মাছ ছিল, যেন হাত দিয়ে ধরা যাবে। তুহিন বলে, তুমি মাছ ধরনি? তন্ময় বলে, ধরিনি মানে! কি যে বলিস না তুই। নানী বাড়ীতে আমি তো মাছ ধরতেই যেতাম। নৌকা থেকে নেমে দৌড়ে যেতাম আমার ছোট মাসির কাছে। মাসি আমাদের দেখে কি যে খুশী হতো। নানী আমাদের জন্য নানা রকমের পিঠা, মোয়া, নাড়ু বানিয়ে রেখে দিতো। তন্ময়দা শোন। বল কি বলবি? তোমাদের ঘরে কি এখনও সেই মোয়া, নাড়ু আছে? আরে ধেৎ! তুই যে না কি। এখন মোয়া, নাড়ু কোথায় পাবি? না দাদা, আমি এমনি একটু দুষ্টুমি করলাম। দুইজনেই হেসে দেয়। তন্ময় আবার বলতে শুরু করে। শোন, মাসি আমাদের সেগুলি বের করে খেতে দিতো। জানিস মাসি না আমাকে আদর করে দস্যু বলতো। তাই নাকি! তুমি কি খুব দুষ্টু ছিলে নাকি? আরে না। তুই ওটা বুঝবি না। যাক, তুই আমার মুডটাই নষ্ট করে দিচ্ছিলি। শোন, মাসির কাছে গিয়ে খাতির জমিয়ে বড়শিটা নিতাম। তারপর আটা দিয়ে মাসি মাছ ধরার আধার বানিয়ে দিতো। আমরা ঘাটে বসে অনেক বাইলা, টেংড়া, সরপুঁটি মাছ ধরতাম। কি যে আনন্দের দিন ছিল তখন, তোকে বলে বুঝাতে পারবো না।

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় আমরা নানীবাড়ী থেকে বাড়ীর পথে রওনা হতাম। তখন ফিরতাম নদী পথে। নদীর ভাটি স্রোতে ভেসে ভেসে বদরুদ্দিন চাচা তার নৌকাটি বেয়ে নিয়ে আসতো। অপরূপ এক সন্ধ্যা। আকাশ ভর্তি অগুনতি তারা। দেখতে খইয়ের মত লাগতো। আর ঐদিকে পূর্বাকাশে চাঁদ উঠছে। পাখীরা সব তাদের নিজ নিজ কুলায় ফিরছে। পুরান তুইতাল খালের মুখের পশ্চিমপাড়ে ছিল পামগাছওলা বাড়ী। সেখানে এসে দেখা মিলতো বাদুরের। নদীর পাশে এক বাড়ীতে দেবদারু গাছে অজস্র বাদুর ঝুলে থাকতো। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে বাদুরগুলো খাবারের জন্যে বের হতো। সন্ধ্যার এই সময়টা বাবা আরো মোহনীয় করে তুলতো গান গেয়ে। "আজ জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে, ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে, বৌদ্ধ গান্ধী বিবেকানন্দ বিশ্ব কবির মহান দেশে," আরো কত সুন্দর সুন্দর গান করতো। বাবার গানের গলা ছিল বেশ ভাল। এই গান শুনতে শুনতে আমরা মঠবাড়ীর কাছে এসে পড়তাম। তুহিন বলে, মঠবাড়ী মানে? এটি আবার কোন মঠবাড়ী? আরে শোন, এই মঠবাড়ী সেই ভাওয়ালের মঠবাড়ী নয়। খাঁনেপুর, নুননগর, রাধাকান্তপুর এই সব গ্রামে আগে প্রচুর হিন্দু জনবসতি ছিল। রাধাকান্তপুর ইছামতি নদীর পাড়ে ছিল ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের বাড়ী। ঠাকুরদের

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিবার থেকে সকলকে জানাই

পুণ্যময় পাস্কাপর্ব এবং বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Happy Easter & Bangoli New Year .

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু
পরিচালক ও সম্পাদক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ডেভিড পিটার পালমা
সম্পাদনা সহযোগী

শুভ পেরেরা
সম্পাদনা সহযোগী

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সার্কুলেশন ইনচার্জ

লিটন ইসাহাক আরিন্দা
সার্কুলেশন সহযোগী

হিসাব বিভাগ

ডগলাস ডি, রোজারিও
প্রধান হিসাব রক্ষক

অমিত রোজারিও
সহকারী হিসাব রক্ষক

প্রতিবেশী প্রকাশনী

পরেশ রোজারিও
সেলস্ ইনচার্জ

বিনয় কস্তা
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

টমাস কোড়াইয়া
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

বাণীদীপ্তি

সিস্টার লাইলী রোজারিও আরএনডিএম
কো-অর্ডিনেটর ও প্রযোজক, আরডিএ

রিপন অব্রাহাম টলেন্টিনু
প্রোগ্রাম প্রযোজক, আরডিএ

এছনী তপন গমেজ
প্রধান শব্দগ্রাহক

জেমস্ গনছালভেস্
প্রোগ্রাম সহযোগী

সুনীল পেরেরা
জ্যোতি কম্যুনিকেশন

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

সুশীল মারাক
বার্বুর্চি

পরিমল টুডু
সিকিউরিটি গার্ড

পলিনুস কেরকেটা
সিকিউরিটি গার্ড

লিপি আক্তার
(আয়া)

জেরী প্রিন্টিং

অজয় পিউস কস্তা
ব্যবস্থাপক

দীপক সাংমা
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

নিভৃতি রোজারিও
কম্পিউটার অপারেটর

আন্তনী অংকুর গমেজ
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

পিতর হেম্ব্রম
সহযোগী

মোঃ হেমায়েত উদ্দীন
মেশিনম্যান

ফারুক মিয়া
মেশিনম্যান

মানিক রোজারিও
মেশিনম্যান

সেন্টু রোজারিও
মেশিনম্যান

আব্দুল খালেক
বাইন্ডার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বিদেশ প্রতিনিধিগণ :

জেমস্ গমেজ (আদি)
আমেরিকা

ডেভিড স্বপন রোজারিও
আমেরিকা

বিপুল এলিট গনছালভেস
আমেরিকা

হিউবার্ট ডি'ক্রুজ
আমেরিকা

সুবীর কাস্মির পেরেরা
আমেরিকা

মিন্টু রোজারিও
অস্ট্রেলিয়া

শংকর ভাস্কর পালমা
ইতালি, ইউরোপ

সুমন জন গমেজ
কানাডা

বিদ্রঃ বাংলাদেশে সকল ধর্মপল্লীর পুরোহিতগণ, ধর্মব্রতী/ব্রতীনিগণ, বিভিন্ন ধর্মপল্লীর স্বেচ্ছাসেবীবৃন্দ সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র উন্নয়নে সহায়তা করে চলেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা।

কাল্‌ব সদস্য ক্রেডিট ইউনিয়নকে অধিক হারে মুনাফার নিশ্চয়তা দিচ্ছে

ক্র. নং	সঞ্চয়ী প্রকল্পসমূহের নাম	মুনাফার হার
১।	সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাব	৬%
২।	মেয়াদী আমানত হিসাব	
	মেয়াদ	
	ক. ৬ মাস মেয়াদী হিসাব	৯.০০%
	খ. ১২ মাস মেয়াদী হিসাব	১০.০০%
	গ. ২৪ মাস মেয়াদী হিসাব	১১.০০%
	ঘ. ৩৬ মাস মেয়াদী হিসাব	১১.৫০%
	ঙ. ৬০ মাস মেয়াদী হিসাব	১২.০০%
৩।	মাসিক সেভিংস্ প্লাস (এমএসপি) সর্বনিম্ন এককালীন জমার পরিমাণ ১০০,০০০ টাকা	
	মেয়াদ	মাসিক প্রাপ্য
	ক. ২৪ মাস মেয়াদী হিসাব	৯৫০ টাকা
	খ. ৩৬ মাস মেয়াদী হিসাব	১,০০০ টাকা
	গ. ৬০ মাস মেয়াদী হিসাব	১,০৫০ টাকা
৪।	কাল্‌ব পেনসন স্কীম (সর্বনিম্ন মাসিক জমার পরিমাণ ১,০০০ টাকা)	
	মেয়াদ	মেয়াদান্তে প্রাপ্য
	ক. ৬০ মাস মেয়াদী হিসাব	মেয়াদান্তে প্রাপ্য ৭৭,২৩০ টাকা
	খ. ১২০ মাস মেয়াদী হিসাব	মেয়াদান্তে প্রাপ্য ২,০১,৬০০ টাকা
৫।	দ্বিগুণ মেয়াদী আমানত (সর্বনিম্ন জমার পরিমাণ ১০০,০০০ টাকা)	সাড়ে ছয় বছরে দ্বিগুণ
৬।	ড্রিম বেনিফিট ডিপোজিট আমানত প্রকল্প	
	জমার পরিমাণ	মেয়াদান্তে প্রাপ্য
	ক. প্রাথমিক জমা ৫০,০০০ টাকা এবং মাসিক জমা ৮০০ টাকা	৩৬ মাস পর প্রাপ্য ১ লক্ষ টাকা
	খ. প্রাথমিক জমা ৫০,০০০ টাকা এবং মাসিক জমা ২,০০০ টাকা	৩৬ মাস পর প্রাপ্য ১.৫০ লক্ষ টাকা
	গ. প্রাথমিক জমা ৫০,০০০ টাকা এবং মাসিক জমা ৫,৫৫০ টাকা	৩৬ মাস পর প্রাপ্য ৩ লক্ষ টাকা
	ঘ. প্রাথমিক জমা ৫০,০০০ টাকা এবং মাসিক জমা ১,৩৩০ টাকা	৪৮ মাস পর প্রাপ্য ১.৫০ লক্ষ টাকা
	ঙ. প্রাথমিক জমা ৫০,০০০ টাকা এবং মাসিক জমা ২,১৮০ টাকা	৪৮ মাস পর প্রাপ্য ২ লক্ষ টাকা
	চ. প্রাথমিক জমা ৫০,০০০ টাকা এবং মাসিক জমা ৯৫০ টাকা	৬০ মাস পর প্রাপ্য ১.৫০ লক্ষ টাকা
	ছ. প্রাথমিক জমা ৫০,০০০ টাকা এবং মাসিক জমা ১,৬০০ টাকা	৬০ মাস পর প্রাপ্য ২ লক্ষ টাকা
৭।	ট্রিপল বেনিফিট আমানত হিসাব (এককালীন সর্বনিম্ন জমার পরিমাণ ১০০,০০০ টাকা)	
	জমার পরিমাণ	মেয়াদান্তে প্রাপ্য
	ক. জমার পরিমাণ ১০০,০০০ টাকা	১০.৫০ বছর পর প্রাপ্য ৩ লক্ষ টাকা
	খ. জমার পরিমাণ ২০০,০০০ টাকা	১০.৫০ বছর পর প্রাপ্য ৬ লক্ষ টাকা
	গ. জমার পরিমাণ ৫০০,০০০ টাকা	১০.৫০ বছর পর প্রাপ্য ১৫ লক্ষ টাকা
৮।	মিলেনিয়াম ডিপোজিট আমানত প্রকল্প	
	মাসিক জমার পরিমাণ	মেয়াদান্তে প্রাপ্য
	ক. ২৩,৬০০ টাকা	৩৬ মাস পর প্রাপ্য ১০ লক্ষ টাকা
	খ. ১২,৭০০ টাকা	৬০ মাস পর প্রাপ্য ১০ লক্ষ টাকা
	গ. ৮,১০০ টাকা	৮৪ মাস পর প্রাপ্য ১০ লক্ষ টাকা
	ঘ. ৪,৭৫০ টাকা	১২০ মাস পর প্রাপ্য ১০ লক্ষ টাকা
৯।	কোটিপতি ডিপোজিট আমানত প্রকল্প	
	মাসিক জমার পরিমাণ	মেয়াদান্তে প্রাপ্য
	ক. ২,৪০,০০০ টাকা	৩৬ মাস পর প্রাপ্য ১ কোটি টাকা
	খ. ১,৩০,০০০ টাকা	৬০ মাস পর প্রাপ্য ১ কোটি টাকা
	গ. ৮৪,০০০ টাকা	৮৪ মাস পর প্রাপ্য ১ কোটি টাকা
	ঘ. ৫০,০০০ টাকা	১২০ মাস পর প্রাপ্য ১ কোটি টাকা

নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগের জন্য আজই কাল্‌ব কেন্দ্রীয় কার্যালয় অথবা নিকটস্থ জেলা ও উপজেলা সদস্য সেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।
অধিক মুনাফার জন্যে কাল্‌ব-এ আমানত জমা করুন।

দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব)

কাল্‌ব ভবন, বাড়ী নং- ৮, ব্লক নং- বি, স্কুল রোড, খিলবাড়ীরটেক, ভাটারা, গুলশান, ঢাকা - ১২১২
ফোন: ০৯৬০৬৯১৯১৯১, ৮৮৯৯৮২৬, E-mail: cculb.info@cculb.coop

web. www.cculb.coop

বিজ্ঞ/১৩৩/২০২৩

নদীর ঘাটটি ছিল শান্ বাঁধানো। ঘাটের দুই পাশে ছিল বিরাট দুইটি কৃষ্ণচূড়া গাছ। যখন ফুল ফুটতো দুর থেকে তখন দেখতে এত সুন্দর লাগতো যে তোকে কি বলবো। পূর্ব পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশই ছিল একটি বিরাট মঠ। ঠিক প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের মত উঁচু। অনেক দূর থেকে সেই মঠটি দেখা যেতো। ঐ মঠের ভিতরে ছিল বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। আরো একটি মজার ব্যাপার ছিল কি জানিস? তুহিন বলে, তুমি না বললে কি করে জানবো! শোন, ঐ মঠের উপরের অংশে বাস করতো শত শত জালালী কবুতর। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা ঐ জালালী কবুতর কাউকে মারতে দিতো না।

মঠের কাছে এলেই দূরে বান্দুরা বাজারের দোকানের বাতিগুলো দেখা যেতো। দূর থেকে মনে হতো জোঁনাকী পোঁকার আলো। তখন আমরা বুঝতে পারতাম যে বাড়ীতে এসে পড়েছি।

বাড়ীর ঘাটে এসে বদরুদ্দিন চাচা হারিকেন বাতি উঁচু করে ধরতো যাতে আমরা ভাল মত নৌকা থেকে নামতে পারি। পরদিন খুব ভোরে বাবা আবার তার কর্মস্থল নারায়ণগঞ্জ চলে যেতেন।

বেশ কিছুদিন পর আশ্বিনের এক বিকেলে ঠিক এমনি এক রবিবার আমরা নানীবাড়ীতে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছি। এখন নানী বাড়ীতে যেতে হবে নদী পথে। কারণ, চকের পানি কমে এখন নৌকা চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রচুর মাছ ধরা পড়ছে জেলেদের জালে, বড়শীতে। আমাদের বাড়ীর সামনে মানুষজন বড়শীতে বড় বড় বাইলা মাছ, বাইম মাছ ধরছে। সেই মাছ আজকাল আর চোখে দেখা যায় না রে। ডিমওলা ইয়া বড় ভুত্তুম বাইলা মাছ। ঐদিকে পুরান তুইতাল খালেও তেমনি বড় বড় মাছ ধরা পড়তো। সেখানেও মানুষজন ঝাঁকি জাল দিয়ে, বড়শীতে বিভিন্ন মাছ ধরতো। মাছের কথা তোকে আর কি বলবো, এত মাছ ধরা পড়তো যে, মানুষজন তখন সেই মাছ রোদ্রে শুকিয়ে ঘরে রেখে দিতো। তার মানে তুমি বলতে চাও, মাছ শুটকি করে ঘরে রেখে দিতো! হ্যাঁ। তুই ঠিকই ধরেছিস।

আমরা যথা সময়ে নৌকায় উঠে রওনা হয়েছি। মঠটা পার হচ্ছি আর এমন সময় তুইতাল থেকে ফেরা এক নৌকা থেকে একজন বাবাকে ডেকে বললো, তুমি ওমুক না। বাবা বললো, হ্যাঁ। তোমরা জলদি যাও, তোমার শালিকাকে সাপে কেটেছে। বাবা বদরুদ্দিন চাচাকে নৌকা জলদি ঘুরিয়ে বাড়ীতে যেতে বললো। মা এই কথা শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। বদরুদ্দিন চাচার নৌকাতে আরো একটি ছোট বৈঠা ছিল, বাবা সেই বৈঠাটি বের করে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইতে লাগলো। আমাদের ভাই-বোনদের বাড়ীতে ঠাকুরমার কাছে রেখে বাবা আর মা দ্রুত চলে গেল তুইতাল নানী বাড়ীতে। গিয়ে দেখে বাড়ী ভর্তি গ্রামের মানুষজন। এমন কি আশেপাশের গ্রামের হিন্দু-মুসলমান লোকজনও এসেছে। মাসিকে উঠানে একটি পাটি বিছিয়ে শুইয়ে রেখেছে। মাসি চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে যায় নি। যে পায়ে সাপে কেটেছে, সেই পায়ে বেশ কয়েকটি দঁড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। মহিলারা মাসির চারপাশে বসে প্রার্থনা করছে। মাসি বলছিল, কোন ওঝা যেন আমাকে স্পর্শ না করে। যিশুই আমাকে ভালো করবেন। মানুষজন বলাবলি করছিল, মেয়েটি ভুল করছে। যে বিষাক্ত সাপে কেটেছে, ওঝা ছাড়া কেউ এই বিষ বের করতে পারবে না। এলাকার বড় তিন/চার জন ওঝা এসেছে। গ্রামের মাতব্বর নানীকে অনেক বলেও বুঝাতে পারছে না। মাসি কিছুতেই ওঝাকে দেখাবে না। শকুল নানা মাসিকে অনেকবার মা মা বলেও বুঝাতে পারছে না। বাবা বেশ চিন্তায় পড়ে গেল কি করবে। সর্বত্র এই খবর ছড়িয়ে পড়েছে। কোন ওঝাকে নাকি দেখাতে দিচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর পুরান তুইতাল থেকে মাইকেল মাস্টার এলেন। তিনি এসে বাবাকে বলেন, কোন চিন্তা করবে না। ও ভালো হয়ে যাবে। কাউকে সাপে কাটলে ভালো হবার ঔষধ আমি নিয়ে এসেছি। এই কথা শুনে বাবা যেন একটু আস্বস্ত হলো। সবাইকে সরিয়ে দিয়ে মাইকেল মাস্টার বাবাকে বললো, তুমি ওকে এই ঔষধটি একটু একটু করে খাইয়ে দাও। বাবা তাই করলেন। ঔষধ খাওয়ানোর কিছুক্ষণ পর দেখা গেল মাসি সুস্থ হয়ে উঠেছে। মাইকেল মাস্টার তখন সবার উদ্দেশে বলেন, এই ঔষধটি ফাদার মুনসিনিয়র ডি'কস্তা আমাকে দিয়ে ছিলেন। তার কাছ থেকে আমি আরো অনেক রোগের চিকিৎসা শিখেছি। উপস্থিত সবার মুখে তখন হাসির রেখা দেখা গেল। মাসি সুস্থ হয়ে উঠলে মাইকেল মাস্টার মহিলাদের বলেন, মাসিকে ধরে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিতে। বাবা জিজ্ঞেস করলো, মাকে কিভাবে সাপে কাটলো? তখন নানী বললো, উঠানের পাশে রান্না ঘরের সাথে লাগানো আঁইশফল গাছের ডাল কেটেছে আজকে। ঐ ডালগুলো সড়াতে গেলে সেখান থেকে ওকে সাপে কাটে। মাইকেল মাস্টার তখন বলেন, ওটা সুঁতানলি সাপ ছিল। গাছে গাছে থাকে এই সাপ। সবুজ রং এর হয় বলে সবুজ পাতার সাথে মিশে ছিল। ও বুঝতে পারে নাই। তুহিন বলে, আচ্ছা দাদা, তুমি তখন বললে যে, তোমাদের বাড়ীতে রেখে তোমার বাবা-মা মাসিকে দেখতে গেছে। হ্যাঁ। তাহ'লে তুমি এতসব জানলে কি ভাবে? আরে বোকা, মা বাড়ীতে এসে আমাদের এই সব ঘটনার কথা বলেছে। ও তাই! দেখলি যিশুর প্রতি মাসির কি বিশ্বাস ছিল। ঠিকই বলেছ দাদা। যিশুর প্রতি অগাদ বিশ্বাস থাকলে মানুষ সব সমস্যা, অসুখ, বিপদ থেকেই রক্ষা পায়। যিশুর প্রতি বিশ্বাসের ফলই পেয়েছে মাসি॥ ❑

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড
স্থাপিত: ১৯৬৪ খ্রী:
সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবন, মাদার তেরেজা সরণী
তুমিলিয়া মিশন, পো:অ: কালীগঞ্জ-১৭২০, জেলা: গাজীপুর, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৭১১-৫৩৮৬৫৫, ই-মেইল: tcccul@yahoo.com

TCCCUL
REGD. NO. 26/1984

TUMILIA CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
Estd : 1964
St. John Baptist Bhaban, Mother Teresa Saronee,
Tumilia Mission, P.O: Kaligonj-1720, Dist: Gazipur, Bangladesh.
Mobile: 01711-538655, E-mail: tcccul@yahoo.com
Web: www.tcccul.com

সেক্রেটারি-২০২২/২৩ (৬৮)
তারিখ: ০১ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

জমি বিক্রয় করার নোটিশ

সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নোক্ত তপসিল পরিচয়কৃত জমি তুমিলিয়া ক্রেডিটের সদস্য-সদস্যাদের নিকট বিক্রয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আগ্রহী সদস্যদের যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জমির তপসিল পরিচয়

মৌজা	গ্রাম	আর.এস. খতিয়ান	আর.এস. দাগ নং	জমির পরিমান
বান্দাখোলা	দড়িপাড়া	৭৮/১	১৬, ১৭, ৯১, ৯২ ১০৫ ও ১০৭	২৫.৭০ শতাংশ
চুয়ারিয়াখোলা	দড়িপাড়া	২৪৯/১	১০০৫	১৮.৭৫ শতাংশ

যোগাযোগের ঠিকানা

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবন, মাদার তেরেজা সরনী, তুমিলিয়া মিশন
পোঃ অঃ- কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর
মোবাইল: ০১৭১১-৫৩৮৬৫৫।

TCCCUL
REGD. NO. 26/1984

রিংকু লরেন্স গমেজ
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

অসীম হিউবার্ট গমেজ
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিজ্ঞ/১৩০/২৩

নারিকেলের নাড়ু

খোকন কোড়ায়া

তৃতীয়বার ফোন করলো তনিমা। গাড়ী স্লো করে ফোনটা রিসিভ করলো হৃদয়।

- তুমি কোথায়?

- আমি গাজীপুর যাচ্ছি ব্যবসার কাজে। ফিরতে একটু দেরি হবে।

নিজেকেই প্রশ্ন করে হৃদয় - তনিমাকে তুমি মিথ্যে বললে কেন? বললেই পারতে তুমি মাকে দেখতে সাভার যাচ্ছ বৃদ্ধাশ্রমে। এটা কি কোন অন্যায় কাজ? তুমি কি তনিমাকে ভয় পাও, নাকি অশান্তি এড়াতে চাও? না, হৃদয় আসলেই অশান্তি এড়াতে চায়। অশান্তি এড়ানোর জন্য জীবনে অনেক কিছু মেনে নিয়েছে ও কিন্তু তারপরও কি অশান্তি এড়ানো গেছে?

মাকে ঘিরে ছোটবেলার কথা আজ খুব মনে পড়ছে হৃদয়ের। বাবা-মার একমাত্র সন্তান ও। তাই বাবা-মার বিশেষ করে মায়ের আদর স্নেহের আর কোন ভাগীদার ছিলো না। ঠিক পাখির ছানার মতই মা ওকে আগলে রাখতো। কোন কষ্ট, কোন অমঙ্গল যেন ছেলেকে স্পর্শ না করে সেটাই যেন ছিলো মার একমাত্র কাজ। বাবা চাকরি করতেন মধ্যপ্রাচ্যে তাই মার চব্বিশ ঘন্টাই বরাদ্দ থাকতো হৃদয়ের জন্য। কত রকমের খাবার, কত রকমের নাস্তা যে মা ওর জন্য তৈরী করতো তার হিসেব ছিলো না। শুধু কি রান্না, নিজে পাশে বসে থেকে উৎকৃষ্ট খাবারগুলি ওর পাতে তুলে দিতো। হাইস্কুলে পড়া অবধি মা ওর ভাত মেখে দিতো। তখন গ্রামে ইলেকট্রিসিটি ছিলো না, গরমের সময় তালপাতার পাখা দিয়ে সারারাত মা বাতাস করতো, যাতে গরমে হৃদয়ের ঘুম ভেঙ্গে না যায়। হৃদয়ের একটু শরীর খারাপ হলে মা ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে যেতো। হৃদয় তখন ঢাকায় কলেজে পড়তো। একবার ঢাকা থেকে টাইফয়েড বাধিয়ে বাড়ি গেলো। হায়রে মার সে কি বিধ্বস্ত অবস্থা, যেন হৃদয়ের কোন দূরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে, আর বাঁচবে না। পাশের গ্রাম থেকে ওর এক দূর সম্পর্কের মাসীকে খবর দিয়ে আনালো রান্না করার জন্য। আর নিজে দিনরাত ছেলের সেবা যত্ন করতে লাগলো। হৃদয় মাঝে মাঝে বলতো, মা তুমি একটু বিশ্রাম নাও, ঘুমাও। কে শুনে কার কথা! এক রাতে হৃদয় একটু উষ্ণ হয়েই বললো, দেখ মা এভাবে তুমি যদি ক্রমাগত রাত জাগো, তুমি নিজেই কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়বে! মা একটু হেসে বললো, আমি অসুস্থ হলে তুই আমার সেবা করবি। তারপর একটু থেমে বললো, আমি বুড়ো হলে তুইইতো আমার সেবা করবি, কি করবি না? হৃদয় মার হাত ধরে বলেছিলো, অবশ্যই করবো মা।

আমিন বাজারের ব্রিজ পার হলো হৃদয়। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলো - ও কি সত্যি পারবে মার সেবা করতে। বাবা এক সময় অবসর গ্রহণ করে বাড়িতে এলো পাকাপোক্তভাবে। অবশ্য হৃদয় তখন পড়াশুনা শেষ করে একটা বায়িং হাউসে চাকরি নিয়েছে। এরপর পরিচয় হল ঢাকা শহরের মেয়ে তনিমার সঙ্গে। বিয়ের পর ছেলে বৌমাকে নিয়ে ঢাকায় থাকবে জেনেও বাবা-মা বিয়েতে অমত করেনি। বিয়ের পাঁচ বছর পর ওদের একমাত্র সন্তান তপুর জন্ম হলো। বেশ ভালোই চলছিলো, বছরে দু'তিনবার ছেলে আর বৌকে নিয়ে হৃদয় গ্রামের বাড়ি যেতো। খুব আনন্দে কাটতো সেই দিনগুলি। তনিমার সঙ্গেও বাবা-মার সুন্দর সম্পর্ক ছিলো। কিন্তু সুন্দর দিনগুলো দীর্ঘায়িত হয় না। দু'বছরও পার হলো না, বাবা মারা গেলো হার্ট এ্যাটাকে। মাকে ওরা ওদের সঙ্গে ঢাকায় নিয়ে যেতে চাইলো কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হলো না স্বামীর ভিটা ছেড়ে যেতে। কিন্তু স্বামীর শোকে এবং নিজের প্রতি অবহেলার কারণে ছ'মাস পরেই মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লো।

হৃদয় তখন প্রায় জোর করেই মাকে ঢাকায় নিয়ে এলো। সঠিক চিকিৎসা ও পথ্যে কিছুদিনের মধ্যেই মা সুস্থ হয়ে উঠলো। কিন্তু ছেলে, বৌমার আপত্তি আর নাতির প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসার কারণে তার আর গ্রামে ফেরা হলো না। পাঁচ বছর পর ছেলেকে আবার কাছে পেলো হৃদয়ের মা। বৌমা চাকরি করে, তবে অফিস থেকে ফিরে নিজেই রান্না করে। কিন্তু ছোটবেলা থেকে সে যে ধরনের রান্না করে হৃদয়কে খাইয়েছে, বৌমার রান্না মোটেও সেরকম নয়। অল্প তেল মসলা দিয়ে রোগির পথ্য। তাই ছেলে-বৌ দুজন অফিসে চলে গেলে সে ছেলের জন্য একটি পদ রান্না করে। প্রথম প্রথম তনিমা কিছু বলেনি, কিন্তু প্রতিদিনই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখে একদিন বললো, মা আপনি যে আপনার ছেলের জন্য রান্না করেন ওতেতো অনেক তেল, এত তৈলাক্ত খাবারতো আপনার ছেলের খাওয়া উচিত নয়।

- কেন বৌমা?

- ওরতো বয়স হয়েছে।

- কি বল বৌমা, হৃদয় কি বুড়ো হয়ে গেছে?

- আমি সেটা মিন করিনি মা।

প্রতিদিন নাস্তার টেবিলে সেদ্ধ ডিম থাকে। একদিন মা বললো, বৌমা প্রতিদিন সেদ্ধ ডিম কর, হৃদয়তো ভাজা ডিমই বেশি পছন্দ করে।

- কিন্তু আমিতো দেখি ও সেদ্ধ ডিমই পছন্দ করে।

- তুমিতো আট বছর ধরে দেখছো, আর আমি দেখছি পয়ত্রিশ বছর ধরে।

তনিমা যখন তপুকে শাসন করে তখন কেউ আসুক তনিমা সেটা একবারেই পছন্দ করে না। কিন্তু মা এসে যায়। একদিন তনিমা বলে ফেলে- আমি যখন তপুকে শাসন করি তখন আপনি দয়া করে এখানে আসবেন না।

- এটা কি বল তুমি বৌমা, তুমি আমার নাতীকে মারবে, বাচ্চাটা কাঁদবে আর আমি ওর কাছে আসতে পারবো না?

এভাবেই তিক্ততার শুরু এবং সেটা দিন দিন বাড়তে থাকে। দু'জনই হৃদয়ের কাছে নালিশ করে। হৃদয় কি করবে, আলাদাভাবে দু'জনকেই বোঝায়, মেনে নিতে বলে। দু'জনই হৃদয়ের উপর অসন্তুষ্ট, সঠিক বিচার পায় না বলে।

একদিন তনিমা বলে- আমি আর পারছি না, হয় এ বাসায় তোমার মা থাকবে, নয় আমি? আমিই বরং চলে যাই কারণ তোমার মা-ই তোমাদের বেশি আদর যত্ন করতে পারবে।

আর একদিন মা বলে- আমাকে বাড়িতে রেখে আয় বাবা, আমি আর তোদের শান্তি নষ্ট করতে চাই না।

শেষ পর্যন্ত হৃদয় নিরুপায় হয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়, মাকে বৃদ্ধাশ্রমেই রেখে আসবে। কারণ গ্রামে মাকে রাখা ঠিক হবে না, সেখানে দেখাশুনা করার কেউ নেই।

'শান্তি নিবাসে'র গেট দিয়ে ঢুকতেই বৃদ্ধাশ্রমের সুপারের সঙ্গে দেখা। ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, মাকে দেখতে এসেছেন, মা ভালই আছে, তবে আপনাদের মিস করে খুব।

হৃদয়কে দেখে মায়ের শুকনো মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তার রুমমেট এবং আশেপাশের সবাইকে ডেকে বললো, দিদিরা দেখে যাও আমার ছেলে এসেছে। হৃদয়কে চেয়ারে বসিয়ে মা বললো, তোকে এত শুকনো লাগছে কেন, ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করিস। আর বেশি ভাবিস না।

- আমি ঠিক আছি মা, তুমি কেমন আছ?

- আমি এখানে খুব ভালো আছি। কত বন্ধু হয়েছে আমার। তাদের সঙ্গে গল্প করি, লুডু খেলি। তবে তোদের কথা ভেবে মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়। তপু কেমন আছেরে, তনিমা? তপুকে একদিন এখানে আনা যায় না?

মার জন্য তার প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস আর শুকনো খাবার এনেছে হৃদয়, সেগুলো মাকে দিলো। অনেক কথা বললো মা। পুরনো দিনের অনেক কথা, এখানে যারা থাকে তাদের সুখ-দুঃখের কথা। শেষে মা বললো, জানিস হৃদয়, আমার মনে হয়, আমি ভুল করেছি, একটু বাড়াবাড়ি করেছি আমি। আসলে আমার মনে থাকতো না, তুই বড় হয়েছিস, বিয়ে করেছিস, তোর একটা আলাদা সংসার আছে। তনিমাকে বলিস, আমাকে যেন ক্ষমা করে দেয়।

- ছিঃ মা এসব কি বলছো তুমি?

ফেরার সময় হৃদয়কে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে ওর হাতে কাগজে মোড়ানো ছোট একটা পুঁটলি দিয়ে মা বললো, এখানে কিছু নারিকেলের নাড়ু আছে, সুপ্রিয়া দিদির জন্য তার বোন এনেছিলো। আমাকে কয়েকটা দিয়েছিলো খাওয়ার জন্য। আমি খাইনি, তোর জন্য রেখে দিয়েছি, তোরতো খুব প্রিয় নারিকেলের নাড়ু। নিয়ে যা, যাওয়ার সময় রাস্তায় খেয়ে নিস।

অনেকদিন পর মাকে জড়িয়ে ধরলো হৃদয়। দু'জনের চোখেই বৃষ্টি নামলো অঝোর ধারায়॥ ❑

মিলনেই আনন্দ

দিলিপ ভিনসেন্ট গমেজ

কাকডাকা ভোরে মা ও বাবার ভীষণ চেঁচামেচি শুনেই অর্ণবের ঘুম ভেঙে যায়। সে চোখ ঘষতে ঘষতে দৌড়ে এলো খাবার ঘরে। অর্ণব মায়ের দিকে তাকায় আবার বাবার দিকে তাকায়। বুঝতে চেষ্টা করছে এইমাত্র মা-বাবা কি নিয়ে ঝগড়ার আসর বসালো। এর মধ্যে অর্ণবের কাকা অপু অর্ণবকে নিয়ে বাড়ির পাশের পুকুর ধারে গেল মা-বাবার ঝগড়ায় যেন মনোনিবেশ না করতে পারে। কারণ এই ঝগড়া কোন কথা কি ভাবে শেষ হবে তা কারো জানা নেই।

গ্রামের নাম রাজাই। এই গ্রামে অনেককাল আগে একজন মহাপুরুষ রাজার মত জীবন-যাপন করতো বিধায় গ্রামের নাম হয় রাজাই। একদম বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তের মেঘালয়ের বিশাল পাহাড়ের পাদদেশে রাজাই গ্রাম গড়ে আছে স্রষ্টার সৃষ্ট অকৃপণ সীমাহীন অদ্ভুত সকল সবুজ সুন্দর প্রকৃতির মাঝে। এই গ্রামের বাসিন্দা লিমিয়ন। ভীষণ ছিমছাম মানুষ। একমাত্র স্ত্রী সুপর্ণা, ছেলে অর্ণব ও আদরের একমাত্র ভাই অনুরুদ্ধকে নিয়ে তার বসবাস। বাড়ীতে থেকে নিজ উপজেলা তাহিরপুর সদরে একটা এনজিওর বড় অফিসার। প্রতিদিনের মতো আজ সকালে উঠে নাস্তা খেয়ে দুপুরে অফিসের খাবার প্রস্তুতে ভীষণ ব্যস্ত স্ত্রী সুপর্ণা নাস্তা প্রস্তুত করে সুপর্ণা ডেকে বলল, ওগো তোমার নাস্তা খাবার টেবিলে প্রস্তুত খেতে এসো। আমি তোমার লাঞ্চবক্স প্রস্তুত করছি। লিমিয়িন নাস্তা খেতে বসেই চিৎকার করে বলে উঠে আজ তুমি একি তরকারি রান্না করলে? এত লবণাক্ত তরকারি কি মুখে দেওয়া যায়? তুমি কি ঠিকমত রান্না করতে পারো না? মন কোথায় থাকে তোমার? এইসব কথা চিৎকার করে বলে খাবারের মধ্যে হাত ধুয়েই সুপর্ণা চিৎকার করে বলে, একটু বেশি লবণ হয়েছে বলে তুমি আমাকে এত কথা শোনাচ্ছ কেন? মানুষের কি ভুল হয় না? উত্তরে লিমিয়ন আরও রেগে মটরসাইকেল নিয়ে অফিসের পথে রওনা হয়ে গেল। প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার পথে অর্নবকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যায় কিন্তু আজ তাও করেনি অর্ণবের বাবা।

হঠাৎ করে স্বামীর এমন ব্যবহারে ভীষণ মনোকষ্ট পেলো সুপর্ণা। অশ্রুসজল চোখ মুছে ছেলেকে প্রস্তুত করে সে স্কুলের পথে রওনা হয়। স্কুল হতে বাড়ি ফিরে মনের দুঃখে সে নাস্তাও করেনি। দুপুরে স্কুল হতে ছেলেকে নিয়ে এসে উভয়ই গোসল করে অর্ণবকে ভাত খেতে দেয়। কিন্তু নিজে কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যা ছুই ছুই লিমিয়ন অফিস হতে বাড়ি ফেরে। তখন স্ত্রী সুপর্ণা পড়াতে ব্যস্ত। অন্যদিন অফিস হতে ফেরার পর একসাথে বসে চা পান করে কিন্তু আজ তা বন্ধ। তাই ফ্রেস হয়ে লিমিয়ন নিজের চা প্রস্তুত করে একা একা পান করে। রাতে নিজের ছেলে ও স্বামীকে খাবার টেবিলে খাবার খেতে দেয়। কিন্তু লিমিয়ন তাকে ডাক না দেওয়ায় সুপর্ণা আরও কষ্ট নিয়ে নিজের ছেলের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকে। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে পাশাপাশি থেকেও কেউ কারও সাথে কথা বলে না। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মান অভিমান চলতে থাকে। এরই মধ্যে প্রায়শ্চিত্তকাল এসে গেল কিন্তু তাদের মধ্যে কথোপকথন নেই।

প্রায়শ্চিত্তকালের প্রায় শেষ পর্যায়ে লিমিয়ন অফিস হতে ইস্টারের বোনাস পেয়ে একমাত্র আদরের ছেলে, ভাই, প্রিয়তমা স্ত্রী সুপর্ণার জন্য নতুন কাপড় আনলো। ছেলে ও ভাইকে তাদের কাপড় দিলেও স্ত্রী সুপর্ণার কাপড় দিতে পারছে না। দেখতে দেখতে আজ পুণ্য শনিবার। রাতের পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর যে যার মত খেয়ে দেয়ে বিছানায় ঘুমাতে গেলেও লিমিয়ন ভীষণ মনমরা অবস্থায় ড্রয়িং রুমে বসে আছে। সে ভাবছে আজকের রাতটা পোহালেই কাল ইস্টার সানডে, প্রভু যিশুর পুনরুত্থান পর্ব কিন্তু আমরা কিভাবে তা পালন করব? কারণ আমাদের মধ্যে অনেকদিন যাবৎ কোন কথাবার্তা নেই। লিমিয়ন নিজের বিবেককে প্রশ্ন করে নিজের মন পরিবর্তন করে ধিরে ধীরে প্রিয়তমা জীবন সঙ্গী সুপর্ণার কাছে গিয়ে তার হাতে হাত রেখে বিনয়ের সুরে বলল-সুপর্ণা আমি সত্যিই অনেক দুঃখিত তোমার সাথে খারাপ আচরণ ও ব্যবহারের জন্য, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি তোমার প্রতি আর এমনটা কোনদিন করবো না।

রাত পোহালেই পাস্কা পর্ব, এসো আমরা সব ভুলে যাই। স্বামীর কথা শুনে সুপর্ণা আনন্দে কেঁদে উঠলো ও বুকে জড়িয়ে ধরল। ভোরের ঘন্টা শুনেই লিমিয়ন ও সুপর্ণা ঘুম থেকে উঠলো। লিমিয়ন সুপর্ণার জন্য কেনা শাড়িটা তার হাতে দিয়ে বলল-তুমি প্রস্তুত হও, আমি অর্নব ও ভাইকে প্রস্তুত হতে বলছি। আজ আমরা সবাই একসাথে মহাখ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করবো।

একটু পরেই গির্জার ঘন্টা বাজল। লিমিয়ন সপরিবারে খ্রিস্টযাগে অংশ নিতে পাহাড়ঘেরা সবুজের মেঠোপথে রওনা হল গির্জার পথে॥ ❑

পাস্কা পর্ব

নিরব রিবেরু

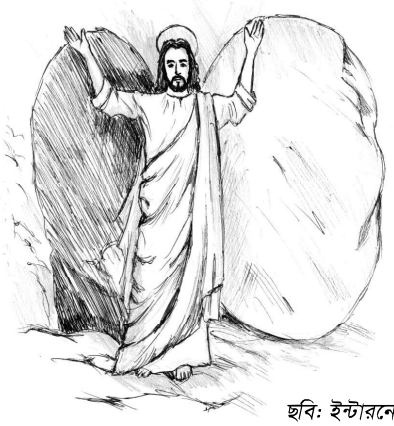

ছবি: ইন্টারনেট

খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের আশা প্রদান করে। আমরা খ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাসীভক্ত। তিনি আমাদের মুক্তির রূপকার। যখন আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের সহায়তায় আমাদের পাপকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই, তখনই আমাদের মধ্যে পুনরুত্থিত যিশুর শক্তি কাজ করে। পুনরুত্থান আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের কষ্ট ও মৃত্যু বৃথা যাবে না। যিশুর পুনরুত্থান প্রকাশ করে যে, ভালোবাসা পাপ ও মৃত্যুর চেয়েও বেশি শক্তিশালী। ''কোন কিছুই আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট নিহিত ঐশ ভালোবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না: মৃত্যু নয়, জীবনও নয়, কোন দূত, আধিপত্য বা শক্তি, বর্তমানে বা ভবিষ্যতের কোন কিছু, উর্ধ্ব বা অতলের কোন প্রভাব, কিংবা সৃষ্ট অন্য কোন কিছুও নয় *(রোমীয় ৮:৩৯)*।" খ্রিস্ট আজ মহাগৌরবে পুনরুত্থান করেছেন এবং জীবিত আছেন। যিশুর পুনরুত্থানই আমাদের বিশ্বাসের প্রথম ও প্রধান উৎস ও ভিত্তি; যা খ্রিস্টভক্তদের জীবনে আনে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ। তিনিই দাসত্ব থেকে মুক্তিতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে জীবনে, স্বৈরশাসন থেকে শাশ্বতরাজ্যে আমাদের বের করে এনে করে তুললেন তাঁর আপনজাতি। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আমাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলেছেন বিশ্বাস, ঐশরিক শক্তি, আনন্দ ও শান্তি। প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দ ও শান্তিবার্তা সকলের অন্তরে নব জাগরণ, উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরে উঠুক কারণ পুনরুত্থিত খ্রিস্টই আমাদের মুক্তির রূপকার॥

এলিস মেরী পিউরীফিকেশন

পুনরুত্থিত যিশুর গৌরব ধ্যানে

যীশু বাউল

খ্রিস্টের পুনরুত্থান
তমসা অন্ধকার ও পাপের বাধন
ছিন্ন করে ঐ আসে পুনরুত্থান পর্ব
বিশ্বাসী মানুষের হৃদয় গভীরে
আলোকিত চিন্তা-চেতনার নবীন বাসরে।
খ্রিস্টের পুনরুত্থান
পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলে
স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার গৌরব কীর্তনে
শান্তি-আনন্দের দোলা দিয়ে
বিশ্বাসের জীবন নবায়নে প্রেম সত্য ব্রতে।
খ্রিস্টের পুনরুত্থান
প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশের নিমন্ত্রণে
পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে
পথ চলার আহ্বানে
পরম রাজ্যে প্রবেশের চেতনা দানে
এম্মাউসের পথ যাত্রীর মতো
দৃষ্টি উন্মোচনে।
খ্রিস্টের পুনরুত্থান
বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে-বসন্তের চেতনায়
নব পল্লবে, সজীবতার শুভ্র সাজে
প্রভু যিশুর গৌরবের মহা সংকীর্তনে
মর্ত্য ধাম আলোকিত করে
আনন্দের দোলা দিয়ে।
খ্রিস্টের পুনরুত্থান
তমস্যা থেকে জ্যোর্তিলোক প্রবেশের
মর্ত্যলোক থেকে স্বর্গলোকের বিভাতে
মহিমান্বিত খ্রিস্টের দীপ্ত সৌন্দর্য প্রকাশে
বেঁচে থাকার আনন্দ গানে পুনরুত্থিত যিশুর
গৌরব ধ্যানে॥

প্রেরণা

উইলিয়াম রনি গমেজ

বহমান জীবনের পথ চলায়
কত ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভেঙ্গে দিয়ে যায়
সাজানো স্বপ্নের বাগান
প্রেম-ভালোবাসা, সম্পর্ক...।
তবুও কি থেমে যায় জীবন
বয়ে চলা নদীর মতো
সবুজ প্রকৃতির মতো
ক্রমেই অগ্রসর হয় সম্মুখে।
পিছনে পড়ে থাকে অতীত
প্রিয় মানুষগুলো, অপ্রিয় হয়ে যায়
স্বজনেরা চলে যায়, আপন ঠিকানায়
একলা জীবন, একাই যেতে হয়।
তবুও আনন্দ ভরে উঠে মন
তোমাকে ভেবে;
পুনরুত্থানের কি অপার মহিমা তোমার
সেই নব আলোর জ্যোতিতে
উদ্ভাসিত হই
নতুন উদ্যমে, নির্ভয়ে পথ চলি আবার॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

মহাদেশীয় পর্যায়ে সিনড আলোচনা শেষ পর্যায়ে

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ঐশ জনগণের পরামর্শমূলক আলোচনার মধ্যদিয়ে মহাদেশীয় পর্যায়ে সিনড আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে; যে আলোচনায় ছিল একই ভৌগলিক এলাকার চার্চগুলোর মধ্যকার ব্যক্তিদের পারস্পরিক শ্রবণ ও সংলাপ এবং বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণ করা। স্থানীয় পর্যায়ে ধর্মপ্রদেশীয় ও জাতীয়ভাবে সম্মেলন করার পরে এই পর্যায় আসে। এই সিনোডাল প্রক্রিয়া জাতীয় ও মহাদেশীয় উভয় পর্যায়েই বিশ্বাসীবর্গের নতুন ধরণের সংলাপ, অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেছে।

শ্রবণ এবং নির্ধারণ

মহাদেশীয় পর্যায়ে শ্রবণ ও কোন ইস্যু নির্ধারণের একটি অনন্য প্রক্রিয়া চিহ্নিত করে মহাদেশীয় সাতটি সমাবেশ সংগঠিত হয়। সকলেই সিনোডাল প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় বিষয় 'একসাথে চলা' বিষয়টির উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন, যা মণ্ডলীকে আজও তার প্রেরণকর্ম অর্থাৎ মঙ্গলসমাচার প্রচারের কাজ স্থানীয় থেকে সর্বজনীন পর্যায়ে করতে সক্ষম করে তুলছে।

সহায়ক নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন স্তরে মণ্ডলীর সম্পৃক্ততা প্রক্রিয়াটিকে সাহায্য করেছে। স্থানীয় সাংগঠনিক কমিটিগুলো মহাদেশীয় সমাবেশগুলি প্রস্তুত ও ফলপ্রসূ করতে সাহায্য করেছিল; সমাবেশস্থলে বিভিন্নজনের উপস্থিতি বিশেষভাবে সিনডের ভাটিকানের জেনারেল সেক্রেটারিয়েটের প্রধানদের ও ষোড়শ বিশপ সিনডের সাধারণ রিপোর্টারদের উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। এই উপস্থিতির মধ্যদিয়ে ভাটিকান স্থানীয় মণ্ডলীর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ও স্থানীয় মণ্ডলীর কথা শোনার আকাঙ্খার কথা ব্যক্ত করেছে।

উন্মুক্ত আলোচনা

সাতটি মহাদেশীয় সমাবেশ সংগঠিত হয়েছিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে; যেখানে মণ্ডলীর বিভিন্ন স্তরের সদস্যরা অর্থাৎ বিশপ, পুরোহিত, উৎসর্গীকৃত জীবনব্রতী নারী-পুরুষ এবং খ্রিস্টভক্তগণ একসাথে অংশগ্রহণ করেন। মহাদেশীয় পর্যায়ের দলিলের সিনডের তিনটি মূল প্রশ্নের আলোকে তারা বিশদ আলোচনা করে কিভাবে সামনে এগুতে পারে তা আলোচনায় আনেন। দলিলের কোন বিষয়টি তাদের অনুরণিত করেছে এবং কোন কোন বিষয়গুলো তাদের টেনসন সৃষ্টি করে তা চিহ্নিত করে প্রাধান্য বিবেচনা করতে বলা হয়।

সিনডের জেনারেল সেক্রেটারিয়েট সন্তুষ্টির সাথে উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন মহাদেশীয় সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা দলিলের সাথে যুক্ত হতে সকল ক্ষেত্রই খুঁজে পেয়েছেন এবং সেইসাথে বিস্তৃত ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পার্থক্য ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য থাকলেও মণ্ডলীর সাথে একসাথে এগিয়ে যাওয়ার পথ পেয়েছেন। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরের ৪-২৯ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বিশপ সিনডে এই আলোচনাগুলির চূড়ান্ত দলিলসমূহ ১ম অধিবেশনে আলোচনায় আসবে ও অবদান রাখবে।

অনুগ্রহের সময়

সিনড জেনারেল সেক্রেটারিয়েট এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, সকল সমাবেশগুলো কিভাবে মণ্ডলীর জন্য অনুগ্রহের একটি সময় চিহ্নিত করে যা খ্রিস্টের সাথে একত্রে চলে পুর্নবীকরণের আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে। মহাদেশীয় প্রক্রিয়াটির দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এটি অনেক মানুষের তাদের স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আনন্দ বের করে নিয়ে এসেছে এবং একইসাথে মাণ্ডলিক জীবনকে চলমান গতিশীলতায় রাখতে শ্রবণ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে তা প্রকাশ পেয়েছে। সমাবেশগুলো নিশ্চিত করেছে যে, 'আধ্যাত্মিক কথোপকথন' পদ্ধতি প্রকৃত শ্রবণ ও সমাজের দূরদর্শিতা বৃদ্ধির একটি উপায় যা ধর্মীয় ঐক্যমতে পৌঁছাতে সহায়তা করে।

ছবি: ইন্টারনেট

সিনডাল সংস্কার বাস্তবায়ন

সিনড জেনারেল সেক্রেটারিয়েট এক বিবৃতিতে যারা সিনড প্রক্রিয়ার সমাবেশ বাস্তবায়িত করতে ও ফলপ্রসূতা আনতে কাজ করেছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এটি আরো উল্লেখ করে যে, স্থানীয় মণ্ডলীর দৈনন্দিন জীবনে 'সিনোডাল সংস্কার' কিভাবে বাস্তবায়িত হবে এ ব্যাপারে পরামর্শমূলক আলোচনা চলমান থাকবে এ সচেতনতা রেখে যে, এখনও পর্যন্ত যা আলোচিত ও চিহ্নিত হয়েছে তার সবকিছু সর্বজনীন মণ্ডলীতে বা মাণ্ডলিক শিক্ষায় না ও আসতে পারে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা অবশ্যই ন্যায্য এবং টেকসই হতে হবে

- পোপ ফ্রান্সিস

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে সামাজিক নিরাপত্তা অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে টেকসই করার জন্য ইতালীয় নীতি নির্ধারকদের প্রতি আহ্বান রাখেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস। গত ৩ এপ্রিল সোমবার ভাটিকানে ইতালীয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল সিকিউরিটি (INPS) এর ৪০০জন নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি আহ্বান রাখেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ দরকার যারা ভ্রাতৃত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত হবেন, সম্পদের প্রাচুর্যের সময় তা নষ্ট করবেন না এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে চরম সংকটে ফেলবেন না।

সকল কিছুই সম্পর্কযুক্ত: ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলোকে মনে রাখা

পোপ ফ্রান্সিস উল্লেখ করেন যে বর্তমান সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা ইস্যুটি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেহেতু ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা না করে জনসংখ্যার অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠছে এবং তাতে সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে। বাস্তুসংস্থানগত সংকট এবং নাতি-দাদুদের কাঁধে আরোপিত জাতীয় ঋণ হলো আমাদের জন্য উদ্বেগজনক কিছু বিষয়। পক্ষান্তরে স্থায়িত্বশীলতা, এই নীতিতে সাড়া দেয় যে যুবদের উপর অপরিবর্তনীয় এবং ভারী বোঝা চাপানো অন্যায়। তা সামাজিক নিরাপত্তা হলো এক ধরণের কল্যাণ যা বিভিন্ন প্রজন্মকে একত্রিত করে। বিদেশি শ্রমিক যাদেও ইতালিয়ান নাগরিকত্ব নেই তারাও ইতালিয়ান পেনশন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখছে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পোপ মহোদয় মন্তব্য করেন, নাগরিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রক্রিয়া স্মরণ করায় যে সকল কিছুই সম্পর্কযুক্ত এবং আমরা আন্তঃনির্ভরশীল।

অঘোষিত ও অনিশ্চিত কাজকে না বলা

পোপ ফ্রান্সিস ইতালিয়ান সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষাকে চ্যালেঞ্জের মুখেও তিনটি বিষয়ের প্রতি জরুরী ভিত্তিতে দৃষ্টি দিতে বলেন। ১) অঘোষিত কাজ, যা শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরণের শোষণ ও অন্যায্যতার মুখোমুখি করে; ২) অনিশ্চিত কাজের সুযোগ নিয়ে অপব্যবহার, যুবকদেরকে বিয়ে ও পরিবার গঠন স্থগিত করে দেয়। ফলশ্রুতিতে ইতালিতে জন্মহার নিম্নমুখী; ৩) শোভন ও সম্মানীয় কাজের পরিবেশ বৃদ্ধি করা যা সর্বদা মুক্ত, সৃজনশীল, অংশগ্রহণমূলক ও সহায়ক হবে। পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন আমাদের বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ দরকার যারা ভ্রাতৃত্ববোধে পরিচালিত হবেন এবং প্রাচুর্যেও সময় অপচয় করবেন না ও ভবিষ্যত প্রজন্মেও উপর কিছু চাপিয়ে দিবেন না॥

- তথ্যসূত্র : news.va

Ref. # FCJYF/Secretary/2023/1/105 Date: April 01, 2023

JOB OPPORTUNITY

Fr. Charles J. Young Foundation is looking for an energetic, self-motivatedand visionary **Program Coordinator** for its operations.

Position: Program Coordinator
Duty Station: Head Office with frequent travel to working fields/Site Offices.

Key Job Responsibilities:
- Assist in project designing, fund raising and Donor relationship.
- Support planning and coordination of a program and its activities.
- Ensure implementation of policies and practices.
- Schedule program work, oversee daily operations, coordinate the activities of the program and set priorities for managing the program.
- Communicate with clients to identify and define project requirements, scope and objectives
- Adhere to budget by monitoring expenses, tracking expenditures/transactions and implementing cost-saving measures
- Supervise project activities and coordinate all team members to keep workflow on track
- Organize reporting, plan meetings and provide updates to project Director.
- Manage communications through media relations, social media etc.
- Evaluate potential problems and technical difficulties and develop solutions to mitigate.
- Help build positive relations within the team and external stakeholders.

Educational Requirements
- Masters in Social Science, Development Studies or related field from any reputed university.

Experience Requirements
- Minimum 5 years working experience with Local or International NGOs.
- At least 2 years' experience in supervisory role.

Additional Requirements
- Interpersonal skills, including excellent written and verbal communication
- Ability to prioritize work in an environment with multiple and conflicting interests.
- Excellent proficiency in MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point
- Ability to work independently with minimum supervision.
- Excellent teamwork, coordination & proactive attitude.
- Ability to handle complex and confidential information
- Should be independently motivated and schedule-driven with a proven history of successful coordination and meeting deadlines
- Smart and Hardworking.
- Flexible and mature approach with ability to work unsupervised.

Salary: BDT 40,000 - 45,000 per month
Employment Status: Full-time
Compensation & Other Benefits: As per organization policy (Fr. Charles J. Young Foundation)

Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter and send to the following address **by 20 April 2023.**

The position applied for should be written on the top right corner of envelope.

Secretary – Fr. Charles J. Young Foundation
C/O The Christian Co-operative Credit Union Ltd., Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A,Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka – 1215.
Tel: 09678771270, 9123764, 9139901-2

বিজ্ঞ/১২৯/২৩

সূত্র নং: দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২২-২০২৩/৬৪৭

তারিখ: ২৯ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুলের জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	সহকারী প্রধান শিক্ষক	০১	অনুর্ধ্ব ৪০ বছর	পুরুষ/ নারী	আলোচনা সাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন বিভাগে স্নাতক/স্নাতকোত্তর পাশ হতে হবে। - মাস্টার্স ডিগ্রী পাশ ও বি.এড./এম.এড. সম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্কুল পরিচালনা করার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। - ক্লাস রুটিন, পাঠ পরিকল্পণা তৈরী ও শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে লেশন প্ল্যান তৈরি ও পাঠদানের বাস্তব জ্ঞান এবং পারদর্শী হতে হবে। - বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আনুযায়ী সৃজনশীল পাঠদান পদ্ধতি, জাতীয় কারিকুলাম ও ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির সিলেবাস এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। - থানা শিক্ষা অফিস, মাউশিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সাথে কার্যকরি যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। - স্কুলের উন্নতিকল্পে ও শিক্ষার মান উন্নয়নে কৌশলগত পরিকল্পণা প্রণয়ন করা। - ছাত্র-ছাত্রীদের কাউন্সিলিং করা ও মূল্যায়ন করাসহ শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি মূল্যায়নে পারদর্শী হতে হবে। - বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা (চিত্রাংকন, বার্ষিক ক্রিয়া, বির্তক ইত্যাদি) আয়োজনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - এম এস অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট) পারদর্শী হতে হবে। - বাংলা ও ইরেজি টাইপের দক্ষতা থাকতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

শর্তাবলীঃ-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভাল ভাবে চেনেন)।

০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

০৪। চারিত্রিক সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটো কপি সংযুক্ত করতে হবে।

০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী, ভাল ব্যবহার এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

০৬। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

০৭। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

০৮। এই নিয়োগবিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

০৯। আবেদনপত্র আগামী ২০ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

১০। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদন পত্র পাঠানোর ঠিকানা
লিটন টমাস রোজারিও
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভা: ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারি, দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৩২/২৩

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের
মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি
জন্ম : ২-০১-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১-০২-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ **ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি** পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।
আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমারি আদর্শে পথ চলতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ

১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত টমাস রোজারিও
জন্ম : ১১-১২-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬-০৪-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

তুমি আমাদের আপন ভুবন থেকে বিদায় নিয়ে হয়েছ স্বর্গবাসী। তারপরও মনে হয় তুমি আমাদের সাথেই আছ। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমাকে যেন তাঁর কাছে রাখেন। আমরাও যেন তোমার মত আদর্শ জীবনযাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

'দু' লোচনে বারি
ঝরঝর বড় কষ্ট ব্যথায়
কাতর এ হৃদয় প্রাঙ্গণ'

প্রয়াত সিসিলিয়া রড্রিক্স
মৃত্যু : ১৫-০৩-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

ঠাকুমা,
তুমি নেই, এটা এমন সত্যি যে, আকাশের ধ্রুবতারার প্রজ্বলতার আঁচড়েই বুঝা যায়। এতটা বছর পরও তোমাকে হারানোর ব্যথা মনের মাঝে জেগে ওঠে। তোমার স্মৃতি যেন ছবির মত হেসে রয়। দূর থেকে আশীর্বাদ করো, যেন তোমার মত বিশ্বস্ত হয়ে জগত সংসারে মানুষের সেবা করতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ

২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পরিমল আগষ্টিন রোজারিও
জন্ম : ২৪-০৯-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০-০৪-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষীবাজার, ঢাকা

বাবা,
বছর ঘুরে আবার এলো সেই বেদনার দিন। যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলে চিরতরে। আমরা ভাবতে পারি না তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার স্মৃতি আজো ভাসে আমাদের মানসপটে। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করো আমরা যেন তোমার মত আদর্শবান মানুষ হতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ
স্ত্রী : হিরণ মারীয়া গরেটি রোজারিও
ছেলে : ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও
ছেলে বৌ : শর্মিলা কস্তা
মেয়ে : পান্না, রাখী, ও রীপা
মেয়ে জামাই : তুষার, জেমস ও সজল
নাতি-নাতীন : স্বপ্নীল, অনিন্দিতা, তীব্র, পূর্ণ, সুপান্থ, অপরাজিতা, প্রিয়, শ্রেয়।

২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

"সদা হেসে বলতে কথা,
দিতে না প্রাণে ব্যথা,
মরণের পরে হলে
বেদনার স্মৃতি-গাঁথা"

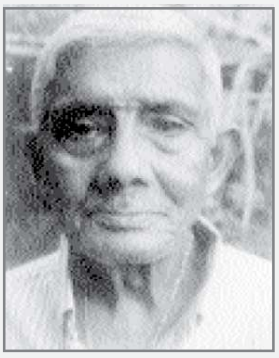

প্রয়াত রায়মন মাইকেল কস্তা
জন্ম: ৪ ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ মার্চ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

দাদু,
২২ বছর পার হলো, তুমি নেই! তোমার স্মৃতি বিজড়িত হয়ে প্রতিটি ক্ষণ কাটছে। অম্লান হয়ে আছ তুমি এই আমাদেরই মাঝে। তোমার আদর্শ আর কর্মপ্রেরণার উচ্ছ্বলতা প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আশীর্বাদ করো, স্বর্গস্থ পিতার অনন্তধাম হতে আমরা যেন তোমার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারববর্গ

বিজ্ঞ/১৩৫/২৩

জেভেরিয়ান মিশনারীদের সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি

ফাদার মারিনো রিগন, এসএক্স

বাংলা সাহিত্য, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতি বিকাশে এবং বিশ্ব দরবারে তা প্রসারে যে কয়েকজন হাতেগোনা বিদেশী বন্ধু বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে জেভেরিয়ান মিশনারী ফাদার মারিনো রিগন এসএক্স এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলার প্রকৃতির প্রতি তার অকৃতিম টান ও ভালোবাসার জন্য তাকে বাংলার পরমবন্ধু বলে ডাকা হয়। এছাড়াও বাংলার স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধে তার সক্রিয় ও অপরিসীম অবদানের জন্য তাকে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে সম্মানসূচক বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেছিলেন।

ফাদার সিলভানো গারেল্লো, এসএক্স

আরেকজন জেভেরিয়ান মিশনারী ফাদার যিনি "বই আন্দোলনকারী" বা "বই পাগল" হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি শুধু মাণ্ডলিক বা আধ্যাত্মিক বই অনুবাদ ও প্রকাশ করেন নি বরং সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক গভীরতা আরো দৃঢ় করতে এবং সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষায় সচেতনতায় তিনি বিভিন্ন ধ্যান-প্রার্থনা, সাধু-সাধ্বীদের জীবনী, নাট্যরূপে মঙ্গলসমাচার অনুবাদ ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। বাংলাদেশ মণ্ডলীর জ্ঞান-ভান্ডারে তার রচিত ও অনুবাদিত বইগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ফাদার আলফিও কনি, এসএক্স

একজন আদর্শ গঠন ও আধ্যাত্মিক পরিচালক ছিলেন। একজন সহজ সরল ফাদার হিসেবে তিনি বিভিন্ন গঠনগৃহে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও মানবীয় গঠন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিতেন। মাথায় খাটো জেভেরিয়ান মিশনারী এই ফাদারের আর একটি বিশেষ গুণ ছিল, তিনি ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত ভাল ফুটবল খেলেছেন।

ফাদার রিকার্দো তোবান্নেলি, এসএক্স

ফাদার রিকার্দো তোবান্নেলি এসএক্স "টোকাই ফাদার" হিসেবে পরিচিত ছিলেন । কেননা তিনি অবহেলিত দরিদ্র ও পথভ্রষ্ট বা পথের ধারে পড়ে থাকা শিশু-কিশোরদের জন্য তার হৃদয় ছিল সব সময় খোলা এবং যত্ন ও ভালোবাসাপূর্ণ। তিনি সকল ধর্মের পথশিশুদের জন্য খাদ্য, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ও সাহায্য করার মাধ্যমে বাংলার অনেক শিশু-কিশোরদের নতুন জীবন দান করেছেন।

"তোমরা জগতের সর্বত্র যাও এবং বিশ্ব সৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" (মার্ক ১৬:১৫)

তুমি কি জেভেরিয়ান মিশনারী হতে আগ্রহী!

যোগাযোগের ঠিকানা:
জেভেরিয়ান হাউজ, ২৪/বি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফাদার পলাশ এসএক্স-০১৮৮৬১৭৯০৬২,
ফাদার হুয়ান হোসে এসএক্স-০১৩০৪১৪৮৭২৬,
Facebook: Xaverian Missionaries Bangladesh

বিজ্ঞ/১০২/২০২৩

প্রভু তব প্রসন্ন মুখ সব দুঃখ করুক সুখ
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।
ভুবনেশ্বর হে
মোচন কর বন্ধন সব মোচন কর হে ॥

সবাইকে পুণ্যময় পাস্কা পর্বের শুভেচ্ছা ॥

মায়া আনজুস গোমেজ
পিটার কর্ণেলিয়াস গোমেজ
বিএএসসি, পি.এনজ কানাডা

BOOK POST

চলতি সংখ্যার মূল্য ৪০ টাকা মাত্র

বিজ্ঞ/১০১/২০২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: www.weekly.pratibeshi.org